বিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণি

মাখন, ঘি, তৈল — স্নেহ ও চর্বি
মাছ, মাংস, ডিম — আমিষ
মিষ্টিকুমড়া, পুঁইশাক, আম, জাম — শাক–সবজি ফলমূল
চাল, আটা, আলু, চিনি — শর্করা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম–দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বিজ্ঞান

নবম–দশম শ্রেণি

রচনা
অধ্যাপক ড. শাহজাহান তপন
অধ্যাপক ড. সফিউর রহমান
ড. এস এম হাফিজুর রহমান
ড. মোঃ আব্দুল খালেক

সম্পাদনায়
অধ্যাপক ড. মোঃ আজিজুর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর- ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক

মোঃ মোখলেসউর রহমান

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

মশিউর রহমান অনির্বান

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ

লেজার স্ক্যান লিমিটেড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ–কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি–২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি–চেতনা এবং ধর্ম–বর্ণ–গোত্র ও নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প–২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। মূলত এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে **'বিজ্ঞান'** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের নিকট আনন্দদায়ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি হাতে কলমে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে– যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, সৃজনশীল প্রশ্ন ও কর্ম–অনুশীলন প্রণয়ন, পরিমার্জন এবং প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

উন্নততর জীবনধারা

খাদ্য ব্যতীত আমরা বাঁচতে পারি না। দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ, দেহের টিস্যুগুলোর ক্ষতি পূরণ, শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি কাজের জন্য নিয়মিত বিশেষ কয়েক ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আমাদের স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে, যে খাদ্য আমরা খাই তার গুণগতমানের ওপর। খাদ্য আমাদের চেহারায়, কাজকর্মে, আচরণে ও জীবনের মানের ভিন্নতা ঘটাতে পারে। শ্বসন ক্রিয়ার সময় খাদ্যস্থ রাসায়নিক শক্তি তাপ ও গতি শক্তিরূপে মুক্ত হয়ে জীবদেহের জৈবিক ক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি জীব তার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনমতো এবং পরিমাণমতো খাদ্য গ্রহণ করে। প্রতিটি খাদ্যই জটিল রাসায়নিক যৌগ। এই জটিল খাদ্যগুলো বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে সরল খাদ্যে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে পরিপাক বলে। পরিপাককৃত খাদ্য শোষিত হয়ে দেহকোষের প্রোটোপ্লাজমে সংযোজিত হয়– যাকে আত্তীকরণ বলে। পরিপাকের পর অপাচ্য খাদ্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- খাদ্য উপাদান ও আদর্শ খাদ্য পিরামিড ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- সুস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রাকৃতিক খাদ্য এবং ফাস্ট ফুডের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ভিটামিনের উৎস এবং এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খনিজ লবণের উৎস এবং এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানি ও আঁশযুক্ত খাবারের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারব।
- বডি মাস ইনডেক্স –এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার এবং এর শারীরিক প্রতিক্রিয়া বলতে পারব।
- শরীরে তামাক ও ড্রাগসের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এইডস কী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

খাদ্য ও পুষ্টি

পুষ্টিবিজ্ঞান অনুসারে আমরা যা খাই তার সবই খাদ্য নয়। তাহলে খাদ্য কী? সেই সব আহার্য বস্তুকে খাদ্য বলা যাবে, যা পুষ্টির দ্বারা জীবদেহে বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ তথা পুষ্টি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করে। তা হলে খাদ্য দেহের পুষ্টি সাধন করে। পুষ্টি হলো– পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু আহরণ করে খাদ্যবস্তুকে পরিপাক ও শোষণ করা এবং আত্তীকরণ দ্বারা দেহের শক্তির চাহিদা পূরণ, রোগ প্রতিরোধ, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করা। পুষ্টির ইংরেজি শব্দ Nutrition; অপরদিকে খাদ্যের যেসব জৈব অথবা অজৈব উপাদান জীবের জীবনীশক্তির যোগান দেয়, তাদের

একসঙ্গে পরিপোষক বা নিউট্রিয়েন্টস (Nutrients) বলে। যেমন–গ্লুকোজ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ইত্যাদি। পরিপোষকের পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। প্রাণীরা খাদ্যের মাধ্যমে পরিপোষক গ্রহণ করে।

খাদ্যের কাজ প্রধানত তিনটি–

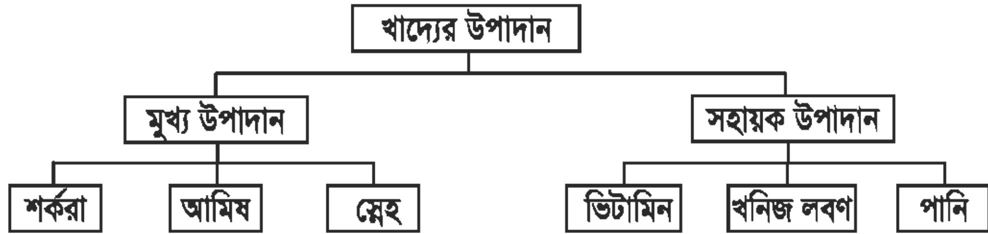
১. খাদ্য দেহের গঠন, বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

২. খাদ্য দেহে তাপ উৎপাদন করে, কর্মশক্তি প্রদান করে।

৩. খাদ্য রোগ প্রতিরোধ করে, দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে।

খাদ্যের উপাদান

খাদ্যে ছয়টি উপাদান থাকে, যথা : শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পানি। এগুলোর মধ্যে শর্করা, আমিষ ও স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট দেহ পরিপোষক খাদ্য, যারা দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও শক্তি উৎপাদনে সহায়ক। খাদ্যের স্নেহ ও শর্করাকে বলা হয় শক্তি উৎপাদক খাদ্য এবং আমিষযুক্ত খাদ্যকে বলা হয় দেহ গঠনের খাদ্য। ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি দেহ সংরক্ষক খাদ্য উপাদান, যারা দেহের রোগ প্রতিরোধে সহায়তাকারী।



শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

শর্করা হলো মানুষের প্রধান খাদ্য। শর্করা দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাপশক্তি উৎপাদন করে। কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে শর্করা গঠিত। শর্করা বর্ণহীন, গন্ধহীন ও মিষ্টি স্বাদযুক্ত।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট বিভিন্ন প্রকার হয়। এদের উৎসও হয় বিভিন্ন। যেমন–

উদ্ভিজ্জ উৎস

শ্বেতসার বা স্টার্চ : ধান, গম, ভুট্টা ও অন্যান্য দানা শস্য স্টার্চের প্রধান উৎস। এ ছাড়া আলু, রাঙা আলু ও কচু ইত্যাদি এর প্রধান উৎস।

গ্লুকোজ : এটি চিনির তুলনায় মিষ্টি কম। এই শর্করাটি আঙুর, আপেল, গাজর, খেজুর ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

ফ্রুকটোজ : আম, পেঁপে, কলা, কমলালেবু প্রভৃতি মিষ্টি ফলে ও ফুলের মধুতে ফ্রুকটোজ থাকে। একে ফল শর্করা (Fruit sugar) বলে।

সুক্রোজ : আখের রস, চিনি, গুড়, মিসরি এর উৎস।

সেলুলোজ : বেল, আম, কলা, তরমুজ, বাদাম, শুকনা ফল এবং সব ধরনের শাক–সবজিতে সেলুলোজ থাকে।

প্রাণিজ উৎস

ল্যাকটোজ বা দুধ শর্করা– গরু, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণীর দুধে এই শর্করা থাকে। গ্লাইকোজেন– পশু ও পাখি জাতীয় প্রাণী

যেমন– মুরগি, কবুতর প্রভৃতির যকৃৎ ও মাংসে (পেশি) গ্লাইকোজেন শর্করাটি থাকে।

পুষ্টিগত গুরুত্ব : পুষ্টিতে শর্করার ভূমিকা অপরিহার্য। শর্করা দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাপশক্তি উৎপাদন করে। জীবদেহে বিপাকীয় কাজের জন্য যে শক্তি লাগে তা শ্বসনের সময় কার্বোহাইড্রেট খাদ্য জারণের ফলে উৎপন্ন হয়। প্রতি গ্রাম শর্করা জারণে ৪.১ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

গ্লাইকোজেন প্রাণীদেহে খাদ্যঘাটতিতে বা অধিক পরিশ্রমে শক্তি সরবরাহ করে। সেলুলোজ একটি অপাচ্য প্রকৃতির শর্করা। এটি আঁশযুক্ত খাদ্য। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য রোধক। রাইবোজ ও ডি–অক্সিরাইবোজ নামক পেন্টোজ শর্করা কোষে নিউক্লিক অ্যাসিড– ডিএনএ ও আরএনএ গঠনে অংশ নেয়। এছাড়া শর্করা থেকে প্রোটিন ও ফ্যাট সংশ্লেষ হয়।

শর্করার অভাবজনিত রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদের প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। খাদ্যে শর্করার পরিমাণ আবার চাহিদার তুলনায় বেশি হলে অতিরিক্ত শর্করা দেহে মেদরূপে জমা হয়। ফলে দেহ স্থূলকায় হতে পারে; তাছাড়া বহুমূত্র রোগও দেখা দিতে পারে। বয়স, ওজন, উচ্চতা ও পরিশ্রমের ওপর দেহে শর্করার চাহিদা নির্ভর করে। পুষ্টিবিদদের মতে, মানুষের দৈনিক ক্যালরি চাহিদার অন্তত ৫৮–৬০% শর্করা জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা উচিত। দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য ৪ থেকে ৬ গ্রাম শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ন্যূনতম ৩০০ গ্রাম শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। এতে ১২০০ থেকে ১৮০০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যাবে।

খাদ্যের মধ্যে নিহিত শক্তিকে খাদ্য ক্যালরি বা কিলোক্যালরি হিসেবে মাপা হয়। ক্যালরি শক্তির একক। এক গ্রাম খাদ্য জারণের ফলে যে পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে খাদ্যের ক্যালরি বলে। এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা ১° (ডিগ্রি) সেলসিয়াস বৃদ্ধি করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ তাপশক্তি হচ্ছে এক ক্যালরি। এক হাজার ক্যালরি সমান এক কিলোক্যালরি বা এক খাদ্য ক্যালরি (One Food Calorie)। খাদ্যের ক্যালরিকে কিলোক্যালরি দিয়ে বোঝানো হয়। শর্করা ও প্রোটিনের ক্যালরি প্রায় সমান–৪.১ kcal/g। স্নেহ জাতীয় খাদ্যে অর্থাৎ ফ্যাটের ক্যালরি সবচেয়ে বেশি– ৯.৩ kcal/g। একটা খাদ্যের খাদ্য ক্যালোরি বলতে বোঝায় কতখানি শক্তি মুক্ত হবে খাদ্যটি সম্পূর্ণভাবে জারণের ফলে।

আমিষ বা প্রোটিন

কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন–এ চারটি পদার্থের সমন্বয়ে আমিষ গঠিত। আমিষে ১৬% নাইট্রোজেন থাকে। আমিষ দেহে পরিপাক হওয়ার পর অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। আমিষের পরিচয় অ্যামাইনো এসিড দিয়ে। মানুষের মধ্যে এ পর্যন্ত ২০ ধরনের অ্যামাইনো এসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। অ্যামাইনো এসিড হচ্ছে আমিষ গঠনের একক। উৎপত্তিগতভাবে আমিষ দুই প্রকার। যথা–প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ। প্রাণী থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তা প্রাণিজ আমিষ। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, পনির ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ। উদ্ভিদ থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তা উদ্ভিজ্জ আমিষ। ডাল, শিমের বিচি, মটরশুঁটি, বাদাম উদ্ভিজ্জ আমিষের উদাহরণ।

২০টি অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে ৮টি অ্যামাইনো এসিড যথা– লাইসিন, ট্রিপেটোফ্যান, মিথিওনিন, ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, ফিনাইল অ্যালানিন ও থ্রিওনাইনকে অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড বলা হয়। এই আটটি অ্যামাইনো এসিড বাদে দেহ বাকি অ্যামাইনো এসিডগুলো সংশ্লেষ করতে পারে। প্রাণিজ প্রোটিনে এই শ্রেণির অ্যামাইনো এসিড বেশি তাই এর পুষ্টিমূল্য বেশি। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে ডাল, সয়াবিন, মটরশুঁটি বীজ এবং ভুট্টার মধ্যে পুষ্টিমূল্য বেশি এমন প্রোটিন থাকে। অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাদ্যে অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড না থাকার জন্য এদের পুষ্টিমূল্য কম।

প্রাণীদেহের গঠনে প্রোটিন অপরিহার্য। দেহকোষের গঠনবস্তুর বেশির ভাগই প্রোটিনযুক্ত। দেহের অস্থি, পেশি, লোম, পাখির পালক, নখ, পশুর শিং প্রভৃতি প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। প্রাণীদেহের শুষ্ক ওজনের প্রায় ৫০% প্রোটিন, কারণ কোষের গঠন এবং কার্যাবলি প্রোটিনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়।

মাছ, মাংস, ডিম ও দুগ্ধজাত খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ ও শক্তিমূল্য

	খাদ্য (১০০ গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	শক্তিমূল্য (কিলোক্যালরি)
মাছ	রুই	১৬.৬	৯৭
	কাতলা	১৯.৫	১১১
	মৃগেল	১৯.৫	৯৮
	কই	১৪.৮	১৫৬
	মাগুর	১৫.০	৮৬
	শিং	২৮.৮	১২৪
	ইলিশ	২১.৮	২৭৩
	চিংড়ি	১৯.১	৮৯
	ভেটকি	১৪.৯	৭৯
	শোল	৬.২	৯৪
মাংস	খাসি	২১.৪	১১৮
	গরু	২৬.০	২৫০
	ভেড়া	১৮.৫	১৯৪
	মুরগি	২৫.৯	১০৯
ডিম	মুরগির	১৩.৩	১৭৩
”	হাঁসের	১৩.৭	১৭৩
দুগ্ধজাত খাদ্য	গরুর দুধ	৩.২	৬৭
	মহিষের দুধ	৪.৩	১১৭
	দই	৬.৯	১৭৬
	ক্ষীর	৬.৯	১৭৬
	ছানা	১৮.৩	২৬৫

	খাদ্য (১০০ গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	শক্তিমূল্য (কিলোক্যালরি)
বিভিন্ন প্রকার ডাল	মসুর	২৬	৩৫০
	মুগ	২৪	৩৩০
	মটরশুটি	২০	৩১৫
	শিম	২০	৪০০
	সয়াবিন	৩৭	৪৪৬

একজন স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রোটিনের প্রাত্যহিক চাহিদা তার দৈহিক ওজনের প্রতি কিলোগ্রামের জন্য ১ গ্রাম অর্থাৎ যদি একজন ব্যক্তির ওজন ৫৭ কেজি হয়, তাহলে তার প্রাত্যহিক প্রোটিন চাহিদা হবে ৫৭ গ্রাম। এ হিসাবে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করলে ভালো থাকা যায়। শিশুদের এবং বাড়ন্ত বালক–বালিকাদের প্রতিদিন ৩–৪ গ্রাম এবং গর্ভবতী ও স্তন প্রদানকারী মহিলাদের প্রতিদিন ২–৩ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রোটিনের চাহিদা নির্ণয়ে প্রোটিনের পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় মানের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। খাদ্য, প্রোটিনের মাধ্যমে দেহে অবশ্যই অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিডগুলোর সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার।

স্নেহ পদার্থ বা লিপিড

ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে স্নেহ পদার্থ গঠিত। খাদ্যে প্রায় ২০ ধরনের ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। ফ্যাটি এসিডের ওপর স্নেহ পদার্থের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। কঠিন স্নেহ পদার্থগুলোকে চর্বি বলে। চর্বি হচ্ছে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। সাধারণ তাপমাত্রায় এগুলো কঠিন অবস্থায় থাকে। যেমন–মাছ ও মাংসের চর্বি। যেসব স্নেহ পদার্থ তরল, সেগুলোকে তেল বলে। তেল হচ্ছে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। সাধারণ তাপমাত্রায় এগুলো তরল থাকে। যেমন–সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি। উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ দুই প্রকার। যথা–

১. **প্রাণিজ স্নেহ :** চর্বিসহ মাংস, মাখন, ঘি, পনির, ডিমের কুসুম ইত্যাদি প্রাণিজ স্নেহ পদার্থের উৎস।

২. **উদ্ভিজ্জ স্নেহ :** বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিজ্জ তেল স্নেহ পদার্থের উৎস। সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, ভুট্টা, নারকেল, সূর্যমুখী, পাম প্রভৃতির তেলে অধিক স্নেহ পদার্থ আছে। কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম ও চিনা বাদাম স্নেহ পদার্থের ভালো উৎস।

মানবদেহে স্নেহ পদার্থ যেসব কাজ করে–

১. খাদ্যবস্তুর মধ্যে স্নেহ পদার্থ সর্বাধিক তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে।

২. দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য স্নেহ পদার্থ অতি আবশ্যক।

৩. স্নেহ পদার্থ দেহ থেকে তাপের অপচয় রোধ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করে।

৪. ত্বকের মসৃণতা ও সজীবতা বজায় রাখে এবং চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।

৫. স্নেহ জাতীয় পদার্থ দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ যেমন– A, D, E ও K শোষণে সহায়তা করে।

অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার : স্নেহ পদার্থের অভাবে চর্মরোগ, একজিমা ইত্যাদি দেখা দেয়। ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়ে সৌন্দর্য নষ্ট হয়। দীর্ঘদিন স্নেহ পদার্থের অভাবে দেহে সঞ্চিত প্রোটিন ক্ষয় হয় এবং দেহের ওজন হ্রাস পায়। আবার অতিরিক্ত স্নেহ পদার্থ দেহে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়। এ কারণে মেদবহুল দেহে সহজে রোগ আক্রমণ করে।

চর্মরোগ, একজিমা ইত্যাদি দেখা দিলে আবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডসমৃদ্ধ ঔষধ সেবনে সুফল পাওয়া যায়। চর্মরোগ প্রতিরোধে দৈনিক মোট ক্যালরির শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ লাইনোলেনিক এসিড–সংবলিত স্নেহ পদার্থ গ্রহণ করা উচিত। খাদ্যে দৈনিক ১৫ গ্রাম প্রাণিজ ও ৫ থেকে ১০ গ্রাম উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ থাকা প্রয়োজন। শিশুখাদ্যে অধিক স্নেহ দ্রব্যের সুপারিশ করা হয়েছে। একজন বয়স্ক ব্যক্তির মোট ক্যালরি চাহিদার ১০%–১৫% স্নেহ পদার্থ থেকে আসা উচিত। এক গ্রাম স্নেহ পদার্থ থেকে প্রায় ৯.৩ কিলোক্যালরি তাপশক্তি উৎপন্ন হয়।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

খাদ্যে পরিমাণমতো শর্করা ও আমিষ থাকলেও জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য বিশেষ এক ধরনের খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। ঐ খাদ্য উপাদানকে ভিটামিন বলে। ভিটামিন সাধারণ খাদ্যে অতি সামান্য পরিমাণে থাকে এবং বিপাক ক্রিয়ায় উৎসেচকের সাথে কো–এনজাইম হিসেবে কাজ করে।

ভিটামিন প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও শরীর সুস্থ রাখার জন্য অপরিহার্য। ভিটামিনের অভাবে দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধনসহ বিভিন্ন কাজ ব্যাহত হয়। ভিটামিন জৈব প্রকৃতির যৌগিক পদার্থ। কয়েকটি ভিটামিন স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয় আবার কয়েকটি ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয়।

১. **স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো :** ভিটামিন A, ভিটামিন D, ভিটামিন E ও ভিটামিন K।

২. **পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো :** ভিটামিন B– কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন C।

ভিটামিন A

প্রাণিজ উৎসের মধ্যে ডিম, গরুর দুধ, মাখন, ছানা, দই, ঘি, যকৃৎ ও বিভিন্ন তেলসমৃদ্ধ মাছে বিশেষ করে কড মাছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন A পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে ক্যারোটিন সমৃদ্ধ শাক–সবজি, যেমন– লালশাক, কচুশাক, পুঁইশাক, পাটশাক, কলমিশাক, ডাঁটাশাক, পুদিনা পাতা, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, ঢেঁড়স, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি এবং বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন– আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল ইত্যাদিতে ভিটামিন A উল্লেখযোগ্য হারে আছে। গাজরে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন A পাওয়া যায়।

কাজ : ভিটামিন A যেসব কাজ করে সেগুলো হলো–

১. দেহের স্বাভাবিক গঠন ও বর্ধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার কাজ নিশ্চিত করে।

২. দেহের বিভিন্ন আবরণী কলা যেমন: ত্বক, চোখের কর্নিয়া ইত্যাদিকে স্বাভাবিক ও সজীব রাখে।

৩. অস্থি ও দাঁতের গঠন, দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখে।

৪. দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।

৫. দেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার : ভিটামিন A-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। এর অভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে চোখের কর্নিয়ায় আলসার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থাকে জেরপ্থ্যালমিয়া রোগ বলে। এতে ব্যক্তি পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায়। ভিটামিন A-এর অভাবে দেহের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময় ঘা, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি উপসর্গও দেখা দেয়। ভিটামিন A–এর অভাবে ত্বকের লোমকূপের গোড়ায় ছোট ছোট গুটির সৃষ্টি হয়।

ভিটামিন A ক্যাপসুল খেয়ে রাতকানা রোগ নিরাময় করা যায়। ভিটামিন A সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণই এসব রোগের হাত থেকে প্রতিকার পাওয়ার উত্তম উপায়।

কিশোর–কিশোরী, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ–মহিলা ও গর্ভবতী মায়েদের দৈনিক ২৫০০ I.U ভিটামিন A প্রয়োজন হয়।

ভিটামিন D

একমাত্র প্রাণিজ উৎস থেকেই ভিটামিন D পাওয়া যায়। এ ভিটামিন সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির সহায়তায় মানুষের ত্বকে সংশ্লেষিত হয়। ডিমের কুসুম, দুধ ও মাখন ভিটামিন D–এর প্রধান উৎস। বাঁধাকপি, যকৃৎ ও তেলসমৃদ্ধ মাছে ভিটামিন D পাওয়া যায়।

দৈনিক চাহিদা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভিটামিন D গ্রহণ করলে শরীরের ক্ষতি হয়। এতে অধিক ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষিত হওয়ায় রক্তে এদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৃক্ক, হৃৎপিন্ড, ধমনি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম জমা হতে থাকে।

ভিটামিন E

সব রকম উদ্ভিজ্জ ভোজ্য তেল বিশেষ করে পাম তেল ভিটামিন E-এর উত্তম উৎস। প্রায় সব খাদ্যেই কমবেশি ভিটামিন E আছে। তাছাড়া শস্যদানার তেল (corn oil), তুলা বীজের তেল, সূর্যমুখী বীজের তেল, লেটুস পাতা ভিটামিন E–এর উল্লেখযোগ্য উৎস। মানবদেহে ভিটামিন E হলো এন্টি–অক্সিডেন্ট, যা ধমনিতে চর্বি জমা রোধ করে এবং সুস্থ ত্বক বজায় রাখে। এ ছাড়া ভিটামিন E কোষ গঠনে সহায়তা করে এবং বেশ কিছু শারীরবৃত্তিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ভিটামিন E মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর বন্ধ্যাত্ব দূর করে। ভিটামিন E–এর অভাবে জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের মৃত্যু হতে পারে। দৈনিক সুষম খাদ্য গ্রহণ করলে এই ভিটামিনের বিশেষ অভাব হয় না।

চাহিদা : শিশু, কিশোর ও বয়স্কদের প্রতিদিন অন্তত ১০–৩০ মিলিগ্রাম ভিটামিন E যুক্ত খাবার গ্রহণ করা উচিত।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন B কমপ্লেক্স

ভিটামিন B কমপ্লেক্স বা B ভিটামিন সংখ্যায় ১২টি। ভিটামিনের এই দলকে ভিটামিন B কমপ্লেক্স বলা হয়। দেহের স্বাভাবিক সুস্থতার জন্য খাদ্যে ভিটামিন B কমপ্লেক্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন B কমপ্লেক্সের মধ্যে থায়ামিন (B_1), রাইবোফ্ল্যাভিন (B_2), নিয়াসিন, পেন্টোথেনিক এসিড, পাইরিডক্সিন (B_6) ও কোবালামিন (B_{12}) গুরুত্বপূর্ণ। দেহের বৃদ্ধি, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কাজ, দেহকোষে বিপাক কাজ, প্রজনন ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য খাদ্যে ভিটামিন B কমপ্লেক্সের উপস্থিতি অতি আবশ্যক।

ভিটামিন B কমপ্লেক্সভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলোর উৎস, অভাবজনিত রোগ ও চাহিদা নিচের টেবিলে দেওয়া হলো :

ভিটামিন	উৎস	অভাবজনিত রোগ	চাহিদা
থায়ামিন (B_1)	ঢেঁকি ছাঁটা চাল, আটা, ডাল, তেলবীজ, বাদাম, যকৃৎ, টাটকা ফল ও সবজি। প্রাণিজ উৎস যেমন– যকৃত, ডিম, দুধ, মাছ ইত্যাদিতে অল্প পরিমাণে থাকে।	দেহে থায়ামিনের চরম অভাবে বেরি বেরি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর অভাবে স্নায়ুর দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি, খাওয়ায় অরুচি, ওজনহীনতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।	বয়স অনুসারে দৈনিক চাহিদা শিশুদের: ০.৫–০.৭ মিলিগ্রাম। বড়দের: ১.২–১.৫ মিলিগ্রাম। গর্ভবতী মহিলাদের: ১.৫–১.৭ মিলিগ্রাম।
রাইবোফ্ল্যাভিন (B_2)	যকৃৎ, দুধ, ডিম, সবুজ শাক–সবজি, গাছের কচি ডগা, অঙ্কুরিত বীজ।	এর অভাবে ঠোঁটের দুপাশে ফাটল দেখা দেয়, মুখে ও জিভে ঘা হয়, ত্বক খসখসে হয়। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। এর অভাবে তীব্র আলোতে চোখ মেলতে অসুবিধা হয়।	প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের প্রতিদিন ১.৭ মিলিগ্রাম এবং প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের প্রতিদিন ১.৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন (B_2) সুপারিশ করা হয়েছে। ১ থেকে ৩ বছরের শিশুদের এই ভিটামিন দৈনিক ০.৮ মিলিগ্রাম প্রয়োজন। ১৪–১৫ বছর কিশোরদের দৈনিক ২.০ মিলিগ্রাম এবং এই বয়সের কিশোরীদের দৈনিক ১.৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন (B_2) প্রয়োজন।
নিয়াসিন বা নিকোটিনিক এসিড (B_5)	মাংস, যকৃৎ, আটা, ডাল, বাদাম, তেলবীজ, ছোলা, শাক–সবজি।	এর অভাবে পেলেগ্রা রোগ হয়। পেলেগ্রা রোগে ত্বকে রঞ্জক পদার্থ জমতে শুরু হয় এবং সূর্যের আলোয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে ত্বকে লালচে দাগ পড়ে এবং ত্বক খসখসে হয়ে যায়। এ ছাড়া জিভে রঞ্জক পদার্থ জমে জিভের এট্রোফি হয়।	প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের দৈনিক ১২–১৮ মিলিগ্রাম হিসেবে এটি গ্রহণ করা উচিত। এর চাহিদা খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে।
পিরিডক্সিন (B_6)	চাল, আটা, মাছ, মাংস, শাক–সবজি, ছোলা, ছত্রাক, বৃক্ক, ডিমের কুসুম।	এর অভাবে খাওয়ায় অরুচি, বমিভাব ও অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দেয়।	প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ১.৪–২.০ মিলিগ্রাম হিসেবে প্রয়োজন।
কোবালামিন বা সায়ানোকোবালামিন (B_{12})	যকৃৎ, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, পনির, বৃক্ক প্রভৃতি।	এর অভাবে রক্তশূন্যতা রোগ দেখা দেয়। স্নায়ুতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটে।	বয়স্কদের প্রতিদিন ৪ –৮ মিলিগ্রাম এ জাতীয় ভিটামিনের প্রয়োজন।

ভিটামিন–C (অ্যাসকরবিক এসিড) : টাটকা শাক সবজি ও টাটকা ফলে ভিটামিন C পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে আমলকী, লেবু, কমলালেবু, টমেটো, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি ভিটামিন C –এর উৎস। শাকসবজির মধ্যে মুলাশাক, লেটুস পাতা, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, কাঁচা মরিচ, ফুলকপি, করলা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন C পাওয়া যায়। শুকনা ফল ও বীজে এবং টিনজাত খাদ্যে এই ভিটামিন থাকে না।

ভিটামিন দেহে যেসব কাজ করে সেগুলো হলো–

১. ত্বক, হাড়, দাঁত ইত্যাদির কোষসমূহকে পরস্পরের সাথে জোড়া লাগিয়ে মজবুত গাঁথুনি প্রদান করে।
২. শরীরের ক্ষত পুনর্গঠনের কাজে প্রয়োজন হয়।
৩. দাঁত ও মাড়ি শক্ত রাখে।
৪. স্নেহ, আমিষ ও অ্যামাইনো এসিডের বিপাক কাজে ভিটামিন C গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
৫. ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখে।
৬. রোগ প্রতিরোধ করে।

ভিটামিন C-এর তীব্র অভাবে স্কার্ভি (দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া) রোগ হয়। এর অভাবে– (i) অস্থির গঠন শক্ত ও মজবুত হতে পারে না। (ii) ত্বকে ঘা হয়, ক্ষত শুকাতে দেরি হয়। (iii) দাঁতের মাড়ি ফুলে দাঁতের ইনামেল উঠে যায়। দাঁত দুর্বল হয়ে অকালে ঝরে পড়ে। (iv) রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে গিয়ে সহজে ঠান্ডা লাগে।

প্রতিদিন টাটকা টক জাতীয় খাদ্য আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এ ছাড়া ভিটামিন C জাতীয় ট্যাবলেট গ্রহণে এ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কাজ : আমরা যে ভিটামিনগুলোর আলোচনা করলাম, দেহে সেগুলোর অভাব হলে কী কী রোগ দেখা দিতে পারে তার একটা চার্ট প্রস্তুত কর।

খনিজ পদার্থ ও পানি

জীবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য ভিটামিনের মতো খনিজ পদার্থ বা খনিজ লবণও একান্ত অপরিহার্য। খনিজ পদার্থ প্রধানত কোষ গঠনে সহায়তা করে। প্রাণীরা প্রধানত উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ করে খনিজ পদার্থ পায়। আমরা শাক সবজি, ফল–মূল, দুধ, ডিম, মাছ এবং পানীয় জলের মাধ্যমে আমাদের খনিজ পদার্থের চাহিদা পূরণ করি। নিচে দেহের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদানগুলোর উৎস, পুষ্টিগত গুরুত্ব এবং অভাবজনিত কুফল উল্লেখ করা হলো :

লৌহ (Fe)

লৌহ রক্তের একটি প্রধান উপাদান। প্রতি ১০০ ml রক্তে লৌহের পরিমাণ প্রায় ৫০ mg। যকৃত, প্লিহা, অস্থিমজ্জা এবং লোহিত রক্তকণিকায় এটি সঞ্চিত থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ৯ mg এবং স্ত্রীলোকের ২৮ mg; গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধদাতা মায়ের ১২–১৪ mg এবং শিশুর ১০ mg লৌহের প্রয়োজন। উদ্ভিজ্জ উৎস হচ্ছে ফুলকপির পাতা, নটেশাক, নিম পাতা, ডুমুর, কাচা কলা প্রভৃতি সবুজ সবজি এবং ভুট্টা, গম, বাদাম, বজরা ইত্যাদি। প্রাণিজ উৎস হচ্ছে মাছ, মাংস, ডিম, যকৃৎ ইত্যাদি। লৌহের প্রধান কাজ হিমোগ্লোবিন গঠনে সহায়তা করা। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে রক্তশূন্যতা রোগ হয়। রক্তশূন্যতা রোগের লক্ষণ চোখ ফ্যাকাসে হওয়া, হাত–পা ফোলা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি।

ক্যালসিয়াম (Ca)

এটি প্রাণীদের অস্থি ও দন্তের একটি প্রধান উপাদান। মানুষের দেহের মোট ওজনের শতকরা দুই ভাগ ক্যালসিয়াম। খনিজ পদার্থের মধ্যে দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এর ৯০% অস্থি এবং দাঁতে ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে সঞ্চিত থাকে। রক্তে এবং লসিকাতে এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। বাড়ন্ত শিশুদের প্রত্যহ ৫০০–৬০০ mg ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রত্যহ ৪৫০ mg এবং গর্ভবতী মহিলার প্রত্যহ ১০০০ mg ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। উদ্ভিজ্জ উৎস–ডাল, তিল, সয়াবিন, ফুলকপি, গাজর, পালংশাক, কচুশাক, লালশাক, কলমিশাক, বাঁধাকপি এবং ফল। প্রাণিজ উৎস– দুধ, ডিম, ছোট মাছ, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি।

অস্থি ও দাঁতের গঠন শক্ত রাখার জন্য ক্যালসিয়াম একটি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। এ ছাড়া ক্যালসিয়াম রক্ত সঞ্চালনে, হৃৎপিণ্ডের পেশির স্বাভাবিক সংকোচনে এবং স্নায়ু ও পেশির সঞ্চালনে সহায়তা করে। ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত কারণে রিকেটস এবং বয়স্ক মহিলাদের অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ হয়। এর অভাবে শিশুদের দাঁত উঠতে দেরি হয় এবং রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটে।

ফসফরাস (P)

দেহে পরিমাণের দিক থেকে খনিজ লবণগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরই ফসফরাসের স্থান। ফসফরাসও ক্যালসিয়ামের মতো অস্থির একটি প্রধান উপাদান। ফসফরাস অস্থি, যকৃৎ এবং রক্তরসে সঞ্চিত থাকে। নিউক্লিক এসিড, নিউক্লিয় প্রোটিন তৈরি এবং শর্করা বিপাকের দ্বারা শক্তি উৎপাদনে ফসফরাস প্রধান ভূমিকা রাখে। বাড়ন্ত শিশুর প্রত্যহ ০.৫–১.৫ gm এ খনিজ লবণের প্রয়োজন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ১০ gm ফসফরাস প্রয়োজন।

উদ্ভিজ্জ উৎস– দানা শস্য, শিম, বরবটি, মটরশুঁটি, বাদাম ইত্যাদিতে পরিমাণমতো ফসফরাস পাওয়া যায়।

প্রাণিজ উৎস– ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, কলিজা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণ ফসফরাস পাওয়া যায়। অস্থি ও দাঁত গঠন করা এর প্রধান কাজ।

ফসফরাসের অভাবে রিকেটস, অস্থিক্ষয়তা, দন্তক্ষয় ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। আহারে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম থাকলে ফসফরাসের অভাব হয় না।

পানি

পানি খাদ্যের একটি উপাদান। মানবদেহের জন্য পানি অপরিহার্য। দেহের গঠন এবং অভ্যন্তরীণ কাজ পানি ছাড়া চলতে পারে না। আমাদের দৈহিক ওজনের ৬০–৭৫% পানি। আমাদের রক্ত, মাংস, স্নায়ু, দাঁত, হাড় ইত্যাদি প্রতিটি অঙ্গ গঠনের জন্য পানির প্রয়োজন।

দেহকোষ গঠন ও কোষের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো পানি ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পানির মাধ্যমে শরীর গঠনের নানা প্রয়োজনীয় উপাদান দেহের সর্বত্র পরিবাহিত হয়। এটি জীবদেহে দ্রাবকের কাজ করে। পানি খাদ্য উপাদানের পরিপাক ও পরিশোষণে সাহায্য করে। বিপাকের ফলে দেহে উৎপন্ন ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি শরীরের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থগুলোকে পানি মূত্র ও ঘাম হিসেবে দেহ থেকে নিষ্কাশন করে। এ ছাড়া পানি দেহ থেকে ঘাম নিঃসরণে ও বাষ্পীভবনের দ্বারা দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

দেহে পানির উৎসগুলো–

১. খাবার পানি, পানীয় যেমন– চা, দুধ, কফি, শরবত।

২. বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণের দ্বারা যেমন– শাক–সবজি ও ফল।

দেহ থেকে মোট নির্গত পানির পরিমাণ গৃহীত পানির পরিমাণের সমান হলে দেহে পানির সমতা বজায় থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ২–৩ লিটার পানি পান করা উচিত। কারণ প্রায় ঐ পরিমাণ পানি প্রত্যহ আমাদের দেহ থেকে নির্গত হয়।

গরম আবহাওয়ায়, কঠোর পরিশ্রমে দেহে পানির অভাব দেখা দেয়। এ সময় পানি পানের পরিমাণ বাড়ানো উচিত। ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণে দেহে পানির অভাব হতে পারে। দেহে পানির অভাবে পিপাসা তীব্র হয়, রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে, ত্বক কুচকে যায়। পানির অভাবে স্নায়ু ও পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহে অম্ল ও ক্ষারের সমতা নষ্ট করে এসিডোসিস রোগের সৃষ্টি করে। শরীরের পানি ১০% কমে গেলে সংজ্ঞা লোপ পায়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। অত্যধিক বমি, ডায়রিয়া ইত্যাদি কারণেও শরীর থেকে অনেক পানি বের হয়ে যায়। দেহে পানির অভাব নিরসনের জন্য যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে লবণপানি অথবা খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হয়। শরীর থেকে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বের হয়ে যায়, খাবার স্যালাইন তা পূরণ করে শরীরে পানি ও লবণের ভারসাম্য ঠিক রাখে।

বডি মাস ইনডেক্স (BMI) বা দেহের ভরসূচি

শিশু জন্মগ্রহণের পর তার দেহের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং পরবর্তী শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে যৌবন ও প্রাপ্তবয়স্কে উপনীত হয়। মানবদেহের বৃদ্ধি ২০–২৪ বছর পর্যন্ত ঘটে এবং তারপর আর বৃদ্ধি (উচ্চতায়) ঘটে না। তখন খাদ্যের কাজ হয় শুধু দেহের ক্ষয়পূরণ এবং দেহকে সুস্থ, সবল নীরোগ রাখা। প্রাপ্তবয়সে সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন দেহের উচ্চতার সাথে দেহের ওজনের একটা সামঞ্জস্য। দেহের উচ্চতার সাথে ওজনের সামঞ্জস্য রক্ষা করার সূচককে বিএমআই (BMI এর পূর্ণ নাম Body Mass Index) বা ভরসূচি বলা হয়। একে অনেকে Quetelet Index ও বলে। উচ্চতার সাথে যদি দেহের ওজনের সামঞ্জস্য থাকে, তবেই পুষ্টিগত দিক থেকে শরীর সুস্থ বলা হয়।

বিএমআইয়ের সূত্র হচ্ছে– দেহের ওজন (কেজি) ÷ [দেহের উচ্চতা (মিটার)]^2 অর্থাৎ দেহের ওজনকে দেহের উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে ফল হবে, সেটি হবে সেই ব্যক্তির বি এম আই বা ভরসূচি।

ধরা যাক একজনের দেহের ওজন ৮০ কেজি এবং উচ্চতা ১.৮ মিটার হলে,

$$\text{বি এম আই} = \frac{৮০}{১.৮ \times ১.৮} = ২৪.৭ \text{ (প্রায়)}$$

আমাদের দেহে চর্বির পরিমাণের নির্দেশক হচ্ছে বিএমআই।

দৈনিক খাবার কেমন হবে

এ অধ্যায়ে খাদ্যের পুষ্টিগত গুরুত্ব আলোচনার সময় ক্যালরি ও কিলোক্যালরি সম্বন্ধে ধারণা পেয়েছি।

টেবিল : একজন বাংলাদেশির প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় ক্যালরি

(ব্রাকেট ছাড়া সংখ্যা পুরুষের এবং ব্রাকেটের মধ্যের সংখ্যা মহিলার প্রয়োজনীয় ক্যালরি প্রকাশ করে।)

বয়স	ক্যালরি চাহিদা (কিলোক্যালরি)	বয়স	ক্যালরি চাহিদা (কিলোক্যালরি)
০–১	৮২০ (৮২০)	৪০–৪৯	২৬২০ (১৯০০)
১–৩	১৩৬০ (১৩৬০)	৫০–৫৯	২৪৮০ (১৮০০)
৪–৬	১৮২০ (১৮২০)	৬০–৬৯	২২১০ (১৬০০)
৭–৯	২১৯০ (২১৯০)	৭০–৭৯	১৯৩০ (১৪০০)
১০–১২	২৬০০ (২৩৫০)	গর্ভবতী মাতা প্রথম তিন মাস	+১৫০
১৩–১৫	২৬৮০ (২২৬০)	পরবর্তী ছয় মাস	+৩৫০
১৬–১৯	২৮২০ (২১০০)	দুগ্ধদানকারী মাতা	+৭৫০
২০–৩৯	২৭৬০ (২০০০)		

দেহের ওজন : প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ = ৬০ কেজি; প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা = ৫০ কেজি;

Source : Nutritive Value of Bangladeshi Common Foods, Institute of Nutrition and Food Science, University of Dhaka.

ক্যালরি প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে সাধারণভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য এমন খাবার হলো–

১. প্রোটিন জাতীয় : মোট ক্যালরির ১৫ শতাংশ;

২. শর্করা জাতীয় (বেশির ভাগই কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট হবে, চিনি জাতীয় হবে না) : মোট ক্যালরির ৫০–৬০ শতাংশ; এবং

৩. চর্বি জাতীয় : (ক) সম্পৃক্ত (স্যাচুরেটেড)–মোট ক্যালরির ৭ শতাংশ। (খ) অসম্পৃক্ত (মনো–আনস্যেচুরেটেড) –মোট ক্যালরির ২০ শতাংশ পর্যন্ত।

কাজ : ইলিশ মাছ, মুরগির ডিম, চর্বিযুক্ত মাংস, মসুর ডাল, দই, ভাত, গোল আলু, চিনি, তেল, মিষ্টি কুমড়া, ফুলকপি, টমেটো, ছোট মাছ, ছোলা, আইসক্রিম, রুটি, মধু, ঘি, পুঁইশাক, কাঁঠাল, আম।

উপরে আমাদের অতি পরিচিত ২১ প্রকার খাদ্য আছে। এ খাদ্যগুলো নিয়ে খাদ্যের উপাদানের একটি তালিকা তৈরি কর।

শর্করা	আমিষ	স্নেহ পদার্থ	ভিটামিন ও খনিজ লবণ	
			শাক সবজি	ফল

এবার তুমি একটি স্বল্পমূল্যের ও একটি অধিক মূল্যের খাদ্যতালিকা প্রস্তুত কর। নিচের ছক অনুসারে–

খাদ্যতালিকা (কম দামের)

খাদ্য উপাদানের নাম	খাদ্যের নাম
১. শর্করা	
২. আমিষ	
৩. স্নেহ	
৪. ভিটামিনসমৃদ্ধ তরকারি/ফল	
৫. খনিজ লবণযুক্ত তরকারি/ফল	

খাদ্যতালিকা (বেশি দামের)

খাদ্য উপাদানের নাম	খাদ্যের নাম
১. শর্করা	
২. আমিষ	
৩. স্নেহ	
৪. ভিটামিনসমৃদ্ধ তরকারি/ফল	
৫. খনিজ লবণযুক্ত তরকারি/ফল	

সুষম খাদ্য

আমরা পূর্বে জেনেছি, খাদ্য কী এবং খাদ্যের উপাদানসমূহ কী কী। অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ যেমন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি অল্প খাদ্য গ্রহণও স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর নয়। তাই আমাদের দেহকে সুস্থ রাখার জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক।

সুষম খাদ্য বলতে কোনো নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তুকে বোঝায় না। সুষম খাদ্য হলো বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর এমন সমাহার, যার মধ্যে

খাদ্য উপাদানের সবগুলোই পরিমাণমতো থাকে এবং যা থেকে স্বাভাবিক কাজ–কর্মের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালরি পাওয়া যায়। যে খাদ্যে ছয়টি উপাদানই গুণাগুণ অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং যে খাদ্য গ্রহণ করলে দেহের স্বাভাবিক কাজ–কর্মের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালরি পাওয়া যায়, তাকে সুষম খাদ্য বা ব্যালান্সড ডায়েট বলে। যেমন– একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ কর্মশীল পুরুষের প্রত্যহ প্রায় ২৫০০–৩০০০ কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন। এ শক্তি বা ক্যালরি আমরা খাদ্য থেকে পাই। সেজন্য আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এমন ধরনের খাদ্য থাকা দরকার, যাতে সে খাদ্যের মধ্যে ছয়টি উপাদানই সঠিক পরিমাণে থাকে।

সুষম খাদ্যতালিকা তৈরির সময় মানুষের বয়স, লিঙ্গভেদ, কী রকম কাজ করে অর্থাৎ অধিক পরিশ্রমী, মাঝারি পরিশ্রমী, স্বল্প পরিশ্রমী ইত্যাদি বিবেচনা করা দরকার। শিশু ও বৃদ্ধদের খাদ্যতালিকায় সহজপাচ্য ও চর্বি বর্জিত খাদ্যের প্রাধান্য থাকতে হবে। বাড়ন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য এবং হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সমৃদ্ধ খাদ্য থাকতে হবে। গর্ভবতী মহিলাদের খাদ্যতালিকায় রক্ত উৎপাদনের জন্য ও ভ্রূণস্থ শিশুর বৃদ্ধির জন্য বাড়তি প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও আয়োডিন থাকা খুবই প্রয়োজন। কোনো নির্দিষ্ট সুষম খাদ্য প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। সুষম খাদ্য তৈরি করে নিতে হয়।

রাফেজ বা আঁশ

রাফেজ প্রধানত উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ শস্যবীজ, ডাল, আলু, খোসাসমেত টাটকা ফল এবং শাক–সবজি রাফেজের প্রধান উৎস। এগুলো ছাড়াও শুকনা ফল, জিরা, ধনে, মটরশুঁটি প্রভৃতিতে বেশ রাফেজ পাওয়া যায়। এগুলোর দীর্ঘ তন্তুময় অংশকে রাফেজ বলা হয়। রাফেজ মূলত সেলুলোজ নির্মিত উদ্ভিদ কোষপ্রাচীর। রাফেজ আমাদের দেহে কোনো পুষ্টি যোগায় না। রাফেজ কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এ রোগগুলো কীভাবে প্রতিরোধ করে তা এখন পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। রাফেজ সরাসরি খাদ্যনালির মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হতে পারে। এটি খাদ্যনালির গাত্রে কোনোরূপ পিন্ড তৈরি করে না বলে রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

রাফেজভুক্ত খাবারের গুরুত্ব নিম্নরূপ :–

১. এটি পরিপাকে সহায়তা করে। রাফেজ পানি শোষণ করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

২. শরীর থেকে অপাচ্য খাদ্য নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৩. এটি শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে।

৪. বারবার ক্ষুধার প্রবণতা কমাতে এটি কাজ করে।

৫. ধারণা করা হয়, রাফেজযুক্ত খাদ্য গ্রহণে পিত্তথলির রোগ, খাদ্যনালি ও মলাশয়ের ক্যান্সার, অর্শ, অ্যাপেন্ডিকস, হৃদ্‌রোগ ও স্থূলতা অনেকাংশে হ্রাস করে।

এ কারণে প্রতিদিন ২০–৩০ গ্রাম আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। শাক–সবজি ও ফল থেকে এ পরিমাণ আঁশ পাওয়া যায়।

সুষম খাদ্যের তালিকা বা মেনু

পরিবারের সদস্যদের সুষম খাদ্য পরিবেশনের জন্য তালিকা বা মেনু তৈরি করে নেওয়া উচিত। মেনু পরিকল্পনার মাধ্যমেই

পুষ্টি সংবলিত আকর্ষণীয় খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। মেনু পরিকল্পনার সময় কতকগুলো বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে–

১. বয়স, কাজকর্ম, নারী–পুরুষ ভেদে খাদ্যের চাহিদা ও খাওয়ার রুচি ভিন্ন হয়। মেনু পরিকল্পনার সময় এ দিকগুলো লক্ষ রেখে খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

২. আবহাওয়া ও মৌসুম মেনু পরিকল্পনার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মেনুতে সহজলভ্য মৌসুমি খাদ্যদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এতে পরিবারের সদস্যদের ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা পূরণ হবে।

৩. মেনুতে দেহ গঠনের উপযোগী খাদ্য রাখতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল আমাদের দেহ গঠন করে থাকে। মেনু পরিকল্পনার সময় এ দিকটি লক্ষ রাখতে হবে।

৪. মেনুতে শক্তি ও তাপ সরবরাহকারী খাদ্য যেমন– চাল, গম, আলু, গুড়, চিনি পরিমাণমতো আছে কি না, তা খেয়াল রাখতে হবে।

৫. মেনুতে প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টিমান ও ক্যালরি–সংবলিত খাবার আছে কি না সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে।

৬. খাদ্য সুষম হয়েছে কি না, মেনু পরিকল্পনার সময় তা লক্ষ রাখতে হবে।

৭. খাদ্য গ্রহণ নির্ভর করে খাদ্যাভ্যাসের ওপর। মেনু পরিকল্পনার সময় খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে।

৮. পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির দিক চিন্তা করে মেনু প্রস্তুত করতে হবে। পরিমিত খরচে খাদ্য সংগ্রহ করার দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৯. খাদ্যে কীভাবে বৈচিত্র্য আনা যায়, মেনু পরিকল্পনার সময় এ দিকটিও ভাবতে হবে।

১০. মেনু পরিকল্পনার সময় খাদ্য যেন অপচয় না হয় এ দিকটিও লক্ষ রাখতে হবে।

কিশোর–কিশোরীর (১৫–১৮ বছর বয়সীদের) দৈনিক সুষম খাদ্যতালিকা

খাদ্য	পরিমাণ (গ্রাম)
চাল/আটা	৪৩৮
ডাল	৫০
পাতাবহুল সবজি	৮৮
আলু/মিষ্টি আলু	১১৬
অন্যান্য সবজি	৮৮
মাছ/মাংস/ডিম	৫৮
স্নেহ দ্রব্য/তেল	৩০ মি.লি.
চিনি/গুড়	৫৮
ফল	১টা

পূর্ণবয়স্ক মহিলা ও পুরুষের দৈনিক সুষম খাদ্যতালিকা

খাদ্য	পরিমাণ (পুরুষ)	পরিমাণ (মহিলা)
চাল/আটা	৪৬৮ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম
ডাল	৮৮ ”	৪৪ ”
পাতাবহুল সবজি	৮৮ ”	১৪৬ ”
আলু/মিষ্টি আলু	১১৬ ”	৮৮ ”
অন্যান্য সবজি	৮৮ ”	৫৮ ”
মাছ/মাংস/ডিম	৫৮ ”	৫৮ ”
স্নেহ দ্রব্য/তেল	৫৮ মি.লি.	৫৫ মি.লি.
চিনি/গুড়	৫৮ গ্রাম	৫৮ গ্রাম
ফল	১ টা	১ টা

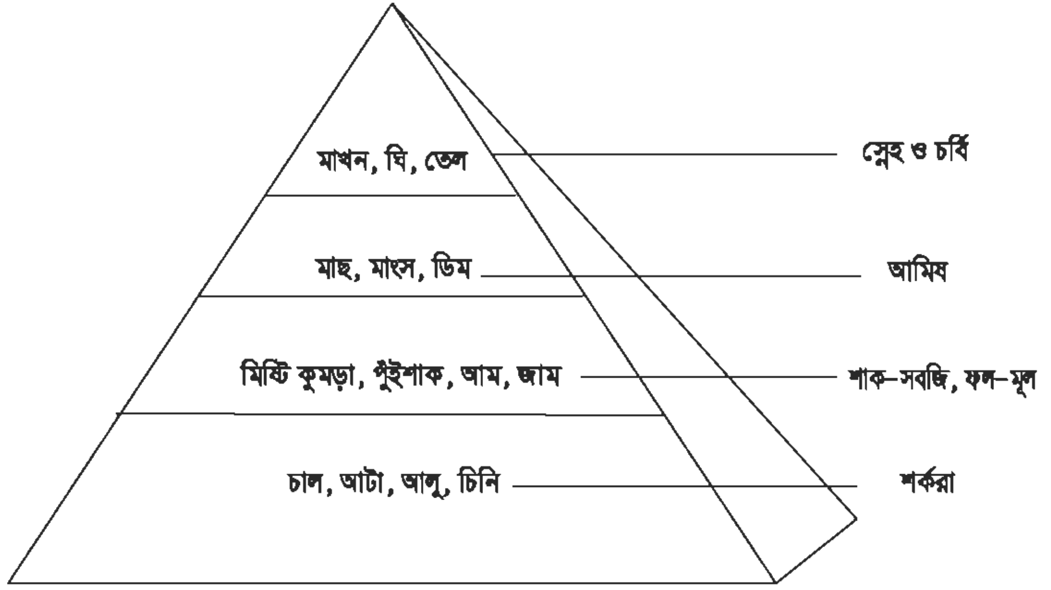
Source : Pushti Biddya. Institute of Nutrition and Food Science, University of Dhaka.

সুষম খাদ্য যেভাবে প্রস্তুত করা হয়

শর্করা	প্রোটিন	স্নেহ পদার্থ	ভিটামিন	খনিজ লবণ
ভাত	মাছ	মাখন	দুধ, ডিম	দুধ
রুটি	মাংস	তেল	ফলমূল	ডিম
চিনি/গুড়	ডিম	ঘি	মাছ, মাংস	শাক–সবজি

সুষম খাদ্য পিরামিড

যে কোনো একটি সুষম খাদ্যতালিকায় শর্করা, শাক–সবজি, ফল–মূল, আমিষ ও স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। একজন কিশোর বা কিশোরী, প্রাপ্তবয়স্ক একজন পুরুষ বা মহিলার সুষম খাদ্যতালিকা লক্ষ করলে দেখা যায় যে তালিকায় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। শর্করাকে নিচু স্তরে রেখে পর্যায়ক্রমে পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে শাক–সবজি, ফল–মূল, আমিষ, স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে সাজালে যে কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয়, তাকে সুষম খাদ্য পিরামিড বলে। চিত্রে এই পিরামিডের শীর্ষে রয়েছে স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য আর সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে শর্করা।



চিত্র : ১.১ সুষম খাদ্য পিরামিড

উন্নত জীবনযাপনের জন্য খাদ্য উপাদান বাছাই

সব মানুষের খাদ্যাভ্যাস এক রকম নয়। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে খাদ্যদ্রব্যের প্রাপ্যতা সব দেশে এক রকম নয়। শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপ অনুসারে খাদ্যের প্রয়োজন ও প্রভেদ আছে। সকল প্রকার পরিবেশে জীবনকে মানিয়ে চলাই জীবনের ধর্ম। এ জন্য দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে এবং শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো সাধনে মূল খাদ্য উপাদানগুলোর বিশেষ ভূমিকা এবং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে মূল উপাদানগুলোর পরিমাণ ও শক্তিমূল্য (ক্যালরি ভ্যালু) বিচার করে উন্নত জীবনযাপনের জন্য খাদ্য উপাদান বাছাই করা আবশ্যক।

পুষ্টি বিশারদগণ পুষ্টির উৎসকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো– মাংস, দুধ, ফল ও সবজি এবং শস্যদানা।

মাংস ছাড়া মাংসের সমতুল্য খাদ্যের মধ্যে পড়ে মাছ, ডিম ও ডাল (মটর, ছোলা ও বাদাম)।

দুধের মধ্যে পড়ে দুধ ছাড়াও পনির ও দই।

ফল ও সবজির মধ্যে পড়ে সকল ভোজ্য ফল ও গ্রহণযোগ্য সবজি।

শস্যদানার মধ্যে পড়ে শস্য ও শস্যদানা থেকে তৈরি খাবার যেমন– রুটি, ভাত।

সুষম খাদ্য পেতে হলে প্রতিদিন এই চার শ্রেণির খাদ্য খেতে হবে। এই চার শ্রেণি থেকে খাদ্য নির্বাচনে বৈচিত্র্য থাকা উচিত বলে পুষ্টিবিদগণ মনে করেন।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত খাদ্য তালিকা তৈরি করার সময় তাতে প্রয়োজনীয় আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ যাতে উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

সকালের খাবার আমাদের দেশে অত্যন্ত হালকা ধরনের হয়ে থাকে। আজকাল গ্রাম বা শহরে প্রায় সর্বত্রই বয়স্কদের

সকালের দিকে চা পান করতে দেখা যায়। শহর অঞ্চলে অনেকে কেবল এক কাপ চা পান করে সকালের খাবার শেষ করে থাকেন। এটি শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। চায়ের সাথে অন্তত হালকা কিছু খাবার গ্রহণ করা উচিত। সকাল বেলায় খাবার হিসেবে রুটি, মাখন বা একটি ডিম, একটি কলা খেতে পারলে দেহের যাবতীয় পুষ্টি উপাদানগুলো সংগ্রহ করা সহজ হবে। গরমের দিনে আখের গুড়ের সাথে চিঁড়া ভিজিয়ে খেলে শরীর সুস্থ থাকে।

আমাদের দেশে দুপুরের খাবারকে সাধারণত প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুপুরের খাবারে খাদ্য উপাদান বাছাইয়ে অবশ্যই সুষম খাদ্যতালিকার সাহায্য নিয়ে সেভাবে খাদ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

গরমের দেশে মাংসের বদলে মাছই প্রোটিনের উৎকৃষ্ট উৎস। তবে শীতকালে মাংস বেশি খেলে শরীরের ক্ষতি হয় না। খাওয়ার শেষে টক দই অথবা ফল খাদ্যতালিকায় থাকলে ভালো হয়।

আমাদের দেশে স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এবং চাকরিজীবীদের দুপুরে খাবার সময় ঠিক থাকে না। তাই তারা বিকেলে কিছু হালকা খাবার খেয়ে থাকেন। আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী বিকেলের জন্য এমন খাদ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, যাতে সকল ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে।

রাতের খাবার সাধারণত সহজপাচ্য হওয়া উচিত। এজন্য রাতে আমিষ জাতীয় খাবার কম খাওয়া ভালো। রাতে শাক বা টক জাতীয় কোনো খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে দুধ বা অন্য শক্তি উৎপাদক তরল খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এভাবে খাদ্য বাছাই করে উন্নত জীবন যাপন করা যেতে পারে।

ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড : ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড হচ্ছে এমন এক ধরনের খাবার, যা এর স্বাস্থ্যগত মূল্যের চেয়ে বরং এর মুখোরচক স্বাদের জন্য উৎপাদন করা হয়। এটা খাওয়া খুব মজার এবং এটাকে খুব আবেদনময় মনে হতে পারে, কিন্তু এটা শরীরের জন্য ভালো নয়। এতে প্রায়শই অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যা একে সুস্বাদু করে তোলে, কিন্তু এগুলো অস্বাস্থ্যকর। এতে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে প্রাণিজ চর্বি ও চিনি থাকে। বার্গার, ক্রিসপস (মচমচে ভাজা খাবার), পিঠা ও বিস্কুটে প্রাণিজ চর্বি উচ্চমাত্রায় থাকে। মিষ্টি, কোলা ও লেমনের মতো গ্যাসীয় বুদবুদযুক্ত পানীয় চিনির দিক দিয়ে উচ্চমাত্রার। আমরা যখন অধিক পরিমাণে চর্বি জাতীয় খাবার খাই, তখন আমাদের দেহ এগুলোকে চর্বিকলায় রূপান্তরিত করে এবং অধিক পরিমাণে চিনি আমাদের দাঁত ও ত্বককে নষ্ট করে দিতে পারে। ফাস্ট ফুড কখনো সুষম খাদ্যের মধ্যে পড়ে না। ফাস্ট ফুডে আমাদের জন্য দরকারি ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব রয়েছে। ফাস্ট ফুড খাওয়ার কারণে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের দেহ স্থূলকায় হয়ে পড়ে। প্যাকেট বা কৌটাজাত খাবারের চেয়েও প্রাকৃতিক সজীব খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

খাদ্য সংরক্ষণ

প্রাকৃতিক কারণে সব ধরনের খাদ্য নষ্ট বা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো হচ্ছে– জীবাণু ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং পরিবেশের কারণে সেগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি, খাদ্যের মধ্যে উৎসেচকের বৃদ্ধি, পরিবেশে আর্দ্রতা, তাপ ও অম্লের পরিমাণ বৃদ্ধি। এই কারণগুলো এককভাবে খাদ্যকে নষ্ট করে না। কয়েকটি কারণ একত্রে সংগঠিত হয়ে খাদ্য নষ্ট করে। যেমন, পরিবেশে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে খাদ্যবস্তুর উৎসেচকের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে খাদ্যকে নষ্ট করে।

ব্যাকটেরিয়া খাদ্য নষ্ট করে এক ধরনের বিষাক্ত উপাদান উৎপন্ন করে। এই বিষাক্ত উপাদানগুলোকে টক্সিন বলে। এই টক্সিনগুলো বিভিন্ন রকমের হয়। খাদ্যের এ অবস্থাকে আমরা food poisoning বলি। কিছু টক্সিন স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

ঈস্ট জাতীয় ছত্রাক ফলের রস, টমেটোর সস, জেলি, মিষ্টি আচার, শরবত ইত্যাদি খাবার দ্রুত নষ্ট করে ফেলে। এতে খাবারে টক গন্ধ হয় এবং ঘোলাটে হয়ে যায়। যদি পাউরুটি কয়েক দিন খোলা স্থানে রাখা যায়, তাহলে দেখা যায় এর ওপর ধূসর বর্ণের আবরণ তৈরি হয়েছে। এটি মোলড জাতীয় ছত্রাক যেমন– মিউকর, এসপারজিলাস প্রভৃতি ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কমলালেবু, টমেটো, পনির, আচার প্রভৃতি টক জাতীয় খাবার এগুলোর দ্বারা নষ্ট হয়।

খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা এক ঋতুর ফল, শস্য, সবজি, মাছ ও অন্যান্য খাদ্য অন্য ঋতুতেও পেতে পারি। বছরের কোন একটি সময়ে ও স্থানে কোন ফসলের উৎপাদন খুব বেশি হলে তা সংরক্ষণের মাধ্যমে অন্য সময়ে ব্যবহার, বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর বা রপ্তানি করতে পারি। কাজেই খাদ্যের গুণগত মান ঠিক রেখে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্ন উপায়ে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি এবং আমাদের ঘাটতি মেটাতে পারি।

খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

প্রকৃতপক্ষে খাদ্য নষ্ট হয় জীবাণু বৃদ্ধি ও জীবাণু দ্বারা নিঃসৃত উৎসেচকের ক্রিয়ার ফলে। পানি ও উষ্ণতা–জীবাণু বৃদ্ধির ও উৎসেচকের ক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য খুবই উপযোগী অবস্থা। ফলে এ অবস্থা খাদ্যকে দ্রুত পচনে প্রভাবিত করে। পচনের সাহায্যকারী এসব বিষয়কে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে খাদ্য বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয় বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। গৃহে সাধারণ সংরক্ষক দ্রব্যের ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। এরকম কয়েকটি পদ্ধতির নাম এখানে উল্লেখ করা হলো–

১. **শুষ্ককরণ :** খাদ্যবস্তুকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা একটি প্রাচীন পদ্ধতি। শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু থেকে পানি শুকিয়ে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি এবং এনজাইম ক্রিয়াকে প্রতিহত করা যায়। খাদ্যকে অনেক দিন পর্যন্ত এভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

২. **রেফ্রিজারেশন :** এ পদ্ধতিতে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ও এনজাইমের ক্রিয়া– কোনোটাই দীর্ঘদিনের জন্য প্রতিরোধ করা যায় না। রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে কাঁচা শাক–সবজি, ফল, রান্না করা খাদ্য, মিষ্টি জাতীয় খাবার কিছুদিন পর্যন্ত রাখা যায়।

৩. **ফ্রিজিং :** ফ্রিজিং পদ্ধতিতে খাদ্যকে ও খাদ্যদ্রব্যকে ০° ফারেনহাইট অথবা তার নিচের তাপমাত্রায় রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘদিন ভালো থাকে। ফ্রিজিং পদ্ধতিতে শুধু টাটকা শাক–সবজি, ফল, ফলের রস, মাছ, মাংস সংরক্ষণ করা হয় না, এ পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত খাবার, আইসক্রিম ও অন্য বিভিন্ন রকমের তৈরি খাবার সংরক্ষণ করা যায়।

৪. **সংরক্ষক দ্রব্য :** রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা খাদ্যের পচন রোধ করা যায়। এগুলোকে সংরক্ষক (Preservative) বলে। এগুলোর কোনো পুষ্টিগুণ নেই। খাদ্যে নির্ধারিত পরিমাণে সংরক্ষক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। সঠিক পরিমাণের মাত্রা জেনে খাদ্যে প্রয়োগ করা উচিত। রাসায়নিক সংরক্ষক পদার্থগুলো বিভিন্ন ধরনের এবং ব্যবহারও

বিভিন্ন রকম। খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করা এবং খাদ্যে যাতে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে না পারে সেজন্য রাসায়নিক সংরক্ষক ব্যবহার করা হয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক সংরক্ষক নিচে উল্লেখ করা হলো –

(১) ভিনেগার আমাদের অতিপরিচিত। আচার, চাটনি, সস প্রভৃতিতে ভিনেগার ব্যবহার করে জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করা হয়। এসেটিক এসিডের ৫% দ্রবণকে ভিনেগার বলে।

(২) সালফেটের লবণ যেমন Sodium bisulphite অথবা Potassium-meta bisulphite ব্যবহার করে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যায়।

(৩) Sodium benzoate– এটি Benzoic acid–এর লবণ। এটি বিশেষ করে ছত্রাক ঈস্ট এর বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। ফলের রস, ফলের শাঁস ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য Sodium benzoate খুব উপযোগী।

উপরে উল্লিখিত রাসায়নিক সংরক্ষকগুলো ছাড়া Propionic Acid-এর লবণ এবং Sorbic Acid–এর লবণ Sorbates ব্যবহার করে দই, মিষ্টি, পনির, মাখন ও বেকারি সামগ্রী সংরক্ষণ করা হয়।

উপরে উল্লিখিত রাসায়নিক সংরক্ষকগুলো একেক ধরনের খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। নির্দিষ্ট পরিমাণে এই রাসায়নিক পদার্থগুলোকে ব্যবহার না করে যদি যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেগুলো মানবদেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৫. চিনি বা লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ : চিনি ও লবণের দ্রবণ খাদ্যসংরক্ষক হিসেবে বহুবছর পূর্ব থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লবণের দ্রবণকে ব্রাইন বলে। চিনি ও লবণের ঘন দ্রবণ জীবাণুদের বহি–অভিস্রবণের দ্বারা অণুজীবগুলোকে ধ্বংস করে খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করে।

চিনি প্রয়োগ করে ফলের জ্যাম, জেলি ও মারমালেড এবং পেয়ারা, আপেল, আনারস জাতীয় ফলকে কেটে পরিষ্কার করে চিনির ঘন দ্রবণে রেখে বায়ু নিরোধী করে দীর্ঘদিন রাখা যায়।

সংরক্ষিত খাদ্য ব্যবহারের পূর্বে লক্ষ করতে হবে– যদি খাদ্যের রঙের পরিবর্তন ঘটে অথবা খাদ্য ফুলে উঠে, খাদ্যের উপর সাদা অথবা কালো আস্তরণ সৃষ্টি হয় এবং খাদ্যের ওপরটা পিচ্ছিল হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে খাদ্যে পচনক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ খাদ্যের বিষক্রিয়ার ফলে শারীরিক ক্ষতি হবে।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও এর শারীরিক প্রতিক্রিয়া

বর্তমানে দুধ, ফল, মাছ এমনকি মাংসকে পচন থেকে রক্ষা করার জন্য যথেচ্ছ ফরমালিন নামক বিষাক্ত এক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য এটির ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশে কিছু অসাধু ও বিবেকবর্জিত ব্যবসায়ী ফরমালিনকে খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করছে। এটির দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে মানবদেহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হতে পারে যেমন– বদহজম, পাতলা পায়খানা, পেটের নানা পীড়া, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, লিভার ও কিডনি নষ্ট হওয়াসহ ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধি হতে পারে। ফরমালিন দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে মেয়েদের গর্ভজাত সন্তান বিকলাঙ্গও হতে পারে।

বিভিন্ন ফল যেমন–আম, টমেটো, কলা ও পেঁপে যাতে দ্রুত পাকে, তার জন্য Ripen এবং Ethylene নামক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো ফল পাকানোর জন্য ব্যবহার করলে সে ফলকে ৭–৮ দিন পর

বাজারজাত করা উচিত। কিন্তু তা না করে ২–৩ দিনের মধ্যে বাজারজাত করা হয়। এতে রাসায়নিক পদার্থগুলোর কার্যকারিতা থেকে যায় এবং এ ধরনের ফল খাওয়ার ফলে মানবশরীরে জটিল রোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

এছাড়া ক্যালসিয়াম কার্বাইড নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে ব্যবহার করা হচ্ছে ফল পাকানোর জন্য। এটি এমন ধরনের যৌগ যা বাতাসের বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসেই উৎপন্ন করে অ্যাসিটিলিন গ্যাস, যা পরবর্তীতে অ্যাসিটিলিন ইথানল নামক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এটি স্বাস্থ্যের ভয়ানক ক্ষতি করে।

আম যাতে দ্রুত না পাকে এবং গাছে দীর্ঘদিন থাকে, তার জন্য আমাদের দেশে আম ব্যবসায়ীরা কালটার (culter) নামের হরমোন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ গাছে স্প্রে করে। এতে ফল দ্রুত পরিপক্ক হয় ও পাকে না এবং গাছে দীর্ঘদিন থাকে। এটিও স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়।

এসব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য ভোক্তা অধিকার রক্ষায় ভোক্তা আইন আরও কঠিনভাবে প্রয়োগের নিমিত্তে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম যেমন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের দ্বারা সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জনগণকে সচেতন হতে হবে এ ধরনের ফল ক্রয় না করার জন্য। যারা এ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে খাদ্য সংরক্ষণ করে এবং ফল পাকায়, এ ধরনের অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও জনগণের সচেতনতা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

তামাক ও ড্রাগস

তামাক গাছের পাতা ও ডাল শুকিয়ে তামাক তৈরি হয়। শুকনা তামাকপাতা কুচি কুচি তরে কেটে তাকে বিশেষ কাগজে মুড়িয়ে সিগারেট এবং তামাক দিয়ে সিগারেট এবং পাতায় মুড়িয়ে বিড়ি ও চুরুট বানানো হয়। এগুলোকে পুড়িয়ে তার ধোঁয়া ও বাষ্প সেবনকে ধূমপান বলে। তামাক থেকে নিকোটিন নামক পদার্থ বের হয়, যা মাদকদ্রব্য হিসেবে নার্ভকে যেমন সাময়িক ভাবে উত্তেজিত করে, তেমনি নানাভাবে শরীরের ক্ষতিসাধন করে। তবে ধূমপান করলে নিকোটিন ছাড়া আরও কিছু বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয়ে শরীরে প্রবেশ করে। ধূমপানের ধোঁয়ায় উল্লেখযোগ্য বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থ এবং মাদকদ্রব্যের সংমিশ্রণ থাকে। এই পদার্থগুলো রক্তের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহনক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এছাড়া কতগুলো আঠালো পদার্থ ও হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি এতে থাকে, যা ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

ধূমপানের ক্ষতিকর দিক

শুকনা তামাকপাতা কুচি কুচি করে কেটে তাকে বিশেষ কাগজে মুড়িয়ে সিগারেট এবং পাতায় মুড়িয়ে বিড়ি ও চুরুট বানানো হয়। এগুলোকে পুড়িয়ে তার ধোঁয়া ও বাষ্প সেবনকে ধূমপান বলে। ধূমপানের ফলে মানবদেহে যেসব ক্ষতিকারক অবস্থা ও রোগ দেখা দেয় সেগুলো হলো–

১. ধূমপায়ীরা দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

২. ধূমপায়ীরা কোনো না কোনো রোগে ভোগে যেমন– ফুসফুস ক্যান্সার, ঠোঁট, মুখ, ল্যারিংক্স, গলা ও মূত্রথলির ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, পাকস্থলীতে ক্ষত এবং হৃদযন্ত্র ও রক্তঘটিত রোগ। ফুসফুসে ক্যান্সার দেখা দিলে রোগী প্রায় ৫ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে।

৩. সমীক্ষায় দেখা গেছে যারা বেশি ধূমপান করে, তাদের আয়ু কমে যায় ও নানা রোগের শিকার হয়।

৪. যেসব লোক ধূমপান করে না অথচ ধূমপায়ীদের কাছাকাছি থেকে ধূমপায়ীর নির্গত ধোঁয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে নেয় তাদের ক্ষতি বেশি হয়।

ধূমপান ও তামাকজাত পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রচেষ্টাসমূহ

১. বাস, রেল, খোলা স্থানে, রেস্তোরায়, অফিস, হাসপাতাল, রেলস্টেশন প্রভৃতি এলাকায় ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যত্রতত্র ধূমপান করা আইনত দণ্ডনীয় এবং আমাদের দেশে এর জন্য আইনও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই আইনের কোনো প্রয়োগ না থাকার কারণে মানুষ যেখানে–সেখানে ধূমপান করে আশপাশের বায়ুকে দূষিত করে। প্রচলিত আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. বিক্রয়যোগ্য তামাকজাত পদার্থের মোড়কে "ধূমপান বিষপান" বা "ধূমপান শরীরের জন্য ক্ষতিকর" কথাগুলো ছাপানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৩. তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

৪. স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিকটে সিগারেট ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা অতীব প্রয়োজন।

ড্রাগ আসক্তি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ড্রাগের সংজ্ঞা দিয়েছে। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ড্রাগ এমন সব পদার্থ, যা জীবিত প্রাণী গ্রহণ করলে তার এক বা একাধিক স্বাভাবিক আচরণের পরিবর্তন ঘটে।

ড্রাগকে সাধারণ ভাষায় আমরা মাদক বলি। ক্রমাগত মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে যখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে মাদকদ্রব্যের সাথে মানুষের দৈহিক ও মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে মাদক সেবন ছাড়া নানা সমস্যায় পড়ে তখন তাকে বলে মাদকাসক্ত বা ড্রাগ নির্ভরতা।

উল্লেখযোগ্য ড্রাগ যেগুলোর ওপর মানুষের আসক্তি সৃষ্টি হয়, সেগুলো হচ্ছে আফিম ও আফিমজাত পদার্থ, হেরোইন, মদ, পেথিডিন, বারবিচুরেট, কোকেন, ভাং, চরস, ম্যারিজুয়ানা, এলএসডি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে হেরোইন সবচেয়ে মারাত্মক ড্রাগ।

ড্রাগের ওপর কোনো ব্যক্তির আসক্তি নানাভাবে জাগতে পারে, যেমন– কৌতূহল, সঙ্গদোষ, হতাশা দূর করার জন্য, মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য, নিজকে বেশি কার্যক্ষম করার উদ্দেশ্যে, পরিবারে অশান্তি এবং পারিবারিক অভ্যাসগত। বাবা বা মা কোনো মাদকে আসক্ত থাকলে তার থেকে সন্তানে ওই মাদকে আসক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

মাদকাসক্তির লক্ষণ

যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্যে আসক্ত, তার মধ্যে কতগুলো লক্ষণ প্রকাশ পায়। এমন লক্ষণগুলো সাধারণত স্বাভাবিক মানুষের

মধ্যে দেখা যায় না। উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলো হলো–

১. খাওয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। ২. সবসময় অগোছালোভাব ৩. দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা এবং চোখ লাল হওয়া। ৪. কোনো কিছুতে আগ্রহ নষ্ট হওয়া ও ঘুম না হওয়া ৫. কর্মবিমুখতা ও হতাশা। ৬. শরীরে অত্যধিক ঘাম নিঃসরণ। ৭. সবসময় নিজেকে সবার থেকে দূরে রাখা। ৮. আলস্য ও উদ্বেগ ভাব। ৯. মনঃসংযোগ নষ্ট হওয়া, টাকা–পয়সা চুরি করা ও বাড়ির জিনিসপত্র উধাও করা ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কোনো ব্যক্তির ড্রাগের ওপর আসক্তি জন্মালেও কিছু সামাজিক তথা পরিবেশের কারণেও মাদকদ্রব্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আসে, আর তা থেকে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

মাদকাসক্তির কতগুলো কারণ ছকে উল্লেখ করা হলো–

পরিবেশগত কারণ	পরিবারের কারণ
১. মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা	১. বাবা–মার নিয়ন্ত্রণের অভাব
২. বেকারত্ব	২. হতাশা
৩. অসামাজিক পরিবেশ	৩. একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা
৪. অল্প বয়সে স্কুল থেকে বিদায়	৪. সন্তানের বেপরোয়া ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া
৫. সিনেমা বা কোনো টিভি সিরিয়াল দেখা	৫. পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা
৬. আশপাশে ড্রাগের রমরমা ব্যবসা	৬. সন্তানের প্রতি যত্নহীনতা
৭. পেশাগত কারণ	৭. উগ্র জীবনযাত্রা বা মানসিকতা
৮. অসামাজিক কাজ ও অপরাধ বেশি হয়, সে সব স্থানে বাস করা	৮. খারাপ সাহচর্য
৯. যেখানে ড্রাগ নেওয়ার সুযোগ বা দল থাকে	

ড্রাগ আসক্তি নিয়ন্ত্রণ

কোনো ব্যক্তি ড্রাগের উপর আসক্ত হলে তা বন্ধ করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ ড্রাগ আসক্ত মানুষ দেহে মাদকের কুপ্রভাব বুঝতে পেরেও তা ছাড়াতে পারে না। চিকিৎসা ব্যবস্থায় মাদকদ্রব্যে আসক্তি কমানো যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তি যদি সহযোগিতা না করে তাহলে তেমন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। মাদক নিরাময় হাসপাতাল অথবা কেন্দ্রে তাকে ভর্তি করতে হবে এবং খুব সহানুভূতির সাথে ড্রাগে আসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করতে হবে।

প্রথমে আসক্ত ব্যক্তিকে তার ড্রাগ নেওয়া বন্ধুদের থেকে আলাদা করতে হয়। লক্ষ রাখতে হবে, কোনোক্রমে যেন তার কাছে মাদকদ্রব্য পৌঁছাতে না পারে। এরপর তার মানসিক চিকিৎসা করা প্রয়োজন হয় যাতে সে ড্রাগের কথা মনে না আনতে পারে, তার জন্য তাকে বিশেষ কোনো কাজে যুক্ত করতে হয়। সে যে মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়, সেটি একবারে বন্ধ না করে মাত্রা কমিয়ে কমিয়ে কিছুদিন তাকে মাদকদ্রব্যটি দিয়ে শেষে একেবারে বন্ধ করতে হয়। এতে হঠাৎ করে ড্রাগ বন্ধ করার খারাপ প্রভাবটা কমে যায়। ঘুম ঠিকমতো না হলে বা বেশি অস্থিরতা বা বিদ্রোহীভাব দেখা দিলে স্নায়ু শিথিলকারক ঔষধ ও ঘুমের ঔষধ দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মাদক সেবন যে শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সমস্যা তা নয়, মাদক সেবন যেকোনো পরিবারের বড় রকমের সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে। এই সমস্যা সমাজ ও দেশের উন্নতির পরিপন্থী। মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে সমাজের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ধনী হয়, কিন্তু অন্যদিকে কিছু মানুষের এবং সমাজের জীবনে কালো ছায়া নেমে আসে। সম্ভাবনাময় ছাত্র–ছাত্রীদের

পড়ালেখা নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে অকালমৃত্যু ও সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি পায়। এ জন্য মাদকদ্রব্য সেবন ও এর ব্যবসা–বাণিজ্য কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। এর জন্য ব্যক্তিগত এবং সমাজসেবামূলক সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টা যাই থাকুক না কেন, দেশের আইনশৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা তথা সরকারি প্রচেষ্টা মাদক নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে ফলপ্রসু হতে পারে।

সামাজিক প্রচেষ্টা

১. মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
২. মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া।
৩. পুনর্বাসন করে সমাজের স্বাভাবিক স্রোতে এনে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।

সরকারি প্রচেষ্টা

১. মাদক সেবন, বিক্রয় নিষিদ্ধ করা। এ ব্যাপারে কড়া আইন প্রণয়ন করে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।
২. মাদক সেবনের কুপ্রভাবগুলো সরকারি ও বেসরকারি প্রচারমাধ্যম দ্বারা মানুষকে অবহিত করা।
৩. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আমাদের দেশে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ আছে। আইনগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ হলে মাদকের বিষাক্ত ছোবল থেকে মানুষ ও দেশকে অনেকটা বাঁচান যাবে।

এইডস (AIDS)

সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী রোগ হলো 'এইডস'। এটি সংক্রামক রোগ। AIDS ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম আমেরিকায় চিহ্নিত হয় এবং তখন থেকে সারা বিশ্বে AIDS মরণব্যাধি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের দেহে রোগজীবাণু আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে। একে বলে ইমিউনিটি। আমাদের রক্তের মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা আছে, যার সাহায্যে আমরা প্রাকৃতিকভাবে সবরকম জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারি। এ ক্ষেত্রে রক্তের লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি প্রস্তুতের মাধ্যমে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। AIDS এ আক্রান্ত ব্যক্তির নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে। এ জন্য রোগটির নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যাকুয়ার্ড ইম্যুন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম' যা সংক্ষেপে AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)। বর্তমানে জানা গেছে এটি এক ধরনের ভাইরাস দ্বারা হয়, যার নাম Human Immuno deficiency Virus, যাকে সংক্ষেপে HIV বলা হয়। HIV দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। দেহের রক্তস্রোতে প্রবেশ করার পর HIV রক্তের শ্বেত কণিকার T- লিম্ফোসাইটকে আক্রমণ করে। এতে এগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে শরীরে নানা রকমের বিরল রোগের সংক্রমণ ঘটে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– শ্বাসতন্ত্রের রোগ, মস্তিষ্কের রোগ, পরিপাকতন্ত্রের রোগ এবং টিউমার। দেখা গেছে HIV সংক্রমণের পর ৫ বছর পর্যন্ত মানুষের দেহে কোনো রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এসব মানুষ বাহক হিসাবে কাজ করে এবং এরা অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে।

এ রোগে কারা বেশি আক্রান্ত হতে পারে সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক তথ্যই জানা গেছে। প্রধানত যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমেই আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে HIV সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়। সমকামী এবং নারী–পুরুষের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত যৌন সংযোগের মাধ্যমে এই ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। গর্ভবতী মহিলা এ রোগে আক্রান্ত হলে তার সন্তানদের মধ্যে এ রোগ দেখা দিতে পারে। স্তন দুধের মাধ্যমে আক্রান্ত মহিলার দেহ থেকে সদ্যোজাত শিশুর দেহে HIV সঞ্চারিত হতে পারে। এছাড়া রক্ত সঞ্চালনের সময় HIV আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের মাধ্যমে, ড্রাগ ব্যবহারকারীদের

সিরিঞ্জের মাধ্যমে HIV সঞ্চারিত হয়ে থাকে। কোকেন, এলএসডি প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহারেও ঘটতে পারে এ রোগ। খাদ্য, পানি, কীটপতঙ্গ অথবা এইডস রোগীর সাধারণ স্পর্শের দ্বারা এ রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। তবে এই রোগ রক্ত, বীর্য, লালা এবং অশ্রুর মাধ্যমে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বেশি।

AIDS প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, HIV সংক্রমণ কীভাবে ঘটে সে সম্বন্ধে সবাইকে শিক্ষা দেওয়া। অন্যকে সংক্রমিত না করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং নিজেকে HIV সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা। রক্তদান বা গ্রহণ, অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক এবং ড্রাগ ব্যবহারকারীদের সিরিঞ্জের মাধ্যমে HIV সংক্রমণের ঝুঁকি সম্বন্ধে অবহিত করে AIDS রোগের বিস্তার কমানো যায়। সরকার এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলো মরণব্যাধি AIDS-এর সংক্রমণ কীভাবে ঘটে সে সম্বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে এ রোগ থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য রক্ষায় শরীরচর্চা ও বিশ্রাম

শরীরই মানুষের প্রথম পরিচয়। তাই শরীরকে মানুষের জীবনসংগ্রামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলা যেতে পারে। এই হাতিয়ারকে ঠিক রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। শরীরকে ঠিক রাখার জন্য চাই নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়াম। এর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে মানুষের শারীরিক দৃঢ়তা।

মানুষের জীবনে ঘুম, খাওয়া ও বিশ্রাম নেওয়া আবশ্যক। কারণ এগুলোই মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশকে সঠিকভাবে কাজকর্ম করতে সাহায্য করে। তবে মনে রাখতে হবে, এগুলো কোনোমতেই শরীরের সুপ্ত সম্পদগুলোর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে না। এই বিকাশ একমাত্র নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের মধ্য দিয়েই সম্ভব হতে পারে। গাছের সবকিছু নির্ভর করে তার শিকড়ের ওপর, ঠিক তেমনি মানুষের চলাফেরা, ভাবনা-চিন্তা ইত্যাদি সবকিছুই নির্ভর করে তার স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতার ওপর। সুস্থ স্নায়ুতন্ত্র গড়তে হলে প্রয়োজন আছে নিয়মিত অঙ্গ চালনার সাহায্যে উপযুক্ত ও পরিমিত শরীরচর্চা।

আমরা সকলেই জানি, স্নায়ুতন্ত্র শরীরের মাংসপেশি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই যদি নিয়মিত মাংসপেশির ব্যায়াম করি, তাহলে সহজেই স্নায়ুতন্ত্রকে সতেজ ও সক্রিয় করে তোলা যাবে। ফলে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে। শুধু তাই নয়, নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে যদি শরীরের বিভিন্ন দেহতন্ত্র বা জৈব তন্ত্রগুলোকে সক্রিয় করে তোলা যায়, তাহলে তারও পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটবে। ফলে আমাদের দৈনিক কাজকর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা অনেকাংশে বেড়ে যাবে। দৈনিক নিয়মিত কয়েক মিনিট শরীরচর্চার মধ্য দিয়েই শরীরের পরিপাক করার ক্ষমতা বাড়াতে পারব, রক্ত চলাচলের ক্ষমতা ভালো করতে পারব, পাচন ক্ষমতা ভালো হবে, শ্বাস-প্রশ্বাস ভালো হবে, শরীরে তাপ নিয়ন্ত্রণ আরও সুষ্ঠু হবে। মোটকথা, একটা সুস্থ শরীরের অধিকারী হতে পারা যাবে। মনে রাখতে হবে, মাংসপেশির সক্রিয়তা এসব ব্যাপারে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই নিয়মিত এমন কিছু শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চর্চা করতে হবে, যাতে দেহের প্রধান মাংসপেশিগুলো সক্রিয় ও উত্তেজিত হওয়ার সুযোগ পায়।

বয়স, দৈহিক গঠন, সাধারণ স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক বিবেচনা করে ব্যায়ামের অভ্যাস করা উচিত। ছেলেদের যে ধরনের ব্যায়ামের প্রয়োজন হয়, মেয়েদের তা হয় না। আবার এমন কতকগুলো ব্যায়াম আছে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই করতে পারে। যেমন–দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার কাটা, হাঁটা, লাফ দেওয়া, দড়ি খেলা, কাবাডি, বিভিন্ন প্রকার আসন ইত্যাদি। ছেলেরা সাধারণত কুস্তি, ডাম্বেল, বারবেল, ফুটবল, টেনিস, হকি, গোল্লাছুট, খালি হাতে ব্যায়াম ইত্যাদি বেশি করে থাকে, যদিও আজকাল মেয়েরাও এ ধরনের ব্যায়ামে আগ্রহী হচ্ছে।

নারীদেহের বিশেষ গঠনের জন্যই নারীর পক্ষে কখনো কঠিন শ্রমযুক্ত ব্যায়াম করা উচিত নয়। মেয়েদের ব্যায়াম করতে হলে দড়ি লাফানো (Skipping), দৌড়ানো, দ্রুতবেগে হাঁটা প্রভৃতি অভ্যাস করে দেহে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে দেহের অতিরিক্ত মেদ কমানো ও দেহকে যথেষ্ট হালকা করতে পারে। এছাড়া নানা প্রকার যোগ আসন, খালি হাতে ব্যায়াম, ব্রতচারী ও বিভিন্ন প্রকার নাচের মাধ্যমেও অঙ্গ চালনা করা যায়। পরিমিত ব্যায়াম যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, তেমনি প্রয়োজনের কম বা অতিরিক্ত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং শরীরের পেশিগুলো অবশ হয়ে আসে, তখন সারা শরীরকে কিছুক্ষণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রেখে আরাম গ্রহণ করাকে আমরা বিশ্রাম বলি। ঘুমই শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম। দেহ-মনকে সুস্থ ও সতেজ করার জন্য প্রত্যেক মানুষের কমপক্ষে দৈনিক ৬ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। বালক-বালিকাদের ৮/৯ ও শিশুদের ১০/১২ ঘণ্টা করে ঘুমের প্রয়োজন। যারা রাতে কাজ করে, তাদের অবশ্যই দিনের বেলায় বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

মনের বিশ্রাম : কেবল শরীরেরই নয়, মনেরও বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। শরীর ও মন থেকে সমস্ত রকম উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অশান্তি একেবারে দূর করে দিয়ে দেহ-মনকে একান্তভাবে নিদ্রার কোলে সঁপে দিতে পারলে তবেই দেহ-মনের পক্ষে প্রকৃত বিশ্রাম হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, এক কাজ থেকে অন্য কাজে মনোনিবেশ করেও শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেওয়া যায়। একে কর্মান্তরের মাধ্যমে বিশ্রাম বলা যায়। কঠিন কায়িক শ্রমের পর চিত্তবিনোদন বিশ্রামের নামান্তর। আবার কঠিন মানসিক পরিশ্রমের পর কর্মান্তর গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্রাম খোঁজার একটা উপায়।

বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে অনেককে দেখা যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাউনটেন পেন পরিষ্কার করে যাচ্ছেন। এতে তিনি কিন্তু তাঁর কাজের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। অনেকে আবার বাগান পরিচর্যা, পশুপাখি পালন, শৌখিন সবজিবাগান, চিত্তবিনোদন ইত্যাদির মাধ্যমেও বিশ্রাম গ্রহণ করে। এ সমস্ত কাজকেই বলে কর্মান্তরের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গাজরে প্রধানত কোনটি পাওয়া যায়?

ক. গ্লুকোজ খ. ফ্রুকটোজ

গ. সুক্রোজ ঘ. বিটা ক্যারোটিন

২. স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো-

i. A, D, E

ii. A, B, C

iii. A, D, K

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রহিমার ওজন ৫০ কেজি ও উচ্চতা ১.৫ মিটার। গতকাল সকাল থেকে তার বমি ও পাতলা পায়খানা হওয়ায়

দেহে পানির অভাবসহ ওজন হ্রাস পেয়ে ৪৭ কেজি হয়ে গেছে।

৩. **রহিমার দেহে প্রয়োজনীয় উপাদানটির অভাবে-**

i. রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটে

ii. পেশি নাজুক হয়ে পড়ে

iii. লবণের ভারসাম্য বজায় থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. **অসুস্থ হওয়ার পর রহিমার ভরসূচি (BMI) কত হয়েছে?**

ক. ২২.৩ (প্রায়)　　খ. ২০.৯ (প্রায়)

গ. ৪৯.২৫ (প্রায়)　　ঘ. ৪৪.৭৫ (প্রায়)

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ১৪ বছরের তনুর ওজন ৩৫ কেজি এবং উচ্চতা ১.৫ মিটার। ইদানীং তার ত্বকে লালচে দাগ পড়ছে, খাওয়ায় তেমন রুচি নেই। কিন্তু দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক আছে।

ক. ভরসূচি কী?

খ. জেরপথ্যালমিয়া রোগ বলতে কী বুঝায়?

গ. তনুর দুই দিনের মৌল বিপাকে কত শক্তি ব্যয় হবে?

ঘ. তনুর সমস্যাগুলোর সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



ক. রাফেজ কী?

খ. খাদ্যপ্রাণ বলতে কী বুঝায়?

গ. খাদ্য পিরামিডের খাদ্যগুলোর বিকল্প খাদ্য ব্যবহার করে এক দিনের দুপুরের সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি কর।

ঘ. D চিহ্নিত খাদ্য উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনের জন্য পানি

পানির অপর নাম জীবন। নানা উৎস থেকে আমরা পানি পাই। নানা কারণে আমাদের অতি প্রয়োজনীয় এই পানির উৎস হুমকির মুখে পড়ছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- পানির ধর্ম বর্ণনা করতে পারব।
- পানির গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানির বিভিন্ন উৎস বর্ণনা করতে পারব।
- জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীর জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা এবং পানির মানদণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণে পানির পুনঃআবর্তন ধাপসমূহে পানির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- মানসম্মত পানির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশে পানির উৎসে দূষণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানিদূষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বাংলাদেশের মিঠা পানিতে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পানিদূষণ প্রতিরোধের কৌশল ও নাগরিকের দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- উন্নয়ন কার্যক্রমে পানির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বাংলাদেশে পানির উৎসে হুমকির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পানির উৎস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- 'পানি প্রাপ্তি সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার'-ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানিপ্রবাহের সর্বজনীনতা এবং আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি বর্ণনা করতে পারব।
- বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার এবং সুস্থ জীবনযাপনে এর প্রভাব বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ পরিচালনা করতে পারব।
- পানির সংকটের (গৃহস্থালি/কৃষি/শিল্পে ব্যবহার) কারণ অনুসন্ধান করতে পারব।
- পানি ব্যবহার ও পানির সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অংকন করতে পারব।
- পানির উৎসে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ, দূষণ রোধ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করব।
- "পানি নাগরিকের মৌলিক মানবিক অধিকার"– বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করব।
- পানির অপচয়রোধ এবং কার্যকর ব্যবহারে সচেতন হব।

পানির ধর্ম

পৃথিবীতে যত প্রকার তরল পদার্থ পাওয়া যায়, পানি তার মধ্যে সবচেয়ে সহজলভ্য। মানবদেহের শতকরা ৬৫-৭৫ ভাগ পানি। মাছ, মাংস, শাক-সবজি প্রভৃতিতে শতকরা ৬০-৯০ ভাগ পানি থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা ৭৫ ভাগই পানি দ্বারা গঠিত। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য। তাই পানির অপর নাম জীবন। তাহলে পানির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

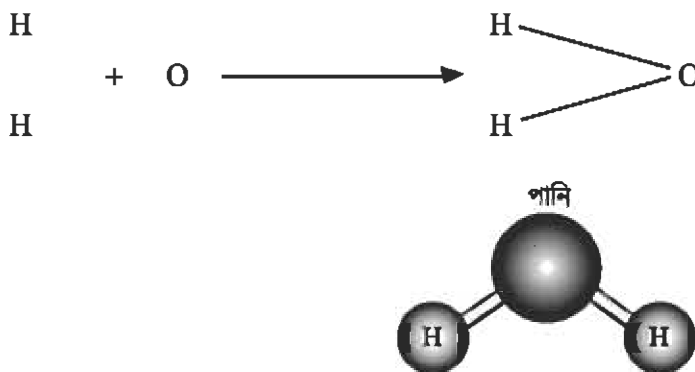
গলনাংক ও স্ফুটনাংক: তোমাদের কি মনে আছে, পানির গলনাংক ও স্ফুটনাংক কত? পানি যখন কঠিন অবস্থায় থাকে সেটিকে আমরা বরফ বলি। যে তাপমাত্রায় বরফ গলে যায়, সেটিই হলো গলনাংক। বরফের গলনাংক ০° সেলসিয়াস। অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো তরল পদার্থ যে তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়, তাকে স্ফুটনাংক বলে। পানির স্ফুটনাংক ৯৯.৯৮° সেলসিয়াস যা ১০০° সেলসিয়াসের খুবই কাছাকাছি। তাই সাধারণভাবে আমরা পানির স্ফুটনাংক ১০০° সেলসিয়াস বলে থাকি।

বিশুদ্ধ পানি স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন হয়। তোমরা কি জান পানির ঘনত্ব কত? পানির ঘনত্ব তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সর্বোচ্চ আর তা হলো ১ গ্রাম/সি.সি বা ১০০০ কেজি/মিটার৩ অর্থাৎ ১ সি.সি পানির ভর হলো ১ গ্রাম বা ১ কিউবিক মিটার পানির ভর হলো ১০০০ কেজি।

তড়িৎ পরিবাহিতা : বিশুদ্ধ পানি তড়িৎ পরিবহন করে না, তবে এতে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ (যেমন- লবণ, এসিড) দ্রবীভূত থাকলে তড়িৎ পরিবহন করে। পানির একটি বিশেষ ধর্ম হলো এটি বেশির ভাগ অজৈব যৌগ ও অনেক জৈব যৌগকে দ্রবীভূত করতে পারে। এজন্য একে সর্বজনীন দ্রাবকও বলা হয়। পানি একটি উভধর্মী পদার্থ হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ কখনো এসিড, কখনো ক্ষার হিসেবে কাজ করে। সাধারণত এসিডের উপস্থিতিতে পানি ক্ষার হিসেবে আর ক্ষারের উপস্থিতিতে এসিড হিসেবে কাজ করে। তবে বিশুদ্ধ পানি পুরোপুরি নিরপেক্ষ অর্থাৎ এর pH হলো ৭।

পানির গঠন

তোমাদের মনে কি প্রশ্ন জাগছে যে আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য এই পানি কি দিয়ে গঠিত? পানি দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত। তাই আমরা রসায়ন পড়ার সময় পানিকে লিখি H_2O অর্থাৎ এটিই হলো পানির সংকেত।



চিত্র : ২.১ পানির গঠন

আমরা যে পানি দেখি, (আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জানা গেছে) সেখানে অনেক পানির অণু ক্লাস্টার (Cluster) আকারে থাকে।

পানির উৎস

তোমরা বলতো আমাদের অতি দরকারি পানি আমরা কোন কোন উৎস থেকে পাই? পানির সবচেয়ে বড় উৎস হলো সাগর, মহাসাগর বা সমুদ্র। পৃথিবীতে যত পানি আছে তার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগেরই উৎস সমুদ্র। আর সমুদ্রের পানিতে প্রচুর লবণ থাকায় তা পানের অযোগ্য। এমনকি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্য কাজেও ব্যবহারের উপযোগী নয়। সমুদ্রের পানিকে লোনা পানি (Marine Water)ও বলে ।

পানির আরেকটি অন্যতম উৎস হলো হিমবাহ ও তুষার স্রোত, যেখানে পানি মূলত বরফ আকারে থাকে। এই উৎসে প্রায় শতকরা ২ ভাগের মতো পানি আছে। উল্লেখ্য যে বরফ আকারে থাকায় এই পানিও কিন্তু অন্য কাজে ব্যবহার উপযোগী নয়। ব্যবহার উপযোগী পানির উৎস হলো নদ-নদী, খাল-বিল,হ্রদ, পুকুর ও ভূগর্ভস্থ পানি। ভূগর্ভস্থ পানি নলকূপের সাহায্যে পাই। অবশ্য পাহাড়ের উপর জমে থাকা বরফ বা তুষার গলেও ঝর্ণা সৃষ্টি করতে পারে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ব্যবহারের উপযোগী পানি মাত্র শতকরা ১ ভাগ।

বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস : আমরা বাসা-বাড়িতে রান্না থেকে শুরু করে কাপড় ধোয়া ও খাওয়ার পানি কোথা থেকে পাই? মাঠে ফসল ফলাতে কখনো কখনো (যেমন- ইরি ধানের জন্য) প্রচুর পরিমাণে পানি লাগে। এ পানি আমরা কোথা থেকে পাই? আমাদের দেশে ঝর্ণা তেমন একটা না থাকায় মিঠা পানির মূল উৎস নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর,হ্রদ ও ভূগর্ভ। তবে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকায় (বিশেষ করে আর্সেনিক) বাংলাদেশের বিস্তৃত এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি পানের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এবং ঐ সকল এলাকার মানুষ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে পরিশোধন করে তা পান করছে।

জলজ উদ্ভিদের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা

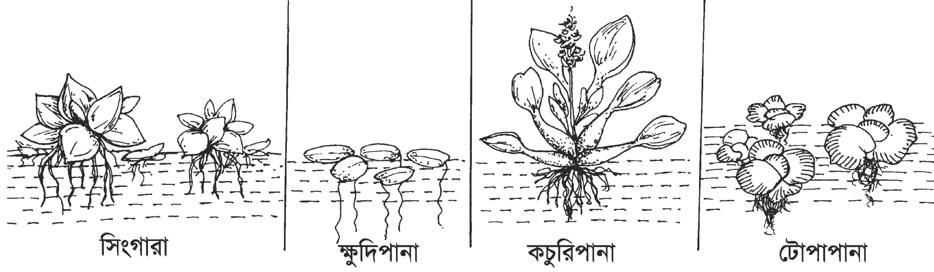
তোমরা কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা, ওড়িপানা, সিংগারা, টোপাপানা, শাপলা, পদ্ম, শ্যাওলা, হাইড্রিলা, কলমি, হেলেঞ্চা, কেশরদাম ইত্যাদি নানা রকম জলজ উদ্ভিদের নাম শুনেছ এবং এদেরকে চোখেও দেখেছ। এরা কোথায় জন্মে? এদের বেশির ভাগই পানিতে জন্মে এবং কিছু কিছু আছে (যেমন- কলমি, হেলেঞ্চা, কেশরদাম) যারা পানিতে ও মাটিতে দুজায়গাতেই জন্মে। অর্থাৎ পানি না থাকলে বেশির ভাগ জলজ উদ্ভিদ জন্মাতই না, অথবা কিছু কিছু জন্মালেও বাঁচতে পারত না ও বেড়ে উঠতে পারত না। সেক্ষেত্রে কী ঘটত?

সেক্ষেত্রে পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটত। কারণ, এই জলজ উদ্ভিদগুলো একদিকে যেমন সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক রাখে, অন্যদিকে এদের অনেকগুলো বিশেষ করে শ্যাওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদগুলো জলজ প্রাণীদের খাদ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করে। এসব জলজ উদ্ভিদ না থাকলে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী বাঁচতে পারত না, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হতো।

তোমরা জান যে উদ্ভিদসমূহ মূলত মূলের মাধ্যমে পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে। কিন্তু জলজ উদ্ভিদসমূহ সারা দেহের মাধ্যমে পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান বিশেষ করে খনিজ লবণ সংগ্রহ করে থাকে। তাই এদের সমগ্র দেহ পানির সংস্পর্শে না এলে এদের বেড়ে ওঠায় ব্যাঘাত ঘটত।

আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব নরম হয় যা পানির স্রোত ও জলজ

প্রাণীর চলাচলের সঙ্গে মানানসই। পানি ছাড়া স্থলভাগে এদের জন্ম হলে, এরা ভেঙ্গে পড়ত এবং বেড়ে উঠতে পারত না- এমনকি বাঁচতেও পারত না।



চিত্র : ২.২ জলজ উদ্ভিদ

তোমরা কি জান জলজ উদ্ভিদ কীভাবে বংশবিস্তার করে থাকে? জলজ উদ্ভিদসমূহ সাধারণত অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করে থাকে। পানি না থাকলে এটি বাধাগ্রস্ত হতো। অতএব আমরা বলতে পারি, আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অতি জরুরি জলজ উদ্ভিদসমূহের জন্ম ও বেড়ে উঠার জন্য পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি না থাকলে জলজ উদ্ভিদসমূহ জন্মাতে পারত না, জন্মালেও বাঁচতে পারত না, ফলে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটত।

জলজ প্রাণীর জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা

হাজারো জলজ প্রাণীর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে পরিচিত জলজ প্রাণী হলো মাছ। মাছ ধরে পানির বাইরে রেখে দিলে কী হয়? মাছ মরে যায়। কেন? কারণ হলো, আমরা যেমন বাতাস বা অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারি না, দম বন্ধ হয়ে মারা যাই, মাছের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। মাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে ফুলকার মাধ্যমে। আর ফুলকা এমনভাবে তৈরি যে এটি শুধু পানি থেকেই অক্সিজেন নিতে পারে, বাতাস থেকে নয়। যদি পানি না থাকত, কোনো মাছ বাঁচতে পারত না। শুধু মাছ নয়, যেসব প্রাণী ফুলকার মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায়, সেগুলো বাঁচতে পারত না। ফলে পরিবেশ হুমকির মধ্যে পড়ত এবং আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ত। তোমরা জান যে প্রোটিন আমাদের বেড়ে ওঠার জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই আসে মাছ থেকে। কাজেই পানি না থাকলে আমরা প্রয়োজনীয় প্রোটিন পেতাম না। ফলে আমাদের দৈহিক বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রায় সকল জৈবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হতো।

পানির মানদণ্ড

পানি অত্যন্ত মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে নদ-নদীর পানি আমাদের পরিবেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল (Habitat)। শুধু তাই নয়, এই পানি কৃষিকাজে সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়। একইভাবে জাহাজের নাবিকেরা, ট্রলার দিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে, তারা সবাই নদ-নদী বা সমুদ্রের পানিই পান করে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে থাকে। তাই পানির নির্দিষ্ট মান যদি বজায় না থাকে তাহলে এটি জীববৈচিত্র্য বা পরিবেশের জন্যও যেমন ক্ষতিকর হবে, তেমনি অন্যান্য কাজে এর ব্যবহার ব্যাহত হবে। এবার তাহলে পানির মানদণ্ড সম্পর্কে জানা যাক।

পানির মানদণ্ড নির্ভর করে কোন কাজে ব্যবহার করব তার ওপর। প্রথমে নদ-নদী, খাল-বিল, সমুদ্রের পানির মানদণ্ড কেমন হওয়া উচিত তা জেনে নেই।

বর্ণ ও স্বাদ : তোমরা জান যে বিশুদ্ধ পানি বর্ণহীন ও স্বাদহীন হয়। পানিতে বসবাসকারী প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির পানি বর্ণহীন ও স্বাদহীন হওয়াই উত্তম।

ঘোলাটে : পানি ঘোলাটে হলে তা বসবাসকারী প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। কারণ, পানি ঘোলা হলে সূর্যের আলো পানির নিচে থাকা উদ্ভিদ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, ফলে সালোকসংশ্লেষণ বাঁধাগ্রস্ত হয়। এতে একদিকে যেমন পানিতে থাকা উদ্ভিদের খাবার তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটে, যা তাদের বৃদ্ধিকে কমিয়ে দেয়, অন্যদিকে সালোকসংশ্লেষণের ফলে যে অক্সিজেন তৈরি হতো, তাও বন্ধ হয়ে যায়। পানি ঘোলা হলে মাছ বা অন্য প্রাণী ঠিকমতো খাবার সংগ্রহ করতে পারে না। পানি ঘোলা হওয়ার মূল কারণ হলো পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ যেমন- মাটি, বালি, তেল, গ্রিজ ইত্যাদির উপস্থিতি। পানিতে এসব পদার্থ বিশেষ করে মাটি ও বালি বেড়ে গেলে তা একপর্যায়ে নদ-নদীর তলায় জমা পড়ে। ফলে নাব্যতা হ্রাস পায় এবং নৌযান চলাচলে অসুবিধা ঘটে। তোমরা সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে নিশ্চয়ই লঞ্চ, স্টিমার আটকে পড়ার খবর দেখে থাকবে। কেন এগুলো আটকে পড়ে? নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণেই এমন হয়।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি : নদ-নদীর পানিতে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে তা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে ক্যান্সারের মতো রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই নদ-নদীর পানি পুরোপুরি তেজস্ক্রিয়তামুক্ত হতে হবে।

ময়লা-আবর্জনা : নদ-নদীসহ সকল প্রাকৃতিক পানি অবশ্যই ময়লা আবর্জনামুক্ত হতে হবে। কারণ ময়লা-আর্বজনা থেকে জীবন ধ্বংসকারী জীবাণু তৈরি হয়।

দ্রবীভূত অক্সিজেন : আমাদের নিঃশ্বাসের জন্য যে রকম অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, তেমনি পানিতে বসবাসকারী প্রাণীদেরও শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। এই অক্সিজেন তারা কোথা থেকে পায়? তারা এই অক্সিজেন পায় পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা অক্সিজেন থেকে। কোনো কারণে এই অক্সিজেন যদি নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কমে যায়, তাহলে জলজ প্রাণীগুলোর অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং যদি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন না থাকে, তাহলে মাছসহ অন্যান্য প্রাণী বাঁচতে পারে না। জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য ১ লিটার পানিতে ন্যূনতম ৫ মিলিগ্রাম অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন।

তাপমাত্রা : তাপমাত্রা পানির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে, একদিকে যেমন দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়, অন্যদিকে জলজ প্রাণীর প্রজনন থেকে শুরু করে নানা শারীরবৃত্তীয় কাজেও সমস্যা সৃষ্টি হয়।

pH : তোমরা কি জান pH কী ? pH হলো এমন একটি রাশি, যার দ্বারা বোঝা যায় পানি বা জলীয় দ্রবণ এসিডিক, ক্ষারীয় না নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষ হলে pH হয় ৭, এসিডিক হলে ৭-এর কম, আর ক্ষারীয় হলে ৭-এর বেশি। এসিডের পরিমাণ যত বাড়ে pH-এর মান তত কমে, অন্যদিকে ক্ষারের পরিমাণ যত বাড়ে, pH-এর মানও তত বাড়ে। নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির জন্য pH এর মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত নদ-নদীর পানি ক্ষারীয় হয়। গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে নদ-নদীর পানির pH যদি ৬-৮ এর মধ্যে থাকে, তবে তা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে না। তবে pH-এর মান যদি খুব কমে যায় বা বেড়ে যায়, তাহলে ঐ পানিতে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি হয়। মাছের ডিম, পোনা মাছ এরা খুব কম বা বেশি pH হলে বাঁচতে পারে না। পানিতে এসিডের পরিমাণ খুব বেড়ে গেলে অর্থাৎ pH-এর মান খুব কমে গেলে জলজ প্রাণীদের দেহ থেকে ক্যালসিয়ামসহ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ বাইরে চলে আসে, ফলে মাছ রোগাক্রান্ত হয়।

লবণাক্ততা : তোমরা কি জান আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ ডিম ছাড়ার সময় মিঠা পানিতে আসে কেন? ইলিশ সামুদ্রিক মাছ অর্থাৎ লবণাক্ত পানির মাছ হলেও ডিম ছাড়ার সময় অর্থাৎ প্রজননের সময় মিঠা পানিতে আসে। কারণ হলো, সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে, যা ডিম নষ্ট করে ফেলে। ফলে ঐ ডিম থেকে আর পোনা মাছ তৈরি হতে পারে না। তাই প্রকৃতির নিয়মেই ইলিশ মাছ ডিম ছাড়ার সময় হলে মিঠা পানিতে আসে। তবে সব মাছের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। কিছু মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী লবণাক্ত পানিতেই প্রজনন করতে পারে।

পানির পুনঃআবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা : এর আগে তোমরা দেখেছ যে ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭৫ ভাগই পানি দ্বারা আবৃত; কিন্তু বেশির ভাগ পানিই (শতকরা ৯৭ ভাগ) লবণাক্ত হওয়ায় তা সরাসরি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায় না। আমাদের মোট যে পরিমাণ পানি সঞ্চিত আছে, তার মাত্র শতকরা ১ ভাগ হলো মিঠা পানি (Fresh water)। এই মিঠা পানির বড় একটি অংশ বিশেষ করে নদ–নদী, খাল–বিল ও হ্রদের পানি নানাভাবে প্রতিনিয়ত দূষিত হয়ে চলেছে (পানির দূষণ সম্পর্কে তোমরা এই অধ্যায়ে পরে বিস্তারিত জানবে)। এমনকি ভূগর্ভস্থ পানি যা আমরা কূপ বা নলকূপ থেকে পাই এবং খাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি, সেটিও নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ (যেমন–আর্সেনিক) দ্বারা দূষিত হয়ে খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। তাহলে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী পানির পরিমাণ কি খুবই সীমিত নয়? হ্যা, যদিও আমাদের প্রচুর পানিসম্পদ রয়েছে, কিন্তু ব্যবহার উপযোগী পানির পরিমাণ খুবই অল্প ও সীমিত। তাই পানি ব্যবহারে আমাদের অত্যন্ত সাশ্রয়ী হতে হবে এবং একই পানি কীভাবে বার বার ব্যবহার করা যায় সেটিও চিন্তা করতে হবে।

প্রকৃতিতে পানির কি পুনঃআবর্তন ঘটছে? হ্যাঁ, ঘটছে। সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা পানিচক্রে দেখেছ যে দিনের বেলা সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠের পানি (সমুদ্র, নদ–নদী, খাল–বিলের পানি) বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। একপর্যায়ে বাষ্প ঘনীভূত হয়ে প্রথমে মেঘ ও পরে তা বৃষ্টির আকারে ফিরে আসে। এই বৃষ্টির পানির বড় একটি অংশ নদ–নদী, খাল–বিল ও সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং আবার বাষ্পীভূত হয় ও বৃষ্টির আকারে ফিরে আসে। পানির এই পুনঃআবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পুনঃআবর্তন না হলে কী ধরনের সমস্যা হতো বলতো? এই পুনঃআবর্তন না হলে বৃষ্টিই হতো না, ফলে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যেত পুরো পৃথিবী। প্রচণ্ড খরা হতো, ফসল উৎপাদন কমে যেত। বৃষ্টি হলো প্রাকৃতিকভাবে পানির পুনঃআবর্তন। আমরা যদি ব্যবহারের পর বর্জ্য পানি সংগ্রহ করে তা পরিশোধন করে আবার ব্যবহার করি তাহলে সেটিও কিন্তু এক ধরনের পুনঃআবর্তনই হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা : যেহেতু পরিবেশের প্রায় প্রতিটি উপাদান ও প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পানির উপর নির্ভরশীল, তাই পরিবেশকে টিকিয়ে রাখতে হলে পানি অপরিহার্য। পানি না থাকলে গাছপালা জন্মাবে না, ফসল উৎপাদন হবে না এবং আমাদের অস্তিত্ব তথা পুরো পরিবেশই ধ্বংস হয়ে যাবে।

মানসম্মত পানির প্রয়োজনীয়তা : সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই আমরা কী করি? হাত–মুখ ধুই। এ কাজ পানি ছাড়া কি সম্ভব? না, সম্ভব নয়। হাত–মুখ ধোয়া থেকে শুরু করে গোসল, রান্না–বান্না, কাপড় পরিষ্কার করা এবং সর্বোপরি খাওয়ার জন্য পানি অপরিহার্য। এই পানি যদি মানসম্মত না হয় তাহলে প্রতিটি কাজেই বিঘ্ন ঘটবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– খাওয়ার পানি যদি গন্ধযুক্ত বা লবণাক্ত হয়, তবে কি তা খাওয়ার উপযোগী হবে? না, হবে না। এর বাস্তব প্রমাণ হলো আমাদের দেশের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় নদী ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হওয়ায় তারা ঐ পানি খেতে তো পারছেই না, এমনকি প্রাত্যহিক জীবনের বেশির ভাগ কাজেই ব্যবহার করতে পারছে না। তারা বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে পরিশোধন করে তারপর পান করছে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছে। আবার

খাওয়ার পানি যদি মানসম্মত না হয়, বিশেষ করে এতে যদি রোগজীবাণু থাকে, তাহলে তা মারাত্মক স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটাতে পারে। সমুদ্রের পানি কি কৃষিকাজে বা শিল্প–কারখানায় ব্যবহার করা যায়? না, যায় না। কারণ সমুদ্রের পানিতে প্রচুর লবণ থাকে, যা শিল্প–কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির (যেমন–বয়লার) ক্ষয়সাধন করে ও নষ্ট করে ফেলে। একইভাবে আমাদের বেশিরভাগ ফসলাদিই লবণ পানিতে জন্মাতে পারে না। অর্থাৎ লবণাক্ত পানি কৃষিকাজের জন্য উপযোগী নয়।

মোটকথা, শিল্পকারখানা থেকে শুরু করে কৃষিকাজ ও দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজেই মানসম্মত পানি অত্যাবশ্যক। তা না হলে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবেও মারাত্মক ক্ষতিসাধন হতে পারে।

পানি বিশুদ্ধকরণ

ভূপৃষ্ঠে যে পানি পাওয়া যায় তাতে নানারকম ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ এমনকি রোগ সৃষ্টি করে এরূপ জীবন ধ্বংসকারী জীবাণুও থাকে। তাই ব্যবহারের পূর্বে পানি বিশুদ্ধকরণের প্রয়োজন হয়। ভূগর্ভস্থ পানি সাধারণত রোগজীবাণু মুক্ত হলেও এ পানিতে নানা রকম ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের (যেমন– আর্সেনিক) উপস্থিতি এখন সর্বজনবিদিত।

পানি বিশুদ্ধকরণ কীভাবে করা হবে তা নির্ভর করে মূলত এটি কোন কাজে ব্যবহৃত হবে, তার ওপর। স্বাভাবিকভাবেই খাওয়ার জন্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ পানি লাগলেও জমিতে সেচকাজের জন্য তত বিশুদ্ধ পানির দরকার হয় না। তবে যেসব প্রক্রিয়ায় সাধারণত পানি বিশুদ্ধ করা হয় সেগুলো হলো পরিস্রাবণ, ক্লোরিনেশন, স্ফুটন, পাতন ইত্যাদি। নিচে এই প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করা হলো:

পরিস্রাবণ : ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা পরিস্রাবণ সম্পর্কে জেনেছ। তোমাদের কি মনে আছে? পরিস্রাবণ হলো তরল ও কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করার একটি প্রক্রিয়া। পানিতে অদ্রবণীয় ধূলি–বালির কণা থেকে শুরু করে নানারকম ময়লা আবর্জনার কণা থাকে। এদেরকে পরিস্রাবণের মাধ্যমে পানি থেকে দূর করা হয়। এক্ষেত্রে বালির স্তরের মধ্য দিয়ে পানিকে প্রবাহিত করা হয়, এতে করে পানিতে অদ্রবণীয় ময়লার কণাগুলো বালির স্তরে আটকে যায়। বালির স্তর ছাড়াও খুব সূক্ষ্মভাবে তৈরি কাপড় ব্যবহার করে পরিস্রাবণ করা যায়। ইদানীং আমাদের অনেকের বাসা–বাড়িতে আমরা যেসব ফিল্টার ব্যবহার করি, সেখানে আরো উন্নতমানের সামগ্রী দিয়ে পরিস্রাবণ করা হয়।

ক্লোরিনেশন : যদি পানিতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে, তবে তা অবশ্যই দূর করতে হবে এবং তা করা হয় জীবাণুনাশক ব্যবহার করে। নানারকম জীবাণুনাশক পানি বিশুদ্ধকরণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2)। এছাড়া ব্লিচিং পাউডার [$Ca(OCl)Cl$] এবং আরও কিছু পদার্থ যার মধ্যে ক্লোরিন আছে এবং যা জীবাণু ধ্বংস করতে পারে তা ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশে বন্যার সময় পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য যে ট্যাবলেট বা কীট ব্যবহার করা হয় সেটি কী? সেটি হলো মূলত সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড ($NaOCl$)। এতে বিদ্যমান ক্লোরিন পানিতে থাকা রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে। ক্লোরিন ছাড়াও ওজোন (O_3) গ্যাস দিয়ে অথবা অতিবেগুনি রশ্মি দিয়েও পানিতে থাকা রোগজীবাণু ধ্বংস করা যায়। বোতলজাত পানির কারখানায় এ পদ্ধতিতে পানিকে রোগজীবাণুমুক্ত করা হয়।

স্ফুটন : পানির স্ফুটন তোমরা জান। এ প্রক্রিয়ায় কি পানিকে জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব? হ্যা, অবশ্যই সম্ভব। পানিকে খুব ভালোভাবে ফুটালে এতে উপস্থিত জীবাণু মরে যায়। প্রশ্ন হতে পারে কতক্ষণ ফুটালে পানি জীবাণুমুক্ত হয়? স্ফুটন শুরু হওয়ার পর ১৫–২০ মিনিট ধরে স্ফুটন করলে পানি জীবণুমুক্ত হয়। বাসা–বাড়িতে খাওয়ার পানির জন্য এটি একটি সহজ ও সাশ্রয়ী প্রক্রিয়া।

পাতন : পাতন প্রক্রিয়া তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছ। যখন খুব বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন হয়, তখন পাতন প্রক্রিয়ায় পানি বিশুদ্ধ করা হয়। যেমন ধর– ঔষধ তৈরির জন্য, পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পরীক্ষা–নিরীক্ষা ইত্যাদি কাজে পুরোপুরি বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়ায় একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করা হয়। পরে ঐ বাষ্পকে আবার ঘনীভূত করে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধকৃত পানিতে অন্য পদার্থ থাকার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

বাংলাদেশের পানির উৎস দূষণের কারণ

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব দেশেই পানির প্রায় সব উৎসেই বিশেষ করে ভূপৃষ্ঠের পানি প্রতিনিয়ত নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। এবার আমরা সেই দূষণের কারণ জানব।

গোসলের পানি, পায়খানার বর্জ্যপানিসহ অন্যান্য কাজের পর বর্জ্যপানি কোথায় যায় তা কি তোমরা জান? বর্জ্যপানির বড় একটি অংশ নর্দমার নলের মাধ্যমে নদ–নদীতে নিয়ে ফেলা হয় এবং তা পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। এই বর্জ্যপানিতে রোগজীবাণু থেকে শুরু করে নানারকম রাসায়নিক বস্তু থাকে। ফলে পানি দূষিত হয়।

আমাদের বাসা–বাড়িতে যেসব কঠিন বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেগুলো আমরা কী করি? সাধারণত বাড়ির পাশে রাখা ডাস্টবিন বা খোলা জায়গায় ফেলে দেই। এসব বর্জ্যপদার্থ ১–২ দিনের মধ্যে পচতে শুরু করে। বৃষ্টি হলে পচা বর্জ্য যেখানে রোগজীবাণুসহ নানারকম রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তা বৃষ্টির পানির সাথে মিশে নদ–নদী, খাল–বিল বা লেকের পানিকে দূষিত করে।

তোমরা জান যে, কৃষিকাজে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার, জৈব সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এখান থেকে কি পানি দূষিত হতে পারে? হ্যা, অবশ্যই পারে। বৃষ্টি হলে অথবা বন্যার সময় কৃষিজমি প্লাবিত হলে কৃষিজমিতে রাসায়নিক ও জৈব সার এবং কীটনাশক বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে।

শিল্প–কারখানা থেকে কি পানি দূষিত হতে পারে? হ্যাঁ, নদ–নদীর পানিদূষণের একটি অন্যতম কারণ হলো শিল্প–কারখানায় সৃষ্ট বর্জ্য। তোমরা কি কেউ বুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়েছ? গেলে দেখবে এর পানি কালো এবং বাজে গন্ধযুক্ত। এর কারণ হলো, বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি দ্রব্য–চামড়া তৈরির কারখানা। এই চামড়ার কারখানা থেকে প্রচুর বর্জ্য বুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়ে পড়ার ফলে এর পানি দূষিত হচ্ছে।

সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণ নিয়ে প্রায়শই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বুড়িগঙ্গার মতো বাংলাদেশের বেশির ভাগ নদীর পানি টেক্সটাইল মিল, ডাইং, রং তৈরির কারখানা, সার কারখানা, কাগজ তৈরির কারখানা ইত্যাদি নানারকম শিল্প কারখানার বর্জ্যপদার্থের দ্বারা দূষিত হচ্ছে। নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার বা জাহাজ থেকে ফেলা মলমূত্র ও তেল জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে নদ–নদী ও সমুদ্রের পানি দূষিত হয়। নদীর ভাঙ্গন, ঝড় ইত্যাদির দ্বারা মাটি, ধূলিকণা বা অন্যান্য পদার্থ পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে। পরীক্ষাগার থেকে সৃষ্ট বর্জ্য পানি যেখানে এসিড, ক্ষারসহ নানারকম রাসায়নিক পদার্থ থাকে, তাও পানিকে দূষিত করে। রাসায়নিক পদার্থ যেমন, আর্সেনিক দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানিদূষণ এখন আমাদের সবারই জানা।

উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের উপর পানিদূষণের প্রভাব

নদ–নদী, পুকুর, খাল–বিল ও ভূগর্ভস্থ উৎসের পানি দূষিত হলে তা উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের উপর নানারকম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে, এমনকি কখনো কখনো তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তাহলে পানিদূষণের এ সকল ক্ষতিকর দিকগুলো দেখে নেয়া যাক।

তোমরা কি জান টাইফয়েড জ্বর, কলেরা, আমাশয়, সংক্রামক হেপাটাইটিস বি –এসবই পানিবাহিত রোগ? হ্যাঁ, এই সকল জীবন ধ্বংসকারী রোগসহ অনেক রোগ ছড়ায় পানির মাধ্যমে, এমনকি তা মহামারী আকারও ধারণ করতে পারে। নানাভাবে এসব রোগের জীবাণু পানিতে প্রবেশ করে (বিশেষ করে মল–মূত্র, পচা জিনিস)। সেই পানিতে গোসল করলে, পান করলে, ঐ পানি দিয়ে খাবার রান্না করলে বা ধুলে অথবা যেকোনোভাবে দূষিত পানির সংস্পর্শে এলে তা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে সংক্রমিত হয়।

কিছু কিছু জৈব পদার্থ আছে, যেমন– গোবর, গাছপালার ধ্বংসাবশেষ, খাদ্যের বর্জ্য ইত্যাদি পচনের সময় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে।

তোমরা বলতো এর ফলে কী হতে পারে? এর ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়। আর যদি ঐ সকল পদার্থ খুব বেশি থাকে তাহলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ শূন্যে নেমে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে পানিতে বসবাসকারী মাছসহ সকল প্রাণী অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে মারা যাবে। এই অবস্থা বেশিদিন চলতে থাকলে এক পর্যায়ে ঐ সকল নদ–নদী, খাল–বিল প্রাণীশূন্য হয়ে পড়বে। এসব নদী বা হ্রদকে মরা নদী (Dead River) বা মরা হ্রদ (Dead Lake) বলা হয়।

আমেরিকার উত্তর ওহাইও অঙ্গরাজ্যে এরি (Erie) নামের একটি হ্রদ আছে যাকে ১৯৬০ সালের দিকে মরা হ্রদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর কারণ হলো, ঐ হ্রদের চারপাশে বেশ কয়েকটি ডিটারজেন্ট তৈরির কারখানা থেকে সৃষ্ট বর্জ্য ঐ হ্রদে ফেলার ফলে সেখানে ফসফেটের মাত্রা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পানিতে ফসফেট ও নাইট্রোজেন খুব বেড়ে গেলে তা প্রচুর শ্যাওলা জন্মাতে সাহায্য করে। এই শ্যাওলাগুলো যখন মরে যায় তখন পানিতে থাকা দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। এর ফলে পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয় এবং তার ফলে মাছসহ সকল প্রাণী মরে যায় এবং এক পর্যায়ে এরি হ্রদের মতো মরা হ্রদে পরিণত হয়।

এ ঘটনার পর আমেরিকার সরকার আইন করে– বিশুদ্ধকরণ ছাড়া শিল্প–কারখানা হতে বর্জ্যপানি ফেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ডিটারজেন্ট কারখানাগুলো তারপর থেকে বর্জ্যপানি বিশুদ্ধ করে ফসফরাসমুক্ত করার পরে হ্রদে ফেলা শুরু করে এবং আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, তার প্রায় দশ বছর পরে এরি হ্রদে আবার প্রাণীর অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

আমাদের বুড়িগঙ্গা নদীতে এখন কি মাছ পাওয়া যায়? না, পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এর অবস্থা অনেকটাই এরি হ্রদের মতো। শুধু বুড়িগঙ্গা নদী নয়, আমাদের দেশের অনেক নদ–নদীর পানিই শিল্প–কারখানার সৃষ্ট বর্জ্যপানির কারণে দূষিত হয়ে পড়ছে যার কারণে এদের অবস্থা এরি হ্রদের মতো হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের এখনই সতর্ক না হলে এটি ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

ময়লা–আবর্জনাসহ, শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ মরে গেলে একদিকে যেমন অক্সিজেন স্বল্পতার সৃষ্টি করে অন্যদিকে তেমনি পানিতে প্রচন্ড দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। এতে করে সাঁতার কাটা, মাছ ধরা, নৌকাভ্রমণসহ সব ধরনের বিনোদনমূলক কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এর আগে জেনেছ যে, অজৈব পদার্থসমূহ (যেমন–এসিড, ক্ষার, লবণ) পানিতে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য খুবই ক্ষতিকর।

পানিতে যদি ক্ষতিকর ধাতব পদার্থ (যেমন– পারদ, সিসা, আর্সেনিক ইত্যাদি) থাকে, ঐ পানি পান করলে তা মানুষের দেহে নানাবিধ রোগের কারণ হতে পারে। নিচে পারদ, সিসা ও আর্সেনিকের প্রভাব দেয়া হলো:

পারদ : মস্তিষ্কের বিকল হওয়া, ত্বকের ক্যান্সার, বিকলাঙ্গ হওয়া।

সিসা : বিতৃষ্ণাবোধ বা খিটখিটে মেজাজ, শরীর জ্বালাপোড়া, রক্তশূন্যতা, কিডনি বিকল হওয়া, পরিমাণে খুব বেশি হলে মস্তিষ্ক বিকল হওয়া।

আর্সেনিক : আর্সেনিকোসিস, ত্বক ও ফুসফুসের ক্যান্সার, পাকস্থলীর রোগ।

কৃষিজমিতে ব্যবহৃত অজৈব সার (নাইট্রেট ও ফসফেট) দ্বারা পানি দূষিত হলেও মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেমন– ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, সিজিয়াম, রেডন প্রভৃতি দ্বারা পানি দূষিত হলে তা একদিকে যেমন জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য হুমকিস্বরূপ তেমনি মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ জীবদেহে নানা প্রকার ক্যান্সার ও শ্বাস–প্রশ্বাসজনিত রোগ সৃষ্টি করে।

তোমরা কি বলতে পার পানিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কীভাবে আসতে পারে? এক্ষেত্রে জ্বলন্ত প্রমাণ হলো সম্প্রতি (১১ মার্চ, ২০১১) জাপানের ফুকুশিমা শহরে ঘটে যাওয়া তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনা। ঐ দুর্ঘটনায় সুনামির কারণে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা থেকে প্রচুর তেজস্ক্রিয় পদার্থ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে পানি থেকে শুরু করে খাদ্যদ্রব্যেও প্রচুর তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া গেছে। লঞ্চ, স্টিমার ও জাহাজ থেকে ফেলা বর্জ্যে নানারকম রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে যা পানির জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে। এছাড়াও পানিতে অদ্রবণীয় বস্তু থাকলে পানি ঘোলাটে হয়; এর ফলে কী ধরনের সমস্যা হয় তা তোমরা আগেই জেনেছ।

মিঠা পানিতে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব

বৈশ্বিক উষ্ণতা হলো বিশ্বের বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা যা বিভিন্ন কারণে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানির তাপমাত্রাও বেড়ে যাবে। প্রায় ১০০ বছর আগে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ১° সেলসিয়াস কম ছিল। তোমরা হয়ত ভাবছ ১০০ বছরে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা ১° সেলসিয়াস বেড়েছে, এটি আর এমনকি। কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাপমাত্রার সামান্য বৃদ্ধিতেই মেরু অঞ্চলসহ অন্যান্য জায়গায় সঞ্চিত বরফ গলতে শুরু করে। এ বরফ গলা পানি কোথায় যাবে? এই পানি মূলত সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। ফলে পৃথিবীর যে সকল দেশ নিচু, সেগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাবে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি নদ–নদী, খাল–বিল, পুকুর, ভূগর্ভস্থ পানি ও হ্রদের পানিতে মিশে যাবে। ফলে পানির সকল উৎসই লবণাক্ত হয়ে পড়বে।

পানির সকল উৎস লবণাক্ত হলে কী কী অসুবিধা হবে? প্রথমত মিঠা পানিতে বসবাসকারী জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এবং এক পর্যায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ, পানির তাপমাত্রা বাড়লে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে, আবার লবণাক্ততা বাড়লেও কিন্তু দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায় অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতা ও লবণাক্ততা–এই দুইটির যৌথ বৃদ্ধির ফলে মিঠা পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন অনেক কমে যাবে, যার ফলে জলজ প্রাণীসমূহ বাঁচতে পারবে না। জলজ উদ্ভিদের বড় একটি অংশ লবণাক্ত পানিতে জন্মাতেও পারে না, বেড়ে উঠতেও পারে না, যে কারণে পানির জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে।

বৃষ্টিপাত

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ সংক্রান্ত কম্পিউটার মডেলিং থেকে ধারণা করা যায় যে, কোনো কোনো এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে, আবার কোনো কোনো এলাকায়, বিশেষ করে নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাবে, যা খরা সৃষ্টি করতে, এমনকি মরুভূমিতেও পরিণত করতে পারে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধরন পরিবর্তন হলে নদ–নদী, খাল–বিলে পানির পরিমাণ ও

প্রবাহ পরিবর্তিত হবে যা অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। কম্পিউটার মডেলিং থেকে এটাও অনুমান করা যায় যে কোনো এলাকায় শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে, যা থেকে অসময়ে বন্যা হতে পারে।

বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণতার কোনো ব্যাপার কি তোমাদের চোখে ধরা পড়ছে?

বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণতার একটি বড় প্রমাণ হলো, এখন গ্রীষ্মকালে অনেক বেশি গরম পড়ে, এমনকি মাঝে মাঝে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা ৪৭° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যায়, যেটি আগে কখনো হয়নি। তাপমাত্রার উপাত্ত থেকে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল–দুই সময়েই তাপমাত্রা আগের তুলনায় বেশি থাকে। অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব বাংলাদেশে স্পষ্টতই পড়ছে। বাংলাদেশের মিঠা পানিতে এর প্রভাব কী হবে? আগে তোমরা জেনেছ যে বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বাড়লে পৃথিবীতে সঞ্চিত বরফ গলে যাবে এবং সমুদ্রে পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এর প্রভাব বাংলাদেশে আরো তীব্রতর হবে, কেননা বঙ্গোপসাগরে পানির উচ্চতা বেড়ে আমাদের দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অংশ পানির নিচে চলে যাবে। সাগরের লবণাক্ত পানি মুল ভূখণ্ডে ঢুকে নদ–নদী, খাল–বিল ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে যাবে। যার ফলে মিঠা পানি বলতে আর কিছু থাকবে না। তোমরা হয়তো জান যে, সাতক্ষীরাসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় চিংড়ি চাষের জন্য নালা কেটে লবণাক্ত পানি মুল ভূখণ্ডে আনা হয়। এ কারণে ঐ সকল এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিসহ মিঠা পানির অন্যান্য উৎস লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে খাওয়ার পানি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার উপযোগী পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। ঐ সকল এলাকার মিঠা পানির একমাত্র উৎস বলতে গেলে এখন বৃষ্টির পানি। এমনও দেখা গেছে যে প্রায় ১০–১৫ টি গ্রামের মানুষ সবাই মিলে একটি পুকুরে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি ব্যবহার করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পানি আনার জন্য গৃহবধূদের ৭–৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পুকুরে সংগৃহীত পানি আনতে হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে সমগ্র বাংলাদেশেই এ অবস্থা হতে পারে।

ইতিমধ্যেই কয়েকটি দেশ (যেমন– মালদ্বীপ, ভারতের অংশ) বৈশ্বিক উষ্ণতাজনিত কারণে সাগরে পানির উচ্চতা বেড়ে পানির নিচে ডুবে গেছে এবং ঐ সকল দেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ জলবায়ু শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে বৃষ্টিপাতের ধরন পাল্টে যেতে পারে। যার কারণে নদ–নদীতে পানির প্রবাহ ও গতিপথ পাল্টে যাবে।

বাংলাদেশে পানিদূষণের প্রতিরোধের কৌশল এবং নাগরিকের দায়িত্ব

পানি কীভাবে দূষিত হয় আমরা ইতিমধ্যেই তা জেনেছি। পানিদূষণ প্রতিরোধ করতে হলে দূষণের কারণসমূহ জেনে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করাটাই হবে দূষণ প্রতিরোধের কৌশলের বড় দিক। পানিদূষণ প্রতিরোধে কী কী কৌশল অবলম্বন করা যায় তা দেখে নিই।

জলাভূমি রক্ষা : ইদানীং আমাদের দেশে জলাভূমি ভরাট করে ঘর–বাড়ি, আবাসন এলাকা, শপিং মল ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে। তোমরা কি জান নিচু জলাভূমি পানি ধারণ করা ছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? জলাভূমি একদিকে পানি ধারণ করে যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে তেমনি ক্ষতিকর পদার্থ শোষণ করে, ভূগর্ভে ও নদীতে বিশুদ্ধ পানি সঞ্চালন করে ও বন্যপ্রাণীদের সহায়তা করে। বনভূমিও কিন্তু ভূগর্ভে পানি সঞ্চালনে সাহায্য করে এবং বন্যপ্রাণীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এগুলো ধ্বংস হলে নদীর দূষণ বেড়ে যায়। জলাভূমি, বনভূমি রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা পানির দূষণ রোধে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রাখতে পারে। এখন আমাদের দেশেও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা বৃক্ষরোপণ করে, জলাভূমি, হ্রদ ও সমুদ্রের তীরে পরিচ্ছন্নতার কাজ করে পানির দূষণ রোধে জনসচেতনতামূলক কাজ করে যাচ্ছে।

শহরাঞ্চলে পানিদূষণের একটি বড় কারণ বৃষ্টির পানির প্রবাহ। তোমরা জান, শহরাঞ্চলের রাস্তাঘাটসহ বেশিরভাগ এলাকা পাকা হওয়ায় বৃষ্টির পানি এর ভেতর দিয়ে ভূগর্ভে যেতে পারে না। ফলে বৃষ্টির পানি যাবতীয় ময়লা–আবর্জনা ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ নিয়ে নর্দমার নালার মাধ্যমে নদী, জলাশয় বা হ্রদে গিয়ে পানিকে দূষিত করে। কীভাবে এটি বন্ধ করা যায়?

বাসা–বাড়ির ছাদে বৃষ্টির পানি কি সংগ্রহ করা সম্ভব? অবশ্যই এটি সম্ভব এবং খুব সহজেই তা করা যায়। এভাবে সংগৃহীত পানি আমরা বাগান বা ফুলের টবে ব্যবহার করতে পারি, এমনকি কাপড়–চোপড় ধোয়া বা পায়খানায় শৌচ কাজেও ব্যবহার করতে পারি। এতে একদিকে যেমন পানির দূষণ বন্ধ হবে, অন্যদিকে তেমনি পানি সরবরাহের উপর চাপও কম পড়বে। তোমরা অনেকেই জান যে ঢাকা শহরে গ্রীষ্মকালে অনেক এলাকাতে পানির প্রচণ্ড অভাব থাকে। এমনও দেখা গেছে কোনো কোনো এলাকায় ৩–৪ দিন একটানা পানি পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করলে পুরো পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে সরকার বা সিটি কর্পোরেশন অথবা নাগরিক সমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাসা–বাড়ি ছাড়া অন্যান্য জায়গায় বৃষ্টির পানির দূষণ কীভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে? আমরা কংক্রিটের বদলে এমন কিছু ছিদ্রযুক্ত পদার্থ ব্যবহার করতে পারি, যার ভিতর দিয়ে বৃষ্টির পানি ভূগর্ভে জমা হতে পারে। গ্রাভেল (Gravel) এমন একটি পদার্থ, যা কংক্রিটের বদলে ব্যবহার করা যায়। আবার সম্ভব হলে বড় গর্ত বা খাল তৈরি করে সেখানে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। বিশ্বের অনেক শহরেই এ ব্যবস্থা আছে।

জনসচেতনতা বৃদ্ধি : তোমরা কি বুঝতে পারছ যে পানিদূষণকারী ক্ষতিকর বর্জ্যসমূহের বড় একটি অংশ আসে আমাদের বাসা–বাড়ি থেকে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে? আমরা অ্যারোসল, পেইন্টস, পরিষ্কারক, কীটনাশক ইত্যাদি নানারকম ক্ষতিকারক পদার্থ অহরহ ব্যবহার করি এবং ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলে দিই বা রেখে দিই, যা একপর্যায়ে পানি দূষণ করে। এগুলো আমরা এভাবে না ফেলে যদি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলি তাহলেও কিছু দূষণ কমে যাবে। এসব পদ্ধতিতে দূষণ কমানোর জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য রেডিও–টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ও সতর্কবার্তা প্রচার করা যেতে পারে। এমনকি তোমরা স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা পানির প্রয়োজনীয়তা, অপ্রতুলতা এবং দূষণ প্রতিরোধ বিষয়ে পোস্টার তৈরি করে মানুষকে সচেতন করতে পার। আমেরিকার মতো উন্নত দেশেও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

শিল্প–কারখানার দ্বারা পানির দূষণ প্রতিরোধ : শিল্প–কারখানার সৃষ্ট বর্জ্যপানি বিশেষ করে নদীর পানি দূষণের অন্যতম কারণ। এই দূষণ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, সৃষ্ট বর্জ্যপানি পরিশোধন করে তারপর নদীতে ফেলা। এ পরিশোধন কাজের জন্য দরকার বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (Effluent Treatment Plant বা ETP)। ইটিপি কীভাবে তৈরি করা হবে তা নির্ভর করে কী ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ বর্জ্য পানিতে বিদ্যমান তার ওপর। যেহেতু একেক ধরনের শিল্প–কারখানা থেকে একেক ধরনের বর্জ্যপানি বের হয় তাই একটি সাধারণ ইটিপি দিয়ে সব কারখানার বর্জ্যপানি পরিশোধন করা সম্ভব নয়। তবে একই ধরনের শিল্প–কারখানা দিয়ে একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলে সব কারখানার

বর্জ্যপানি একত্রিত করে একটি ইটিপিতে পরিশোধন করা যেতে পারে।

কৃষিজমি থেকে মাটির ক্ষয়জনিত কারণে দূষণ প্রতিরোধ : একটি জমিতে বছরের পর বছর ফসল চাষ করলে এর উর্বরতা নষ্ট হয়। আর উর্বরতা নষ্ট হলে মাটির ক্ষয় অনেক বেড়ে যায়। আমরা যদি জৈব সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করি, তবে তা মাটির ক্ষয়রোধ করতে সাহায্য করে। তোমরা কি বলতে পার কীভাবে এটি সম্ভব?

মাটিতে জৈব সার থেকে আসা জৈব পদার্থ বেশি থাকে বলে তা বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে সহায়তা করে। ফলে, বৃষ্টি হলে খুব সহজেই তা প্রবাহিত হয় না বা মাটির কণা সহজে বাতাসে উড়ে গিয়ে নদীর পানি দূষিত করে না। এতে করে মাটির কণা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ যেমন– কীটনাশক, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ইত্যাদি দ্বারাও দূষণ কমে যায়। আবাদি জমির চারপাশে পুকুর খনন করেও পানির দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

তোমরা কি জান ক্ষেত থেকে ফসল কাটার পর যে অবশিষ্ট অংশ জমিতে থাকে, তা পানির দূষণ রোধ করে? কীভাবে তা সম্ভব হয়? ফসলের ধরন পরিবর্তন করে দূষণ রোধ করা যায়। যখন–তখন সার প্রয়োগ না করে ঠিক সময়ে বিশেষ করে বৃষ্টিপাতের আগ মুহূর্তে সার প্রয়োগ না করে দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

উন্নয়ন কার্যক্রমে পানির ভূমিকা : আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। আর সেই কৃষিকাজে সেচের জন্য দরকার পানি অর্থাৎ পানি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। ঘর–বাড়ি কি পানি ছাড়া তৈরি হয়? না, অসম্ভব। আবার উন্নত বিশ্বের প্রতিটি দেশ শিল্পে অত্যন্ত উন্নত। এমন কোনো শিল্প–কারখানা আছে, যেখানে পানি লাগে না? না, নেই। সকল শিল্প–কারখানায় কোনো না কোনো পর্যায়ে পানির ব্যবহার অপরিহার্য। তাহলে আমরা বলতে পারি, উন্নয়ন ও পানি একে অপরের পরিপূরক।

বাংলাদেশে পানির উৎসে হুমকি : বাংলাদেশে যে সকল পানির উৎস রয়েছে (নদ–নদী, খাল–বিল, হাওর, হ্রদ), তোমরা কি মনে কর সেগুলো কোনো হুমকির মধ্যে রয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের পানির উৎসসমূহ স্পষ্টতই বেশ কয়েকটি হুমকির মুখে রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলা যায়, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে হুমকি। এর আগে তোমরা জেনেছ যে এ জাতীয় পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের প্রায় এক–তৃতীয়াংশ লবণাক্ত পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। যার ফলে আমাদের পানির উৎসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সমুদ্রের উচ্চতা ২ মিটার বাড়লে বাংলাদেশের প্রায় এক–দশমাংশ পানির নিচে চলে যাবে। তোমরা টেলিভিশনে নিশ্চয়ই জাপান ও ইন্দোনেশিয়ায় ঘটে যাওয়া সুনামির ভয়াবহতা দেখেছ। বাংলাদেশও সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে।

বন্যা ও মাটির ক্ষয়জনিত কারণে সৃষ্ট হুমকি : বাংলাদেশ ভৌগোলিক কারণে বন্যাপ্রবণ একটি দেশ। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি নদ–নদীই খরস্রোতা, যার ফল হলো নদী ভাঙ্গান। নদী ভাঙ্গানের ফলে সৃষ্ট মাটি কোথায় যায় বলতে পারো? এই মাটি পানির স্রোতে মিশে যায় এবং একপর্যায়ে নদীর তলায় জমা হয় ও নদী ভরাট হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়, অন্যদিকে তেমনি নদী শুকিয়ে যেতে পারে বা মরেও যেতে পারে।

তোমরা কি জান আমাদের দেশের অনেক নদী ইতিমধ্যেই মরে গেছে? করতোয়া, বিবিয়ানা, শাখা বরাক–এসব নদীই এখন মরা নদী। এমনকি একসময়ের খরস্রোতা পদ্মা নদীর অবস্থাও সংকটাপন্ন। পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত পাকশী ব্রিজের নিচে গরুর গাড়ি চলার দৃশ্য তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। এর কারণ হলো, নদী ভরাট হয়ে যাওয়া। নদী শুকিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো পানিসম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ।

নদী দখল : আজকাল নদী দখল করে নানা রকম স্থাপনা এমনকি আবাসিক এলাকা পর্যন্ত গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে কী ঘটছে? নদীর গতিপথ সরু হয়ে যাচ্ছে এবং পানি ধারণক্ষমতা কমে যাচ্ছে। যে কারণে ভারী বর্ষণ হলেই বন্যা হয়ে যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষাসহ বেশ কয়েকটি নদী এভাবে দখল হয়ে যাওয়ার ফলে এরা প্রায় মরতে বসেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এগুলোও মরা নদীতে পরিণত হবে।

নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ : তোমরা কি মনে কর, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধও আমাদের পানিসম্পদের জন্য একটি হুমকি হতে পারে? হ্যাঁ, ঠিক তাই। পদ্মা, যমুনাসহ বেশ কয়েকটি নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেওয়ার ফলে এদের শাখা–প্রশাখায় পানির প্রবাহ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। মনোজ, বড়াল এবং কুমার নদী এ কারণে শুকিয়ে মরে গেছে। দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলের মরিছাপ, হামকুড়া ও হরিহর নদীও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের জন্য মরে গেছে। কাজেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ আমাদের পানি–সম্পদের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি।

অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : তোমরা কি জান, ঢাকা শহরে দৈনিক কি পরিমাণ কঠিন বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়? এর পরিমাণ দৈনিক প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন। এর প্রায় অর্ধেক পরিমাণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সংগ্রহ করে ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসে এবং বাকি অর্ধেক নর্দমার নালা দিয়ে বা অন্য উপায়ে নদীতে গিয়ে পড়ে।

এছাড়া ঢাকার আশপাশের প্রায় সব শিল্প–কারখানায় অপরিশোধিত বর্জ্যও নদীতে ফেলা হয়। এর পরিণাম কী? নদী এসব বর্জ্য দিয়ে ভরে উঠছে, নদীর পানি বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শিগগিরই বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা ও বালু নদী মরে যাবে। চট্টগ্রাম শহরের আশপাশের নদীগুলোর অবস্থাও একই।

পানির গতিপথ পরিবর্তন (Diversion of Water) : ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার গঙ্গার পানির গতিপথ পরিবর্তন করে। ১৯৭৭ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটি চুক্তি হয়। পরবর্তীতে পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার জন্য ১৯৯৬ সালে আরেকটি চুক্তি হয়। গঙ্গার পানির এই গতিপথ পরিবর্তনের কারণেই বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক নদী পানিশূন্য হয়ে পড়েছে, যা ঐ অঞ্চলকে অনেকটা মরুভূমিতে পরিণত করেছে। এছাড়া ভারত ব্রহ্মপুত্র নদের পানির গতিপথও পরিবর্তন করে শিলিগুড়ি করিডর দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার হাওর এলাকাসহ পুরো দক্ষিণাঞ্চলে পানিসম্পদে বিপর্যয় নেমে আসবে। সম্প্রতি ভারত টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তাতেও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের পুরো এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে। অতএব এ কথা বলা যায় যে পানির গতিপথ পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ হুমকি।

পানি একটি মৌলিক অধিকার : পানি প্রকৃতির এমন একটি দান, যা প্রায় সব জীবের জন্য অপরিহার্য। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ খাওয়া, রান্নাসহ অন্যান্য কাজে পানি ব্যবহার করে আসছে। মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এদের প্রতিটিই পানির ওপর নির্ভরশীল। তাই পানিও মানুষের মৌলিক অধিকার। আর যেহেতু এটি প্রাকৃতিক সম্পদ, কোনো দেশ বা জাতি এটি সৃষ্টি করেনি, সেহেতু প্রতিটি ফোঁটা পানির

উপর পৃথিবীর সব মানুষের অধিকার রয়েছে। কাজেই আমরা যখন পানি ব্যবহার করি, তখন মনে রাখতে হবে যে আমরা অন্যের সম্পদ ভোগ করছি এবং এটি কোনোমতেই অপচয় করা উচিত নয়। অপচয় করার অর্থই হলো অন্যের অধিকার খর্ব করা, যা সমীচীন নয়।

পানির উৎস সংরক্ষণ ও উন্নয়ন : আমরা সবাই জানি, আমাদের প্রচুর পানিসম্পদ আছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ব্যবহারযোগ্য পানিসম্পদের পরিমাণ খুবই সীমিত। এমতাবস্থায় আমরা যদি পানির উৎস সংরক্ষণে সজাগ না হই, তাহলে ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হতে পারে। যেকোনো ধরনের উন্নয়নকাজ তা শিল্প–কারখানা, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, নগরায়ন যাই হোক না কেন– পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আবার এই সকল উন্নয়নের ফলে পানির উৎসসমূহ যদি হুমকির মুখে পড়ে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই থমকে যাবে। কাজেই যেখানে–সেখানে শিল্প–কারখানা, নগরায়ন না করে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে করতে হবে। যাতে করে পানির উৎসসমূহ কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

পানিপ্রবাহের সর্বজনীনতা এবং আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি

তোমরা কি জান, পৃথিবীর সব সাগর–মহাসাগর একটির সাথে আরেকটির সংযোগ আছে? হ্যাঁ, আমাদের সাগর–মহাসাগর বা সমুদ্র একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত। আবার পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে সৃষ্ট নদী সাগরে গিয়ে পড়ে। অর্থাৎ একটি নদী বা সাগর যেখানেই থাকুক না কেন, যে দেশেই এর উৎপত্তি হোক না কেন বা যেখান দিয়েই এটি প্রবাহিত হোক না কেন, আসলে সেগুলো সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ অর্থাৎ পানিসম্পদ অবশ্যই একটি সর্বজনীন বিষয়। এটি কোনো জাতি–গোষ্ঠী, দেশ বা মহাদেশের সম্পদ নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৃষ্ট রাজনৈতিক বৈরিতা উন্নয়ন প্রতিযোগিতা বা যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারণে পানিসম্পদের এই সর্বজনীনতা অনেক ক্ষেত্রেই মানা হচ্ছে না। তবে জাতিসংঘ ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদ–নদীর ক্ষেত্রে পানির বণ্টন নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমঝোতা চুক্তি তৈরি করে, যদিও এখন পর্যন্ত সেটি খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। এছাড়া পানিসম্পদ–সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো।

রামসার কনভেনশন (Ramsar Convention): ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারিতে ইরানের রামসারে ইউনেস্কোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নেওয়া জলাভূমি–সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ হলো রামসার কনভেনশন। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এই সমঝোতা চুক্তিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সালে রামসার কনভেনশন সংশোধন করা হয়।

আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন (International Water Course Convention) : আন্তর্জাতিক আইন সমিতি (The International Law Association) ১৯৬৬ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত তাদের ৫২তম সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানির ব্যবহার সম্পর্কে একটি কমিটি রিপোর্ট গ্রহণ করে। এটি হেলসিংকি নিয়ম নামে অভিহিত। পরবর্তীতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইন কমিশন আন্তর্জাতিক পানির ব্যবহারের জন্য একটি চুক্তি তৈরি করে, যা ১৯৯৭ সালের ২১ মে জাতিসংঘের সাধারণসভায় কনভেনশন হিসেবে গৃহীত হয়। এই কনভেনশন অনুযায়ী, একের অধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর পানি কোনো দেশই অন্য দেশের অনুমতি ছাড়া একতরফাভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। তবে এই রীতি অনুযায়ী দেশসমূহ ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে নিজ নিজ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অংশের পানি ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য দেশের অংশে পানিপ্রবাহে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন উদ্ভিদটি পানিতে এবং স্থলে উভয় জায়গায় জন্মে?

ক. শ্যাওলা খ. কলমি

গ. সিংগারা ঘ. ক্ষুদিপানা

২. পানির pH মান খুব কমে গেলে জলজ প্রাণীর–

i. অঙ্গপতঙ্গ সঠিকভাবে বিকশিত হবে না

ii. দেহাভ্যন্তরে খনিজ পদার্থ কমে যাবে

iii. রোগব্যাধি সৃষ্টি হবে

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অনিক ও তুষার দুজনে দুটি পুকুরে মাছ চাষ করে। অনিকের পুকুরের মাছের বৃদ্ধি সন্তোষজনক। আর তুষারের পুকুরের মাছগুলো দুর্বল; এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সঠিকভাবে বিকশিত হয়নি।

৩. অনিকের পুকুরের পানি কোন ধরনের–

ক. এসিডিক খ. ক্ষারীয়

গ. নিরপেক্ষ ঘ. ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ

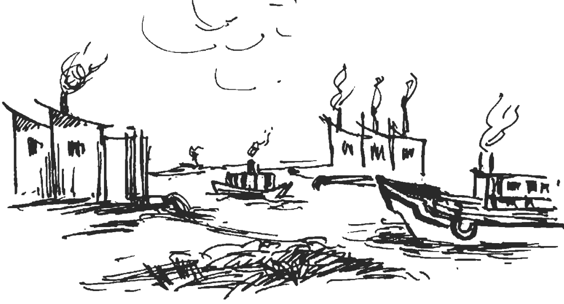
৪. তুষারের পুকুরের পানিতে নিচের কোনটি প্রয়োগ করা উচিত?

ক. এসিড খ. ক্ষার

গ. ক্যালসিয়াম ঘ. ফসফরাস

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. পানিতে দ্রবীভূত কোন গ্যাসের সাথে গ্লুকোজ বিক্রিয়া করে?

খ. পানির পুনঃআবর্তন বলতে কী বোঝায়?

গ. নদীটি কোন ধরনের নদীতে পরিণত হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর নদীটিকে জলজ প্রাণী বসবাসের উপযোগী করা সম্ভব? যুক্তিসহ মতামত দাও।

২. জমিলা খাতুন বাড়ির পাশের পুকুরের ঘোলা পানিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রান্নার উপযোগী করেন। অপরদিকে রতন সাহেব তার পানি বোতলজাতকরণ কারখানায় ও ঔষধ তৈরির কারখানায় পানিকে জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করেন।

ক. পানির স্ফুটনাঙ্ক কাকে বলে?

খ. জলজ উদ্ভিদ পানির স্রোতে ভেঙ্গে যায় না কেন?

গ. জমিলা খাতুন পুকুরের পানিকে কীভাবে রান্নার উপযোগী করেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রতন সাহেব তার দুই কারখানার কাজে ব্যবহার করা পানি কি একইভাবে জীবাণুমুক্ত করেন? যুক্তিসহ মতামত দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

হৃদযন্ত্রের যত কথা

মানুষ ও অন্যান্য উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের দেহে যেসব তন্ত্র আছে তার মধ্যে রক্ত সংবহনতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই তন্ত্রের মাধ্যমে দেহের যাবতীয় বিপাকীয় কাজের রসদ পরিবাহিত হয়। রক্ত সংবহনতন্ত্র রক্ত, হৃদপিণ্ড ও রক্তবাহিকা নিয়ে গঠিত। হৃৎপিণ্ড হৃদপেশি নির্মিত ত্রিকোণাকার ফাঁপা প্রকোষ্ঠযুক্ত পাম্পের মতো অঙ্গ। এর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সারা দেহে রক্ত সংবহিত হয়। আকার, আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা তিন রকম, যথা- ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা। রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতর দিয়ে সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড মানব ও অন্য সকল প্রাণীদেহে পাম্প যন্ত্রের মতো কাজ করে। ধমনি দিয়ে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে বাহিত হয়। সাধারণত কার্বন ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। ধমনি ও শিরার সংযোগস্থল জালিকাকারে বিন্যস্ত হয়ে কৈশিক জালিকা গঠন করে। আমরা এ অধ্যায়ে রক্ত সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

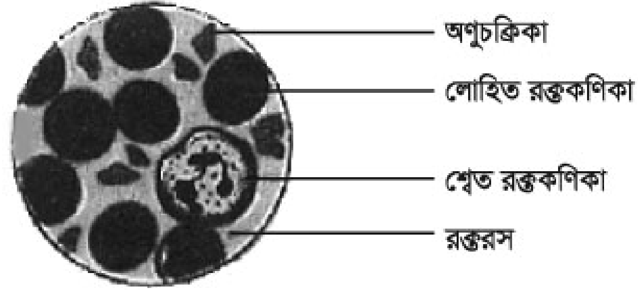
রক্তের উপাদান এবং এদের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।

- রক্তের গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তের স্থানান্তরের নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তে বিয়ুতা/বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ এবং এর ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শরীরে রক্ত সঞ্চালন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আদর্শ রক্তচাপ, হার্টবিট, হার্টরেট এবং পালসরেটের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্তচাপজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ ও প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শরীরে রক্ত সঞ্চালনে কলেস্টরলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কলেস্টরলকে প্রত্যাশিত সীমার রাখার প্রয়োজন প্রয়োজনীয়তা ও উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তে সুগারের ভারসাম্যতার কারণ, প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখার উপায় বর্ণনা করতে পারব।

রক্ত (Blood)

প্রাণীদেহে রক্ত একধরনের লাল বর্ণের অস্বচ্ছ, আন্তঃকোষীয় লবণাক্ত ও ক্ষারধর্মী তরল যোজক টিস্যু। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় ৫–৬ লিটার রক্ত থাকে (মানুষের দেহের মোট ওজনের প্রায় ৮%)। মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহের রক্ত লাল রঙের। রক্তের রসে হিমোগ্লোবিন নামক লৌহঘটিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকায় রক্তের রং লাল। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে অক্সিজেন পরিবহন করে। কিছু পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে ফুসফুসে পরিবাহিত হয়। তবে কার্বন ডাই–অক্সাইডের সিংহভাগ রক্ত দ্বারা বাইকার্বনেট আয়ন হিসেবে ফুসফুসে পরিবাহিত হয়।

রক্তের উপাদান ও এদের কাজ : রক্তের প্রধান উপাদানগুলো হলো–রক্তরস বা প্লাজমা এবং রক্তকণিকা। সমগ্র রক্তের ৫৫% রক্তরস এবং বাকি ৪৫% রক্তকণিকা। রক্তকে সেন্ট্রিফিউজ করলে উপরে হালকা হলুদ বর্ণের প্রায় ৫৫% যে অংশ থাকে, তাকে রক্তরস এবং নিচে গাঢ় লাল বাকি ৪৫% অংশকে রক্তকণিকা বলে। রক্তরসকে আলাদা করলে এটি হলুদ বর্ণের দেখায়। প্রকৃতপক্ষে রক্ত কণিকাগুলো রক্তরসে ভাসমান থাকে।



চিত্র : ৩.১ মানুষের রক্তের উপাদান

রক্তরস বা প্লাজমা

রক্তের তরল অংশকে প্লাজমা বলে। রক্তরসের প্রায় ৯০% পানি, বাকি ১০% বিভিন্ন রকমের জৈব ও অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। অজৈব পদার্থগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থের আয়ন যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, আয়োডিন এবং গ্যাসীয় পদার্থ O_2, CO_2, N_2 ইত্যাদি থাকে। জৈব পদার্থগুলো হলো–

১. খাদ্যসার– গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি।
২. রেচন পদার্থ– ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি।
৩. প্রোটিন–ফাইব্রিনোজেন, গ্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন, প্রোথ্রম্বিন ইত্যাদি।
৪. প্রতিরক্ষামূলক দ্রব্যাদি– যেমন অ্যান্টিটক্সিন, অ্যাগ্লুটিনিন ইত্যাদি।
৫. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নিঃসৃত বিভিন্ন হরমোন।
৬. কোলেস্টেরল, লেসিথিন, বিলিরুবিন ইত্যাদি নানা ধরনের যৌগ।

রক্তরসের কাজ

১. রক্তকণিকাসহ রক্তরসে দ্রবীভূত খাদ্যসার দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়।
২. টিস্যু থেকে বর্জ্য পদার্থ নির্গত করে রেচনের জন্য বৃক্কে পরিবহন করে।
৩. শ্বসনের ফলে কোষে সৃষ্ট CO_2 কে বাইকার্বনেট হিসেবে ফুসফুসে পরিবহন করে।
৪. রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহন করে।
৫. হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশে বহন করে।
৬. রক্তের অম্ল–ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

রক্তকণিকা

রক্তরসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন রকমের কোষকে রক্তকণিকা বলে। রক্তকণিকাগুলো প্রধানত তিন রকমের যথা– ১. লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট, ২. শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট এবং ৩. অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট।

লোহিত রক্তকণিকা

মানবদেহের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা দ্বি–অবতল ও চাকতি আকৃতির। এতে হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে লাল বর্ণের হয়। এজন্য এদের Red Blood Cell বা RBC বলে। লোহিত কণিকা প্রকৃতপক্ষে হিমোগ্লোবিন ভর্তি ভাসমান ব্যাগ এবং চ্যাপ্টা আকৃতির। এ কারণে লোহিত কণিকা অধিক পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহনে সক্ষম। লোহিত কণিকাগুলোর বিভাজন হয় না। এ কণিকাগুলো সার্বক্ষণিকভাবে প্রতি মিনিটে অস্থিমজ্জার ভিতরে উৎপন্ন হয় এবং রক্তরসে চলে আসে। মানুষের লোহিত কণিকার আয়ু প্রায় চার মাস অর্থাৎ ১২০ দিন। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোহিত রক্তকণিকাগুলো উৎপন্ন হওয়ার পর রক্তরসে আসার পূর্বে নিউক্লিয়াসবিহীন হয়ে যায়। অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে এরকম ঘটে না অর্থাৎ এদের লোহিত কণিকাগুলোতে নিউক্লিয়াস থাকে। লোহিত কণিকা প্লিহা (spleen) তে সঞ্চিত থাকে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এখান থেকে লোহিত কণিকা রক্তরসে সরবরাহ হয়।

বিভিন্ন বয়সের মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা হচ্ছে: ভ্রূণ দেহে : ৮০–৯০ লাখ; শিশুর দেহে : ৬০–৭০ লাখ; পূর্ণবয়স্ক পুরুষ দেহে : ৪.৫ – ৫.৫ লাখ এবং পূর্ণবয়স্ক নারীর দেহে : ৪ – ৫ লাখ। এগুলো মোটামুটি গড় হিসাব।



চিত্র : ৩.২ লোহিত কণিকা

লোহিত কণিকার কাজ : লোহিত রক্তকণিকার প্রধান কাজ হলো–

১. দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করা।

২. নিষ্কাশনের জন্য কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডকে টিস্যু থেকে ফুসফুসে বহন করা।

৩. লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন রক্তের অম্ল–ক্ষারের সমতা বজায় রাখার জন্য বাফার হিসেবে কাজ করে।

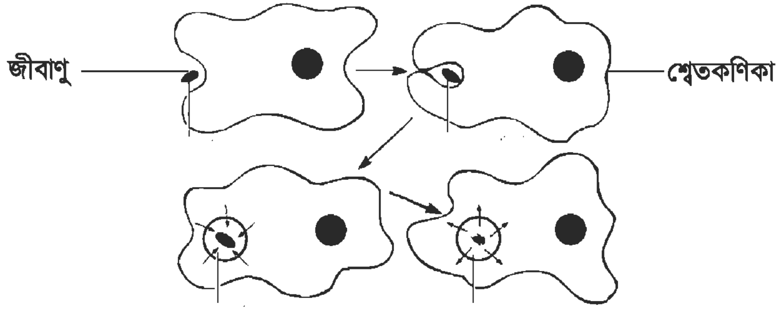
শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট

শ্বেত কণিকার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এগুলো হিমোগ্লোবিনবিহীন এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত বড় আকারের কোষ। শ্বেত কণিকার গড় আয়ু ১–১৫ দিন। হিমোগ্লোবিন না থাকার কারণে এদের শ্বেত রক্তকণিকা বলে। ইংরেজিতে White Blood Cell বা WBC বলে। রক্তে এদের সংখ্যা RBC এর তুলনায় অনেক কম। এরা অ্যামিবার মতো দেহের আকারের পরিবর্তন করে। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করে। রক্ত জালিকার প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। শ্বেত কণিকাগুলো রক্তরসের মধ্য দিয়ে নিজেরাই চলতে পারে। দেহ বাইরের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে, দ্রুত শ্বেত কণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে ৪–১০ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। অসুস্থ মানবদেহে এর সংখ্যা বেড়ে যায়। শ্বেত রক্ত কণিকায় DNA থাকে।

প্রকারভেদ

গঠনগতভাবে এবং সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুসারে শ্বেত কণিকাকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়– যথা (ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট বা দানাবিহীন এবং (খ) গ্রানুলোসাইট বা দানাযুক্ত।

(ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট : এ ধরনের শ্বেত কণিকাগুলোর সাইটোপ্লাজম দানাহীন ও স্বচ্ছ। অ্যাগ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকা দুই রকমের; যথা– লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট। দেহের লিম্ফনোড, টনসিল, প্লিহা ইত্যাদি অংশে এরা তৈরি হয়। লিম্ফোসাইটগুলো বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত ছোট কণিকা। মনোসাইট ছোট, ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট বড় কণিকা। লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি গঠন করে এবং এই অ্যান্টিবডির দ্বারা দেহে প্রবেশ করা রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে। এভাবে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে।



চিত্র : ৩.৩ শ্বেত কণিকায় ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া



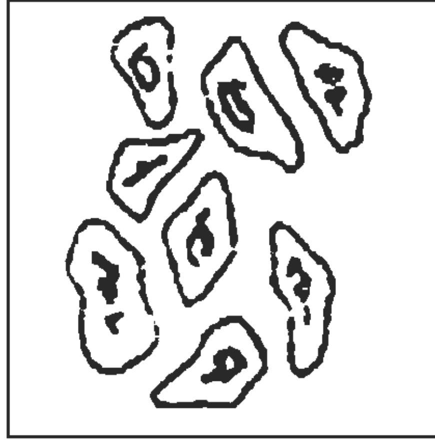
চিত্র : ৩.৪ বিভিন্ন ধরনের শ্বেত কণিকা

(খ) গ্রানুলোসাইট : এদের সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানাযুক্ত। গ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকাগুলো নিউক্লিয়াসের আকৃতির ভিত্তিতে তিন প্রকার যথা– ১. নিউট্রোফিল ২. ইওসিনোফিল ও ৩. বেসোফিল।

নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে। ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নামক রসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে দেহে এলার্জি প্রতিরোধ করে। বেসোফিল হেপারিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতরে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট

ইংরেজিতে এদেরকে প্লেইটলেট (Platelet) বলে। এগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা, রড আকারের হতে পারে। এদের সাইটোপ্লাজম দানাদার এবং সাইটোপ্লাজমে কোষ অঙ্গাণু–মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বস্তু থাকে; কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না। অনেকের মতে, অণুচক্রিকাগুলো সম্পূর্ণ কোষ নয়; এগুলো অস্থি–মজ্জার বৃহদাকার কোষের ছিন্ন অংশ। অণুচক্রিকাগুলোর গড় আয়ু ৫–১০ দিন। পরিণত মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। অসুস্থদেহে এদের সংখ্যা আরও বেশি হয়।



চিত্র ৩.৫ : অণুচক্রিকা

অণুচক্রিকার প্রধান কাজ হলো রক্ত তঞ্চন (Blood clotting) করতে সাহায্য করা। যখন কোনো রক্তবাহিকা বা কোনো টিস্যু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কেটে যায়, তখন সেস্থানের অণুচক্রিকাগুলো ভেঙে যায় এবং থ্রম্বোপ্লাসটিন (Thromboplastin) নামক পদার্থ সৃষ্টি করে। এ পদার্থগুলো রক্তের আমিষ প্রোথ্রমবিনকে থ্রমবিনে পরিণত করে। থ্রমবিন পরবর্তীতে রক্তরসের প্রোটিন–ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিন জালকে পরিণত করে রক্তের তঞ্চন ঘটায়। ফাইব্রিন একধরনের অদ্রবণীয় প্রোটিন, যা দ্রুত সুতার মতো জালিকা প্রস্তুত করে। এটি ক্ষত স্থানে জমাট বাঁধে এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। কিন্তু রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াটি আরও জটিল, এ কাজের জন্য আরও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং ভিটামিন K ও ক্যালসিয়াম আয়ন জড়িত থাকে।

কাজ : লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং অণুচক্রিকার মধ্যে পার্থক্যগুলো ছকে লিখ।

রক্তের সাধারণ কাজ

১. **শ্বাসকার্য :** রক্ত অক্সিজেনকে ফুসফুস থেকে টিস্যু কোষে এবং টিস্যু কোষ থেকে কার্বন ডাই–অক্সাইডকে ফুসফুসে পরিবহন করে। লোহিত কণিকা ও রক্তরস প্রধানত এ কাজটি করে।

২. **হরমোন পরিবহন :** অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে।

৩. **খাদ্যসার পরিবহন :** দেহের সঞ্চয় ভান্ডার থেকে এবং পরিপাককৃত খাদ্যসার দেহের টিস্যু কোষগুলোতে বহন করে।

৪. **বর্জ্য পরিবহন :** নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থগুলোকে বৃক্কে পরিবহন করে।

৫. **উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ :** দেহে তাপের বিস্তৃতি ঘটিয়ে দেহের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. **রোগ প্রতিরোধ :** দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করলে মনোসাইট ও নিউট্রোফিল শ্বেত কণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণুকে গ্রাস করে ধ্বংস করে। লিম্ফোসাইট শ্বেত কণিকা অ্যান্টিবডি গঠন করে দেহের ভিতরের জীবাণুকে ধ্বংস করে এবং বাইরের থেকে জীবাণু দ্বারা আক্রমণকে প্রতিহত করে।

প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক মান–

১. লোহিত রক্তকণিকা – পুরুষ : প্রতিঘনমিলিমিটারে ৪.৫ – ৫.৫ লাখ।

– স্ত্রীলোক : প্রতি ঘনমিলিমিটারে ৪–৫ লাখ।

২. শ্বেত কণিকা: ৪০০০–১০,০০০ প্রতি ঘনমিলিমিটারে

i. নিউট্রোফিল: ৪০–৭৫%

ii. ইওসিনোফিল: ১–৬%

iii. মোনোসাইট : ২–১০%

iv. লিম্ফোসাইট : ২০–৪৫%

v. বেসোফিল : ০–১%

} সর্বমোট স্বাভাবিক WBC–এর মানের শতকরা হার।

২. হিমোগ্লোবিন } পুরুষ : ১৪ –১৬ g/dl

মহিলা : ১২–১৪ g/dl

৩. অণুচক্রিকা–১,৫০,০০০ – ৪,০০,০০০ প্রতি ঘনমিলিমিটার।

অন্যান্য জৈব পদার্থ

i. সিরাম ইউরিয়া : ১৫ – ৪০ mg/dl

ii. সিরাম ক্রিয়েটিনিন : ০.৫ – ১.৫ mg/dl

iii. কোলেস্টেরল : ০ – ২০০ mg/dl

iv. বিলিরুবিন : ০.২ – ১ mg/dl

v. রক্ত শর্করা (আহারের পূর্বে)– স্বাভাবিক সীমা: ৩.৬–৬.০ mmol/L

dl = ডেসিলিটার

রক্ত উপাদানের অস্বাভাবিক অবস্থা

মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য ঘটলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা বলা হয়। যেমন–

১. **পলিসাইথিমিয়া :** লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পায়।

২. **অ্যানিমিয়া :** লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায় অথবা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় কমে যায়।

৩. **লিউকেমিয়া :** নিউমোনিয়া, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি রোগে শ্বেত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি শ্বেত কণিকার সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে ৫০,০০০–১,০০০,০০০ হয়, তাহলে তাকে লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার বলে।

৪. **লিউকোসাইটোসিস :** শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থার মান থেকে বেড়ে যদি ২০,০০০– ৩০,০০০ হয়,

তখন তাকে লিউকোসাইটোসিস বলে। নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি ইত্যাদি রোগে এ অবস্থা হয়।

৫. **থ্রম্বোসাইটোসিস :** এ অবস্থায় অণুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়াকে থ্রম্বোসিস বলে। হৃদপিন্ডের করোনারি রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে করোনারি থ্রম্বোসিস এবং গুরু মস্তিকের রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস বলে।

৬. **পারপুরা :** ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে এ অবস্থা হতে পারে। এ অবস্থায় অণুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায়।

৭. **থ্যালাসিমিয়া :** থ্যালাসিমিয়া একধরনের বংশগত রক্তের রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়। হিমোগ্লোবিনের অস্বাভাবিকতার কারণে লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে যায়, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। এ রোগটি মানুষের অটোজোম অবস্থিত প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা ঘটে। যখন মাতা ও পিতা উভয়ের অটোজোমে এ জিনটি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তখন তাদের সন্তানদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন জিন দুটি একত্রিত হয়ে এই রোগের প্রকাশ ঘটায়। সাধারণত শিশু অবস্থায় থ্যালাসিমিয়া রোগটি শনাক্ত হয়। এ রোগের জন্য রোগীকে প্রতি ৩ মাস অন্তর রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে রক্তশূন্যতার হার কমে যায়।

মানুষের রক্তের গ্রুপ

যখন কোনো কারণে মানুষের দেহে রক্ত কমে যায় বা কোনো কারণে দেহে রক্তের প্রয়োজন পড়ে, তখন অন্যের দেহ থেকে রক্ত নিয়ে অসুস্থ মানুষের দেহে রক্ত প্রদান করতে হয়। কিন্তু এক ব্যক্তির দেহ থেকে রক্ত অন্য ব্যক্তির দেহে প্রদান করতে হলে উভয় ব্যক্তির রক্ত সমবিভাগের হতে হবে। মানবদেহের বাইরে দাতা ও গ্রহীতার রক্ত মিশ্রিত করে দেখা গিয়েছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়ের রক্ত স্বাভাবিকভাবে মিশে যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের রক্ত স্বাভাবিকভাবে না মিশে রক্তকণিকাগুলো গুচ্ছবন্ধ হয়।

রক্তের রক্তকণিকাগুলো গুচ্ছবন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে ধারণা নেওয়ার আগে আমাদেরকে রক্তের অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন সম্বন্ধে ধারণা নিতে হবে। বাইরের থেকে অযাচিত প্রোটিন প্রাণীর রক্তে প্রবেশ করানো হলে, প্রাণীটির রক্তে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয় যা বাইরের প্রোটিনের সাথে বিক্রিয়া ঘটায়। রক্ত কোষ কর্তৃক সৃষ্ট এই পদার্থকে অ্যান্টিবডি বলে। রক্তে প্রচুর অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। বহিরাগত প্রোটিন, যা রক্তে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করে, সেই প্রোটিনটিকে অ্যান্টিজেন বলে। অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি যখন একসাথে বা একই দ্রবণে আসে, তখন এক বিশেষ ধরনের বিক্রিয়া ঘটে, যাকে অ্যান্টিবডি–অ্যান্টিজেন বিক্রিয়া বলা হয়। রক্তের কোষের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি–অ্যান্টিজেন বিক্রিয়ার ফলে রক্ত কণিকাগুলো গুচ্ছবন্ধ হয়ে যায়।

১৯০০ সালে ডা. কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) ভিয়েনার একটি মেডিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় দেখতে পেয়েছিলেন, যখন কোনো ব্যক্তির রক্তকণিকা অন্য ব্যক্তির রক্তের সাথে মেশানো হচ্ছে, তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তকণিকাগুলো গুচ্ছবন্ধ হচ্ছে। তিনি এটির উপর আরও পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে উদঘাটন করেন, মানুষের রক্তকোষে দুই ধরনের অ্যান্টিজেন আছে এবং একইভাবে রক্তের সিরামে (Serum) দুই ধরনের অ্যান্টিবডি আছে।

সিরাম কি?

রক্ত জমাট বাধার পর রক্তের জমাট অংশ থেকে যে হালকা হলুদ বা খড়ের রঙের মতো এক রকম স্বচ্ছ রস নিঃসৃত হয়, তাকে সিরাম বলে। রক্তরস বা প্লাজমা এবং সিরামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– রক্তরসে রক্তকণিকা থাকে কিন্তু সিরামে কোনো রক্তকণিকা থাকে না।

বুঝার সুবিধার জন্য দুই ধরনের অ্যান্টিজেনকে A এবং B নামকরণ করা হয়। একজন মানুষ তার রক্তে এই দুটি অ্যান্টিজেনের মধ্যে যেকোনো একটি অথবা দুটিই ধারণ করে অথবা দুটির একটিও ধারণ করে না। রক্তের অ্যান্টিজেনের ভিত্তিতে পৃথিবীতে চার ধরনের মানুষ বিরাজ করছে। যে মানুষের রক্তকোষে A অ্যান্টিজেন থাকে, তাকে গ্রুপ A, যে মানুষের রক্তকোষে B অ্যান্টিজেন থাকে তাকে গ্রুপ B, যে মানুষের রক্তে A ও B উভয় অ্যান্টিজেন থাকে তাকে AB গ্রুপ এবং যার মধ্যে A ও B অ্যান্টিজেনের কোনোটিই থাকে না, তাকে গ্রুপ O বলে অ্যাখ্যায়িত করা হয়।

মানুষের রক্তকোষে যে ধরনের অ্যান্টিজেন থাকবে, ঠিক তার অনুরূপ অ্যান্টিবডি তার রক্ত সিরামে থাকবে না। এটি স্পষ্ট, যদি A অ্যান্টিজেন বহনকারী মানুষের সিরামে A অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধ অ্যান্টিবডি থাকতো তাহলে সে ব্যক্তির রক্ত গুচ্ছবন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হতো। সুতরাং একজন মানুষের রক্তের গ্রুপ A হলে তার রক্তে A অ্যান্টিজেন থাকবে। এর বিরুদ্ধে কোনো অ্যান্টিবডি থাকবে না, তার রক্তে কোনো B অ্যান্টিজেন নেই; কিন্তু B অ্যান্টিবডি থাকবে।

রক্তরসে যে অ্যান্টিবডি আছে, তাদের বলে α (আলফা বা anti-A) এবং β (বিটা বা anti-B) এভাবে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির রক্তকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয় যথা– A, B, AB ও O।

নিচে ABO রক্তগ্রুপের সম্পর্ক এবং রক্তদাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক দেখানো হলো।

রক্তের গ্রুপ	লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন	রক্তরসে অ্যান্টিবডি	যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারবে	যে গ্রুপের রক্ত গ্রহণ করতে পারবে
A	A	anti–B	A ও AB	A ও O
B	B	anti–A	B ও AB	B ও O
AB	A, B	কোনো অ্যান্টিবডি নেই	AB	A, B, AB ও O
O	কোনো অ্যান্টিজেন নেই	anti–A anti–B উভয় আছে	A, B, AB ও O	O

অ্যান্টিজেনকে অ্যাগ্লুটিনোজেন বলে এবং অ্যান্টিবডিকে অ্যাগ্লুটিনিন বলে। অ্যান্টিজেন বা অ্যাগ্লুটিনোজেন লোহিত কণিকার প্লাজমা পর্দার বাইরে থাকে। অ্যান্টিবডি বা অ্যাগ্লুটিনিন রক্তরসে থাকে। প্রায় ৪২% মানুষের রক্তের গ্রুপ 'A', ৯% মানুষের রক্তের গ্রুপ 'B', ৩% মানুষের রক্তের গ্রুপ 'AB' এবং প্রায় ৪৬% মানুষই O গ্রুপের রক্তের অধিকারী।

উপরের ছক থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির রক্তে যে অ্যান্টিজেন নেই, শুধু সেই অ্যান্টিবডি সেখানে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ A রক্ত গ্রুপে A অ্যান্টিজেন, B রক্ত গ্রুপে B অ্যান্টিজেন এবং AB রক্ত গ্রুপে A ও B উভয় অ্যান্টিজেন থাকে। এদের কোনোটিতে একই ধরনের অ্যান্টিবডি থাকে না। কিন্তু O রক্ত গ্রুপের রক্তে যেহেতু কোনো অ্যান্টিজেন নেই সেহেতু এর রক্তরসে anti-A ও anti-B উভয় অ্যান্টিবডি থাকে। A গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি B গ্রুপের লোহিত কণিকাকে গুচ্ছবন্ধ করে জমিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে B গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি A গ্রুপের রক্তকে জমিয়ে দেয়। কিন্তু AB গ্রুপের রক্ত অন্য গ্রুপের রক্তকে জমাতে পারে না। কারণ এ গ্রুপের রক্তে কোনো অ্যান্টিবডি নেই। O গ্রুপের রক্ত বহনকারী নিজের গ্রুপের রক্ত ছাড়া অন্য ৩টি গ্রুপের রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দেয়। কারণ এ গ্রুপের রক্তে দুই ধরনের অ্যান্টিবডি আছে। তাই কারও দেহে O গ্রুপের রক্ত থাকলে সে কেবল O গ্রুপের রক্ত নিতে পারবে, কিন্তু দেওয়ার সময় সব গ্রুপকে রক্ত দিতে পারবে।

উপরের তালিকা থেকে আরও বুঝা যাচ্ছে যে A রক্ত গ্রুপের দাতা A ও AB রক্ত গ্রুপের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারবে। তেমনি B রক্ত গ্রুপের দাতা B ও AB রক্ত গ্রুপের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারবে। AB রক্ত গ্রুপের ব্যক্তিকে A, B, AB ও O অর্থাৎ এই চারটি গ্রুপের যেকোনো গ্রুপের রক্ত দেওয়া যায়। এ কারণে AB গ্রুপের রক্ত বহনকারীকে সর্বজনীন গ্রহীতা বলা হয়। একইভাবে O গ্রুপের রক্ত যে কেউ নিতে পারে; তার জন্য কোনো রক্ত পরীক্ষার দরকার হয় না। এজন্য O গ্রুপের রক্ত বহনকারীকে সর্বজনীন দাতা বলা হয়।

Rh ফ্যাক্টর : Rh ফ্যাক্টর রেসাস (Rhesus) নামক বানরের লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থিত একধরনের অ্যাগ্লুটিনোজেন। রেসাস বানরের নাম অনুসারে এই অ্যান্টিজেনকে রেসাস ফ্যাক্টর সংক্ষেপে Rh ফ্যাক্টর বলে। যেসব মানুষের রক্তে Rh ফ্যাক্টর উপস্থিত, তাদের Rh^+ (Rh পজিটিভ) এবং যাদের রক্তে Rh ফ্যাক্টর অনুপস্থিত, তাদের Rh^-(Rh নেগেটিভ) বলে।

Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব : Rh^- রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির রক্তে Rh^+ বিশিষ্ট রক্ত দিলে প্রথমবার গ্রহীতার দেহে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, কিন্তু গ্রহীতার রক্তরসে ক্রমশ Rh^+ অ্যান্টিজেনের বিপরীত অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হবে। এই অ্যান্টিবডিকে অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর বলে। গ্রহীতা যদি দ্বিতীয়বার Rh^+ রক্ত গ্রহণ করে, তা হলে গ্রহীতার রক্তরসের অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টরের প্রভাবে দাতার লোহিত রক্তকণিকা জমাট বেঁধে পিণ্ডে পরিণত হবে। তবে একবার সঞ্চারণের পর যদি গ্রহীতা আর ঐ রক্ত গ্রহণ না করে, তা হলে ধীরে ধীরে তার রক্তে উৎপন্ন সমস্ত অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রহীতা স্বাভাবিক রক্ত ফিরে পায়।

সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ক্ষেত্রে Rh ফ্যাক্টর খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন Rh^- (Rh নেগেটিভ) মহিলার সঙ্গে Rh^+ (Rh পজিটিভ) পুরুষের বিয়ে হলে তাদের প্রথম সন্তান হবে Rh^+, কারণ Rh^+ একটি প্রকট বৈশিষ্ট্য। ভ্রূণ অবস্থায় সন্তানের Rh^+ ফ্যাক্টরযুক্ত লোহিত কণিকা অমরার মাধ্যমে রক্তে এসে পৌঁছাবে ফলে মায়ের রক্ত Rh^- হওয়ায় তার রক্তরসে অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর (অ্যান্টিবডি) উৎপন্ন হবে।

অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর মায়ের রক্ত থেকে অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করে ভ্রূণের লোহিত কণিকাকে ধ্বংস করে। ফলে ভ্রূণও বিনষ্ট হয় এবং গর্ভপাত ঘটে। এ অবস্থায় শিশু জীবিত থাকলেও তার দেহে প্রচণ্ড রক্তস্বল্পতা এবং জন্মের পর জন্ডিস রোগ দেখা দেয়।

যেহেতু Rh বিরোধী অ্যান্টিবডি মাতৃদেহে খুব ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়, তাই প্রথম সন্তানের কোনো ক্ষতি হয় না এবং সুস্থ জন্মায়। কিন্তু পরবর্তী গর্ভধারণ থেকে জটিলতা শুরু হয় এবং ভ্রূণ এতে মারা যায়। তাই বিয়ের আগে হবু বর–কনের রক্ত পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত এবং একই Rh ফ্যাক্টরযুক্ত (হয় Rh^+ নয়তো, Rh^-) দম্পতি হওয়া উচিত।

রক্তের শ্রেণিবিভাগের গুরুত্ব

১. রক্ত সঞ্চারণে কোনো দাতার রক্ত গ্রহীতার দেহে সঞ্চারণের পূর্বে উভয়ের রক্তের গ্রুপ জানার জন্য পরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি। কারণ ভিন্ন গ্রুপের রক্ত গ্রহীতার রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে প্রাণহানির কারণ হতে পারে। আপদকালীন সময়ে রক্ত সঞ্চারণের সময় দাতা ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ যদি জানা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে O এবং Rh নেগেটিভ রক্ত সঞ্চারণ করাই শ্রেয়।

২. কোনো শিশুর পিতৃত্ব নির্ণয়ে জটিলতা দেখা দিলে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে সমাধান করা যায়।

৩. রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অপরাধীদের শনাক্তকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

রক্ত নীতি

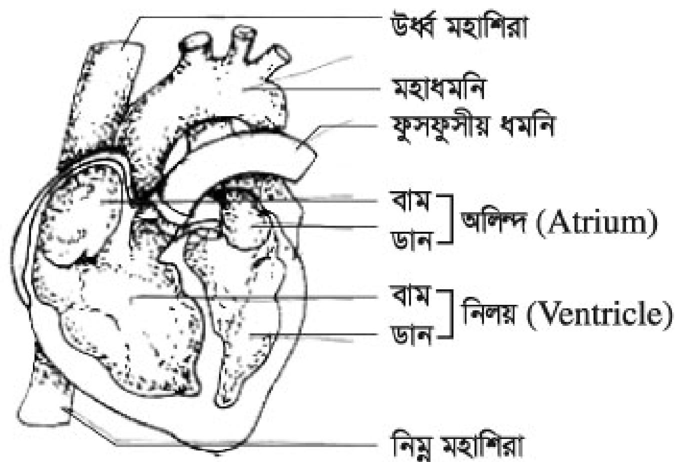
মানবদেহে অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত রক্তের ঘাটতি দেখা দিলে অন্য মানব দেহ হতে রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে অব্যশ্যই জীবাণু মুক্ত ও সঠিক রক্ত নিশ্চিত করে নিতে হয়। রক্ত সঞ্চালনের পূর্বে রক্তে এইডস, জন্ডিস ইত্যাদি জটিল রোগের জীবাণু আছে কি না তা পরীক্ষা করে নিতে হয়। ডাক্তার অবশ্যই রোগী ও দাতার রক্তের **ABO** ও **Rh** ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করে গ্রুপ ম্যাচ করার মাধ্যমে এক দেহ হতে অন্যদেহে রক্ত সাঞ্চলনের উদ্যোগ নেন। সঠিকভাবে গ্রুপ ম্যাচ না করে রক্ত সঞ্চালন করা হলে মানবদেহে নানা বিপর্যয় ঘটতে পারে।

রক্ত সঞ্চালন

এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা জেনেছি রক্তসংবহনতন্ত্রের দ্বারা মেরুদন্ডী প্রাণীদের দেহে রক্ত সঞ্চালন হয়। মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অংশগুলো হলো–হৃৎপিন্ড, ধমনি, শিরা এবং কৈশিক–জালিকা। এগুলোর কাজ সম্বন্ধে জানার পূর্বে এগুলোর গঠন সম্বন্ধে ধারণা না পেলে বিষয়টি সম্বন্ধে জানা অসমাপ্ত থেকে যাবে, তাই এগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

হৃৎপিন্ড (Heart) : হৃৎপিন্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের অন্তর্গত একরকমের পাম্পযন্ত্রবিশেষ। হৃৎপিন্ড অনবরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়।

মানুষের হৃৎপিন্ডটি বক্ষগহ্বরে ফুসফুস দুটির মাঝখানে এবং মধ্যচ্ছদার ওপরে অবস্থিত। হৃৎপিন্ডের প্রশস্ত প্রান্তটি ওপরের দিকে এবং ছুঁচালো প্রান্তটি নিচের দিকে বিন্যস্ত থাকে।



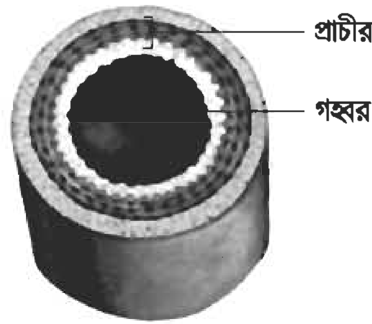
চিত্র : ৩.৬ হৃৎপিন্ড

হৃৎপিণ্ডটি দ্বিস্তরী পেরিকার্ডিয়াম পর্দা বেষ্টিত থাকে। উভয় স্তরের মাঝে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড থাকে, যা হৃৎপিণ্ডকে সংকোচনে সাহায্য করে। মানুষের হৃৎপিণ্ডটি চারটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। ওপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে যথাক্রমে ডান ও বাম অলিন্দ এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে যথাক্রমে ডান ও বাম নিলয় বলে। অলিন্দ দুটি আন্তঃঅলিন্দ পর্দা দিয়ে এবং নিলয় দুটি আন্তঃনিলয় পর্দা দিয়ে পৃথক থাকে। অলিন্দের প্রাচীর পাতলা।

নিলয়ের প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। ডান অলিন্দের সঙ্গে একটি উর্ধ্ব মহাশিরা এবং একটি নিম্ন মহাশিরা যুক্ত থাকে। বাম নিলয়ের সঙ্গে চারটি পালমোনারি শিরা যুক্ত থাকে। ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনি এবং বাম নিলয় থেকে মহাধমনি উৎপত্তি হয়েছে।

ধমনি

যেসব রক্তনালির মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়, তাকে ধমনি বা আর্টারি বলে। ধমনির প্রাচীর পুরু এবং তিনটি স্তরে গঠিত। এদের গহ্বর ছোট। ধমনিতে কোনো কপাটিকা থাকে না। ফলে ধমনি দিয়ে রক্ত বেগে প্রবাহিত হয়।



চিত্র : ৩.৭ ধমনির প্রস্থচ্ছেদ

ধমনির স্পন্দন আছে। ধমনি দেহের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা–প্রশাখায় বিভক্ত হয়; এদের শাখা ধমনি বা অ্যার্টেরিওল বলে। এগুলো ক্রমশ শাখা–প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৈশিক জালিকায় শেষ হয়। এভাবে ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে শুরু হয়ে কৈশিক জালিকায় শেষ হয়। ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পরিবাহিত হয়। তবে ফুসফুসীয় ধমনি কার্বন ডাই–অক্সাইড যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে নিয়ে আসে।

শিরা

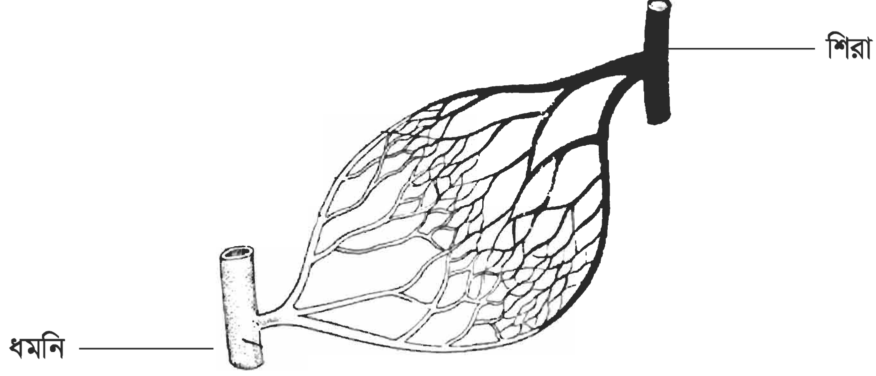
যেসব রক্তনালির মাধ্যমে সাধারণত কার্বন ডাই–অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃদপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে, তাদের শিরা বলে। তবে পালমোনারি নামে শিরাটি ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ডে নিয়ে আসে। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো ৩টি স্তরে গঠিত হলেও প্রাচীর বেশ পাতলা ও গহ্বর বড়। শিরায় কপাটিকা থাকায় শিরা দিয়ে রক্ত ধীরে ধীরে একমুখে প্রবাহিত হয়।



চিত্র : ৩.৮ শিরার প্রস্থচ্ছেদ

ধমনি প্রান্তের কৌশিক জালিকাগুলো ক্রমশ একত্রিত হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম শিরা বা উপশিরা গঠন করে। উপশিরাগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে পরে শিরা গঠন করে। কতগুলো শিরা মিলে মহাশিরা গঠন করে। এভাবে শিরা কৈশিক জালিকা থেকে শুরু হয় এবং হৃৎপিণ্ডে শেষ হয়।

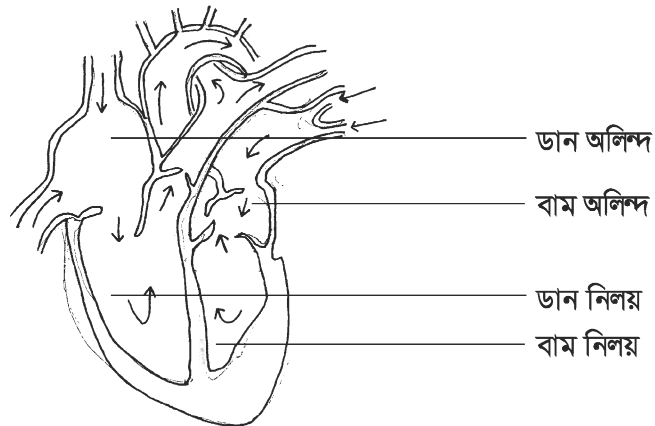
কৈশিক জালিকা : ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে অবস্থিত কেবল এক স্তরবিশিষ্ট এন্ডোথেলিয়াম দিয়ে গঠিত যে সব সূক্ষ্ম রক্তনালি জালকের আকারে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে কৈশিক জালিকা বলে। কৈশিক জালিকার রক্ত ও কলারসের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা পুষ্টিদ্রব্য, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, রেচন পদার্থ ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে।



চিত্র : ৩.৯ কৈশিক জালিকা

হৃৎপিণ্ডের কাজ : আমরা পূর্বে জেনেছি, মানুষের রক্তসংবহনতন্ত্র হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা নিয়ে গঠিত। মানুষের হৃৎপিণ্ড অবিরাম সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে ধমনি ও শিরার মাধ্যমে রক্ত সংবহন করে। হৃৎপিণ্ডের স্বতঃস্ফূর্ত সংকোচনকে সিস্টোল (systole) এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণকে ডায়াস্টোল (diastole) বলে। উল্লেখ্য, অলিন্দে যখন সিস্টোল হয়, নিলয় তখন ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে। মানুষের হৃৎপিণ্ডের রক্ত সংবহন নিম্নরূপে ঘটে–

১. অলিন্দদ্বয় যখন ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে তখন সারাদেহের CO_2 যুক্ত রক্ত উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা দিয়ে ডান অলিন্দে আসে এবং ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে আসে।



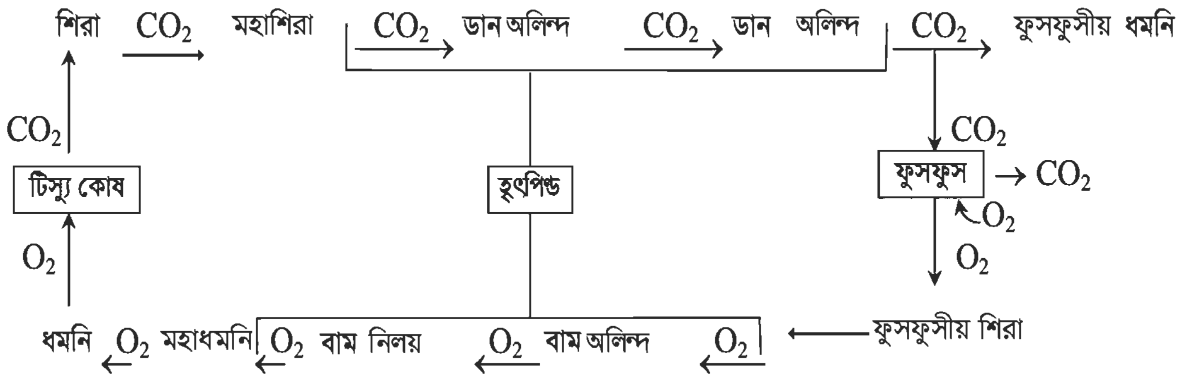
চিত্র : ৩.১০ হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ।

২.অলিন্দ দুটি রক্তপূর্ণ হলে সেগুলো সংকোচিত হয়, অর্থাৎ অলিন্দের সিস্টোল হয়। ফলে ডান অলিন্দ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয় এবং বাম অলিন্দ থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে আসে। এই সময় নিলয়দ্বয় ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে।

৩. নিলয়দ্বয় রক্তপূর্ণ হলে সেগুলো সংকুচিত হয়, অর্থাৎ নিলয়ে সিস্টোল হয়।

এভাবে হৃৎপিন্ডের পর্যায়ক্রমে সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের মাধ্যমে মানুষের দেহে রক্ত সংবহন হয়।

এ সময় বাম নিলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত (O_2 যুক্ত রক্ত) মহাধমনি এবং ডান নিলয় থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনিতে প্রবেশ করে। মহাধমনি থেকে রক্ত বিভিন্ন ধমনি ও শাখা ধমনি দিয়ে দেহস্থ বিভিন্ন জালকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কলাকোষকে পুষ্টিদ্রব্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। অপরপক্ষে ফুসফুসীয় ধমনি থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় জালকে প্রবেশ করে। ফুসফুস থেকে রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে আসে। অপরপক্ষে সারা দেহস্থ রক্ত জালক থেকে কার্বন ডাই–অক্সাইড যুক্ত রক্ত (দূষিত রক্ত) উপশিরা, শিরা ও মহাশিরা দিয়ে পুনরায় অলিন্দে ফিরে আসে। হৃৎপিন্ড পাম্প যন্ত্রের মতো নির্দিষ্ট তালে ও ছন্দে সংকুচিত হয়ে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়।



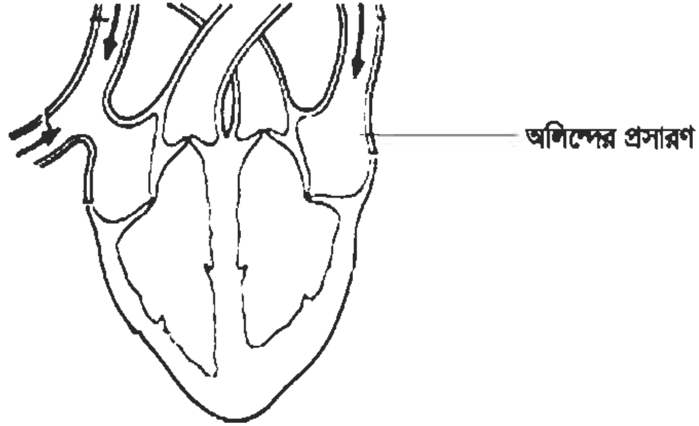
মানবদেহের রক্ত সংবহনের রেখাচিত্র

হার্ট–বিট

হৃৎপিন্ড একটি পাম্প যন্ত্রের মতো। এটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পের মতো দেহের ভিতরে সর্বক্ষণ ছন্দের হারে স্পন্দিত হয়। হৃৎপিন্ডের এই স্পন্দনকে হৃদস্পন্দন বা হার্ট–বিট বলে। এই হৃদস্পন্দনের মাধ্যমে হৃদপিন্ড আমাদের শরীরে রক্ত প্রবাহিত করে।

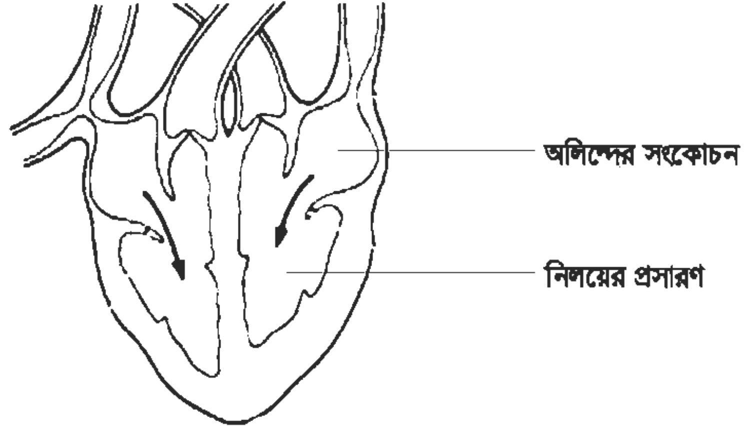
হার্ট–বিট বা হৃদস্পন্দন একটি জটিল বিষয়। মানুষের হৃৎপিন্ড মায়োজেনিক (myogenic) অর্থাৎ বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়া হৃদপেশি নিজে থেকে সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা হৃদস্পন্দন সৃষ্টি করে। একটি হৃদস্পন্দন হৃৎপিন্ডে পর পর সংঘটিত ঘটনার সমষ্টিকে কার্ডিয়াক চক্র বলে। হৃৎপিন্ডের অলিন্দ ও নিলয়ে বারবার সংকোচন এবং প্রসারণের সাথে সম্পর্কিত। হৃৎপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভেতর গতিশীল থাকে। কার্ডিয়াক চক্র চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়–

১. **অলিন্দের ডায়াস্টোল :** এ সময় অলিন্দ দুটি প্রসারিত অবস্থায় থাকে। ফলে দেহের রক্ত ডান ও বাম অলিন্দে প্রবেশ করে।



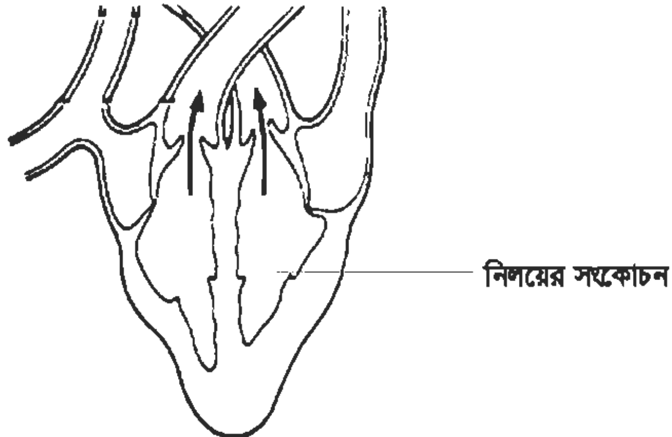
চিত্র : ৩.১১ কার্ডিয়াক চক্র– ক

২. **অলিন্দের সিস্টোল :** অলিন্দ দুটি রক্তপূর্ণ হলে অলিন্দ দুটি সংকুচিত হয়। ফলে রক্ত নিলয়ে প্রেরিত হয়।



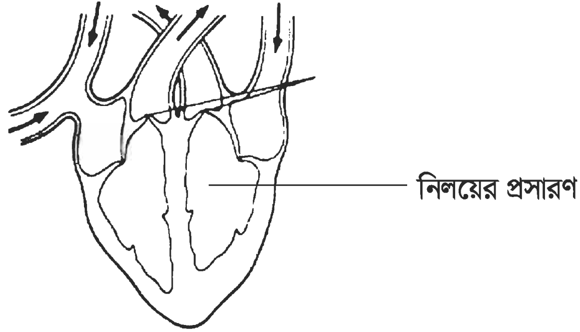
চিত্র : ৩.১২ কার্ডিয়াক চক্র– খ

৩. **নিলয়ের সিস্টোল :** নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত হয়। এ সময় ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ এবং সেমিলুনার কপাটিকা খোলা থাকে। নিলয়ের সিস্টোলের সময় কপাটিকাগুলো বন্ধের সময় হৃদস্পন্দনে প্রথম যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে 'লাব' বলে।



চিত্র : ৩.১৩ কার্ডিয়াক চক্র– গ

৪. **নিলয়ের ডায়াস্টোল :** নিলয়ে সিস্টোলের পর পরই নিলয়ের ডায়াস্টোল শুরু হয়। ডায়াস্টোল ও সিস্টোলের সময় এখানকার কপাটিকা বন্ধের সময় যে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে 'ডাব' বলে।



চিত্র : ৩.১৪ কার্ডিয়াক চক্র– ঘ

সুতরাং হৃদপিন্ডের শব্দগুলো হলো–

নিলয়ের সিস্টোল = লাব

নিলয়ের ডায়াস্টোল = ডাব

একটি সিস্টোল ও একটি ডায়াস্টোলের সমন্বয়ে একটি হৃদস্পন্দন সম্পন্ন হয় এবং সময় লাগে প্রায় ০.৮ সেকেন্ড। একজন সুস্থ মানুষের হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০–১০০ বার হয়। এটাকে হার্ট–বিট বলা হয়। আমাদের হাতের কবজির রেডিয়াল ধমনিতে এই স্পন্দন গোনা যায় আবার বুকের বাম দিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্টেথোস্কোপের ডায়াফ্রাম বসিয়ে এবং স্টেথোস্কোপের নলের শেষ প্রান্ত দুটি কানে লাগিয়েও এ শব্দ অনুভব করা যায়। হাতের কবজিতে হৃদস্পন্দন অনুভব করাকে পালস বলে। স্টেথোস্কোপের সাহায্যে হৃদস্পন্দনের যে শব্দ শোনা যায়, তাকে হার্টসাউন্ড বলে। হৃদস্পন্দন বা হার্ট–বিটকে যখন প্রতি মিনিটে হাতের কবজিতে গণনা করা হয়, তখন তাকে পালস রেট বলা হয়।

হার্ট–বিট বা পালসরেট গণনার পদ্ধতি

রোগীর হাতের কবজিতে হাতের তিন আঙুল যেমন অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনি দিয়ে চাপ দিলে হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে কত বার হয় তা অনুভব করা যায়। হাতের তিন আঙুল এমনভাবে রাখতে হবে যাতে তর্জনি থাকে হৃৎপিন্ডের দিকে, মধ্যমা মাঝখানে এবং অনামিকা হাতের আঙুলের দিকে। এবার এক মিনিটে মধ্যমা আঙুল দিয়ে বুঝা যাবে হাতের রেডিয়াল ধমনি কত বার ধুকধুক করছে। এটাই পালস রেট বা পালসের গতি। পালসকে আমরা সাধারণভাবে নাড়ি বলে থাকি।

বিশ্রামে থাকা অবস্থায় পালস বা হার্ট–বিটের স্বাভাবিক গতি–

প্রাপ্তবয়স্ক : প্রতি মিনিটে ৬০–১০০ বার

শিশুদের : প্রতি মিনিটে ১০০–১৪০ বার।



চিত্র : ৩.১৫ নাড়ি দেখা

কবজিতে পালস না পাওয়া গেলে কণ্ঠনালির পাশে হৃদস্পন্দন দেখা যেতে পারে অথবা সরাসরি বুকে কান পেতে হার্ট সাউন্ড শোনার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেকোনো সাধারণ মানুষের পালসের গতি প্রতি মিনিটে কতবার হচ্ছে তা দেখা যায় উপরের বর্ণনা অনুসারে ব্যবস্থা নিলে। ঘড়ি ধরে পালসের গতি দেখতে হয়। সাধারণত পালসের গতি দ্রুত হয়– পরিশ্রম করলে, ঘাবড়ে গেলে, ভয় পেলে, তীব্র যন্ত্রণা হলে, জ্বর হলে। পালসের স্বাভাবিক গতি হলো প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০ বার। এ গতি প্রতি মিনিটে ১০০–এর অধিক হয় জ্বর ও শক্ (অচেতনতা) অথবা থাইরয়েড গ্রন্থির অতি কার্যকারিতার কারণে। ১° ফারেনহাইট তাপ বৃদ্ধির জন্য পালসের গতি প্রতি মিনিটে ১০ বার বাড়ে। পালসের গতি খুব দ্রুত, খুব মন্থর বা অনিয়ন্ত্রিত হলে বুঝতে হবে যে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা আছে। প্রতি মিনিটে পালসের গতি ৬০–এর কম হতে পারে হার্ট ব্লকের বা জন্ডিসের কারণে।

স্বাভাবিকভাবে মানসিক উত্তেজনা, ব্যায়াম, সন্ধ্যার দিকে নবজাতকের পালসের গতি বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পালসের গতি অধিক হলেও তা স্বাভাবিক ভাবতে হবে। ঘুমানো অবস্থায় এবং রাতে সুনিদ্রার পর সকালে পালসের গতি ৬০ এর কম হতে পারে। এ অবস্থাটিকেও স্বাভাবিক ধরতে হবে।

রক্ত চাপ

হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃৎপিণ্ডে থেকে রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহকালে ধমনি প্রাচীরে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তচাপ বলে। তাই রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনির রক্তচাপকেই বুঝায়। রক্তচাপ হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা, ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা এবং রক্তের ঘনত্ব ও পরিমাণের সঙ্গে সম্পর্কিত। সিস্টোল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে, তাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ এবং ডায়াস্টোল অবস্থায় যে চাপ থাকে, তাকে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বলে। স্বাভাবিক এবং সুস্থ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সিস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ১১০–১৪০ মিলিমিটার (mm Hg) এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ৬০–৯০ মিলিমিটার (mm Hg)। স্বাভাবিক রক্তচাপকে ১২০/৮০ (mm Hg) এভাবে প্রকাশ করা হয়। স্ফিগমোম্যানোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়।

উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপকে ডাক্তারি ভাষায় হাইপারটেনশন বলে। শরীর ও মনের স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তচাপ যদি বয়সের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপরে অবস্থান করতে থাকে, তবে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। রক্তের চাপ যদি কম থাকে তা হলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ বলে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনি গাত্রে কোনো ব্যক্তির সিস্টোলিক রক্তচাপ যদি সব সময় ১৬০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ বা তার বেশি এবং ডায়াস্টোলিক সব সময় ৯৫ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ বা তার বেশি থাকে, তবে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে বলা যায়। উত্তেজনা, চিন্তা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা বা অন্য কোনো কারণে যদি রক্তচাপ সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে, তবে তাকে হাইপারটেনশন বলা যাবে না এবং এ অবস্থায় কোনো ওষুধেরও প্রয়োজন হয় না।

হাইপারটেনশন হওয়ার প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি। তবে অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, মেদবহুল শরীর, অতিরিক্ত লবণ খাওয়া, অপর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম, ডায়াবেটিস, অস্থিরচিত্ত ও মানসিক চাপগ্রস্ত, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য ব্যক্তিদের মধ্যে এ রোগের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। হাইপারটেনশন রোগীদের যেসব জটিলতা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে– স্ট্রোক, প্যারালাইসিস, হৃদপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক ও ফেইলিউর, বৃক্কের কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত প্রভৃতি। নিম্ন রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপের মতো মারাত্মক নয়। তবে রক্তচাপ যথেষ্ট কমে গেলে নানা রকম অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

রক্তচাপ প্রতিরোধ করার জন্য কিংবা প্রতিকার হিসেবে নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক উপায়গুলো পালনের মাধ্যমে উপকার পাওয়া যায় :

১. ডায়াবেটিস যদি থাকে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা।
২. দেহের ওজন বৃদ্ধি না করা।
৩. চর্বিযুক্ত খাদ্য বর্জন করা। যেমন– ঘি, মাখন, গরু ও খাসির মাংস, চিংড়ি যতটা সম্ভব বর্জন করা।
৪. সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।
৫. পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
৬. মদ্যপান এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকা।
৭. নিয়মিত ব্যায়াম করা।
৮. ৭–৮ ঘণ্টা ঘুমানো।
৯. মানসিক চাপমুক্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা।
১০. খাবারের সাথে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
১১. চিকিৎসকের পরামর্শ মতো জীবন পরিচালনা করা।

হার্ট ব্লক : হৃদপিণ্ডের স্পন্দন প্রবাহ উৎপাদন ত্রুটিপূর্ণ হলে বা উৎপন্ন প্রবাহ সঠিক পথে পরিবাহিত না হলে তাকে হৃদ অবরোধ বা হার্ট ব্লক বলে।

হার্ট অ্যাটাক : হৃদপিণ্ডের করোনারি ধমনি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে হৃদপেশির রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে।

হার্ট ফেলিওর : হৃদপিণ্ডের অ্যাট্রিয়াম অথবা ভেন্ট্রিকল অথবা উভয়ের সংকোচন ক্ষমতা লোপ পাওয়াকে হার্ট ফেলিওর বলে।

ECG : হৃদপিণ্ডে যখন স্পন্দন চলে তখন হৃদপিণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের পেশি থেকে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা যন্ত্রের মাধ্যমে গ্রাফ কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই লেখচিত্রই হল ECG (Electro cardiograph)। যে যন্ত্রের সাহায্যে হৃদপেশির ক্রিয়াপদ্ধতি রেকর্ড করা হয় তাকে Electro cardiogram বলে।

কোলেস্টেরল

কোলেস্টেরল এক বিশেষ ধরনের জটিল স্নেহ পদার্থ বা লিপিড এবং স্টেরয়েড এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মানুষের প্রায় প্রত্যেক কোষ ও টিস্যুতে কোলেস্টেরল থাকে। যকৃৎ ও মগজে এর পরিমাণ বেশি। কোলেস্টেরল অন্যান্য স্নেহ পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়ে রক্তে স্নেহের বাহক হিসেবে কাজ করে। স্নেহ ও প্রোটিনের যৌগকে লাইপোপ্রোটিন বলে। স্নেহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে লাইপোপ্রোটিন দু রকম– উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট লাইপ্রোপ্রোটিন (High Density Lipoprotein–HDL) এবং নিম্ন ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপ্রোপ্রোটিন (Low Density Lipoprotein– LDL)। রক্তের LDL এর পরিমাণের বৃদ্ধির সাথে কোলেস্টেরলের আধিক্যের সম্পর্ক আছে। রক্তে LDL এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। রক্তে HDL এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য উপকারী। রক্তে কোলেস্টেরল এর স্বাভাবিক পরিমাণ ১০০– ২০০ mg/dl। রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য হৃদ রোগের আশঙ্কা বাড়ায়। স্বাভাবিক মাত্রা থেকে রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে রক্তনালীর অন্তঃপ্রাচীরের গাত্রে কোলেস্টেরল ও ক্যালসিয়াম জমা হয়ে রক্ত নালী গহবর সংকুচিত হয়। ফলে ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়– এ অবস্থাকে ধমনির কাঠিন্য বা arteriosclerosis বলে। আর্টারিওস্কেলরোসিস এর কারণে ধমনির প্রাচীরে ফাটল দেখা দিতে পারে। ধমনিগাত্রের ফাটল দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়ে

জমাট বেঁধে রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। হৃদপিন্ডের করোনারি রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে করোনারি থ্রম্বোসিস বলে এবং মস্তিষ্কের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস বলে। এতে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে। রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে LDL এর পরিমাণ বেড়ে যায় আর HDL এর পরিমাণ কমে যায়। LDL ‹150 mg/dl হলে তাকে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখার উপায়

আমরা প্রথম অধ্যায় থেকে জেনেছি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন সুষম খাদ্য এবং শরীরকে সচল রাখার জন্য ব্যায়াম ও বিশ্রাম প্রয়োজন। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা যেমন আবশ্যক তেমনি খাদ্য গ্রহণ এবং জীবন প্রণালী সম্বন্ধে কতগুলি সুঅভ্যাস গড়ে তোলাও একান্ত আবশ্যক। অনেক কারণে দেহে রোগ হতে পারে। তবে সঠিক খাদ্য ব্যবস্থা এবং জীবন প্রণালি অনুসরণ করে হৃদযন্ত্রকে ঠিক রাখা যায়। সেগুলো হচ্ছে–

১. দেহের উচ্চতা ও বয়স অনুসারে কাঙ্ক্ষিত ওজন বজায় রাখা আবশ্যক। দেহের ওজন বৃদ্ধি পেলে হৃদপিন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. প্রাণিজ্জ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন মিশ্রিত খাবার খাওয়া উচিত।

৩. শর্করা, মিষ্টি ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শাক–সবজি ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। উদ্ভিজ্জ তেল গ্রহণ করা উচিত। সামুদ্রিক মাছের তেল রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায় এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা হ্রাস করে। মাছ ভোজীদের হৃদরোগের প্রকোপ এ জন্য বেশ কম থাকে।

৪. ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা সুষম খাদ্যে যা আছে তা অপরিবর্তিত রাখা উচিত। তবে খাওয়ার লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। রসুন, তেঁতুল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল ও অন্যান্য ফল নিয়মিত খেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে।

এগুলি ছাড়া সঠিক ও পরিমিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ এবং অতিভোজন হতে বিরত থাকতে হবে। অত্যধিক মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি এড়ানো, নিয়মিত হালকা ব্যায়াম অথবা হাঁটা এবং সুষ্ঠ জীবনযাপন অর্থাৎ সময় মতো ঘুমানো, ধূমপান ও মদ পান থেকে বিরত থাকলে হৃদরোগ ও উচ্চরক্ত চাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ বা মধুমেহ রোগ

ডায়াবেটিস এক প্রকার বিপাকজনিত রোগ। মানবদেহের রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ৮০–১২০ মি.গ্রা/ডেসি.লি। রক্তে যদি এ মাত্রা বেড়ে যায় তাহলে তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বা মধুমেহ বলে। এ রোগে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ীভাবে বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ মধুমেহ বা ডায়াবেটিস হৃদযন্ত্রের রক্তবাহ রোগের ওপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ডায়াবেটিসে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকায় এটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের, যেমন হৃদপিন্ড, বৃক্ক, চোখ ইত্যাদির স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে। দেখা গেছে ডায়োবেটিস রোগীদের কারোনারি হৃদরোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। এতে হৃদপিন্ডকে অচল করে দেয় এবং রোগী স্ট্রোক হয়ে মারা যায়। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস রোগে রক্ত চাপ বেড়ে যায় এবং এর থেকে উচ্চ রক্ত চাপ বা হাইপারটেনশন হয়। উচ্চ রক্ত চাপ করোনারি হৃদরোগের পূর্বলক্ষণ। ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত থাকলে করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

কোন ব্যক্তির ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

যে কেউ যে কোনো সময়ে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে। চার শ্রেণির লোকের ডায়াবেটিস বেশি হয়ে থাকে–

১. যাদের বংশে, যেমন–মা–বাবা রক্ত সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে।

২. যাদের ওজন বেশি এবং শরীর মেদবহুল।

৩. যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করে না।

৪. দীর্ঘদিন যারা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করে।

ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ

১. ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, বিশেষ করে রাতে ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া।

২. খুব বেশি পিপাসা লাগা।

৩. বেশি ক্ষুধা লাগা পাওয়া এবং অতিমাত্রায় শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করা।

৪. যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া এবং শীর্ণতা।

৫. সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ করা।

৬. চামড়া শুকিয়ে যাওয়া।

৭. চোখে ঝাপসা দেখা।

৮. শরীরের কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হলে, দেরিতে শুকানো।

ডায়াবেটিস রোগীর পথ্য

ডায়াবেটিস রোগকে দমিয়ে রাখতে খাদ্যের ভূমিকা অসামান্য। ডায়াবেটিস রোগের জন্য ওষুধ সেবন করলেও রোগীকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নিয়ন্ত্রিত খাদ্য ব্যবস্থা না থাকলে ওষুধ সেবন করেও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। রোগীকে এমন খাদ্যদ্রব্য নিতে হবে যা তার ন্যূনতম ক্যালরির চাহিদা পূরণ করে এবং খাদ্যের দ্বারা রক্তে ও প্রস্রাবে যাতে শর্করা বেড়ে না যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

ডায়াবেটিস প্রধানত তিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যথা, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ওষুধ সেবন ও জীবন শৃঙ্খলা।

ক. **খাদ্য নিয়ন্ত্রণ :** মোটা লোকদের ডায়াবেটিস হলে তাদের ওজন স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। ডায়াবেটিস রোগীদের একটুও চিনি বা মিষ্টি খাওয়া চলবে না। তাদের এমন খাবার খাওয়া উচিত যা প্রোটিনসমৃদ্ধ (গাঢ় সবুজ রঙের শাক–সবজি, বরবটি, মাশরুম, বাদাম, ডিম, মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস ইত্যাদি) আর যাতে শ্বেতসার কম থাকে।

খ. **ওষুধ সেবন :** সব ডায়াবেটিস রোগীকেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক রোগীদের এ দু'টি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করলে রোগ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। কিন্তু ইনসুলিন নির্ভর রোগীদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশনের দরকার হয়।

গ. **জীবন শৃঙ্খলা :** শৃঙ্খলা ডায়াবেটিস রোগীর জীবন কাঠি। তাকে বিশেষ নজর দিতে হবে এসব বিষয়ে–

১. নিয়মিত ও পরিমাণমতো সুষম খাবার খেতে হবে।

২. নিয়মিত ও পরিমাণমতো ব্যায়াম করতে হবে।

৩. নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা এবং ফলাফল লিখে রাখতে হবে।

৪. মিষ্টি খাওয়া সম্পূর্ণ ছাড়তে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জমাট বাঁধানো কোনটির কাজ?

ক. লোহিত কণিকা খ. অণুচক্রিকা
গ. শ্বেত কণিকা ঘ. লসিকা কোষ

২. অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে–

ক. ধমনি ও পালমোনারি ধমনি খ. শিরা ও পালমোনারি শিরা
গ. ধমনি ও পালমোনারি শিরা ঘ. শিরা ও ধমনি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অভিষেক ঢাকা হতে মানিকগঞ্জ যাবার পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। এতে তার বন্ধুর মারাত্মক রক্তক্ষরণ হয়। ফলে রক্তের প্রয়োজন। বন্ধুর রক্ত পরীক্ষা ছাড়াই অভিষেক বলল আমি রক্ত দিতে পারব।

৩. অভিষেকের রক্তের গ্রুপ কী ছিল?

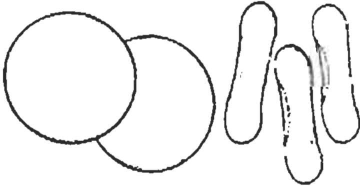
ক. A খ. B
গ. AB ঘ. O

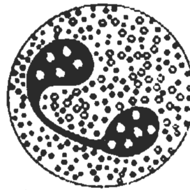
৪. রক্তরসে কোন গ্যাসীয় পদার্থ নেই?

ক. O_2 খ. CO_2
গ. Cl_2 ঘ. N_2

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের চিত্র তিনটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :


চিত্র- A


চিত্র- B


চিত্র- C

ক. রক্ত কাকে বলে?

খ. কৈশিকা জালিকা বলতে কী বুঝায়?

গ. মানবদেহে চিত্রের B চিহ্নিত কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রের A ও C একই যোজক কলায় অবস্থিত হলেও এদের কাজ ভিন্ন–বিশ্লেষণ কর।

২. রাফিন ১০ম শ্রেণির ছাত্র। তার আব্বা সুঠাম দেহের অধিকারী। রাফিন লক্ষ করছে তার আব্বার দেহে ক্ষত সৃষ্টি হলে শুকাতে দেরি হচ্ছে, চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে, সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ছে। এসব কারণে রাফিনের আব্বা ডাক্তারের শরনাপন্ন হন। ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে সুস্থ্য থাকার জন্য কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার উপদেশ দিলেন।

ক. রক্তচাপ কাকে বলে?

খ. সিস্টোলিক রক্তচাপ বলতে কী বোঝায়?

গ. রাফিনের আব্বা কী রোগে আক্রান্ত হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ডাক্তার সাহেব রাফিনের আব্বাকে সুস্থ্য থাকার জন্য কী উপদেশ দেন? ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

নবজীবনের সূচনা

ধারণা করা হয়, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন শত কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর জলবায়ু তখন স্থির ছিল না। তারপর কয়েক কোটি বছর পরে আজ পৃথিবী শান্ত, তার জলবায়ুও মোটামুটি স্থিতিশীল। পৃথিবীতে এখন বহু প্রজাতির জীবের বসবাস। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময়কালে প্রথম আবির্ভূত অনুন্নত জীবক্রম পরিবর্তন দ্বারা বিভিন্ন জীবপ্রজাতি সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর উৎপত্তির ঘটনাপ্রবাহকে বলে রাসায়নিক অভিব্যক্তি। আর জৈব অভিব্যক্তি বলতে বোঝায় সময়ের সঙ্গে কোনো জীবের সমগ্র পপুলেশনে পরিবর্তন, যা সৃষ্টি করে নতুন কোনো জীবপ্রজাতি।

মানুষ স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের জীবন শুরু হয় মাতৃগর্ভে একটি কোষ থেকে। মানুষের জীবনকালে প্রথমে সে থাকে শিশু। পরবর্তীতে শিশু থেকে ধাপে ধাপে বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়। জীবনকালের এই পরিবর্তনের একটি ধাপ বয়ঃসন্ধিকাল। বয়ঃসন্ধিকালে মানবদেহে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। আমরা এ অধ্যায়ে পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছে এবং মানুষের বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো কীভাবে ঘটে তা আলোচনা করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বয়ঃসন্ধিকাল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তনে নিজেকে খাপখাওয়ানোর উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালীন বিবাহে স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- টেস্ট টিউব বেবির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লিঙ্গ নির্ধারণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবনের উৎপত্তি এবং জীবজগতে বির্বতনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবীতে নতুন প্রজাতির উৎপত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

বয়ঃসন্ধিকাল

কোনো বাড়িতে একটি শিশু জন্ম নিলে সেখানে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। সকলেই শিশুটিকে আদর করতে চায়, কোলে নিতে চায়। শিশুটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শৈশবকাল। সাধারণত ছয় বছর বয়সের পড়ে কোনো শিশুকে মেয়ে হলে বালিকা এবং ছেলে হলে বালক বলা হয়। ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত বয়সকে আমরা বাল্যকাল বলি। দশ বছর বয়সের পর একটি মেয়েকে কিশোরী এবং একটি ছেলেকে কিশোর বলা হয়। মানুষের জীবনের এই সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। দশ বছর থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই কিশোরকালের বিস্তৃতি। এ সময়কালে বালক ও বালিকার শরীর যথাক্রমে পুরুষের এবং নারীর শরীরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি ছেলেদের চেয়ে আগে শুরু হয়। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয় আট থেকে তের বছর বয়সের মধ্যে। ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকাল শুরুর বয়স দশ থেকে পনের বছর। কারো কারো ক্ষেত্রে এর চেয়ে

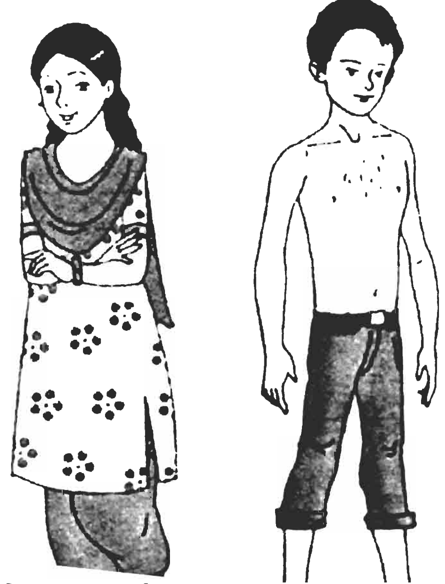
আগে বা পরেও বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকাল বাল্যাবস্থা ও যৌবনকালের মধ্যবর্তী সময়।

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনসমূহ

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে দৈহিক বা শারীরিক পরিবর্তনগুলোই প্রথমে চোখে পড়ে। এই পরিবর্তন দেখলেই বোঝা যায় যে কারো বয়ঃসন্ধিকাল চলছে।



চিত্র : ৪.১ বয়ঃসন্ধিকালে নিজের পরিবর্তনের বিষয়ে মেয়েরা সচেতন হয়ে ওঠে



চিত্র : ৪.২ বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা দ্রুত লম্বা হয়ে ওঠে

শৈশব থেকে বাল্যকাল পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে বেশ সময় নিয়ে বেড়ে ওঠে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালের বেড়ে ওঠা অনেকটা আকস্মিক। হঠাৎ দ্রুত লম্বা হতে থাকে ছেলেমেয়েরা, ওজনও বেশ বাড়তে থাকে। দশ বছর বয়সের পরে তিন থেকে চার বছর ধরে মেয়ে ও ছেলেদের শরীরে আরো নানারকম পরিবর্তন আসে।

দশ বছরের বেশি বয়সের ছেলেদেরও বেশ কিছু পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়। তার মধ্যে একটি বড়ো পরিবর্তন হচ্ছে বীর্যপাত বা স্বপ্নদোষ। এর ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এ ঘটনা প্রায়ই ঘটতে পারে এবং এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো প্রধানত তিন রকম : ১. শারীরিক পরিবর্তন ২. মানসিক পরিবর্তন ৩. আচরণগত পরিবর্তন

১. শারীরিক পরিবর্তন

(ক) দ্রুত লম্বা হয়ে ওঠা
(খ) দ্রুত ওজন বৃদ্ধি
(গ) শরীরে দৃঢ়তা আসা
(ঘ) শরীরের গঠন প্রাপ্তবয়স্কদের মতো হয়ে ওঠা
(ঙ) ছেলেদের ১৬/১৭ বছর বয়সে দাড়ি–গোঁফ ওঠা
(চ) শরীরের বিভিন্ন অংশে লোম গজানো
(ছ) ছেলেদের স্বরভঙ্গ হওয়া ও গলার স্বর মোটা হওয়া

(জ) ছেলেদের বীর্যপাত হওয়া
(ঝ) ছেলেদের বুক ও কাঁধ চওড়া হয়ে ওঠা
(ঞ) মেয়েদের মাসিক শুরু হওয়া
(ট) মেয়েদের কোমরের হাড় মোটা হওয়া

২. মানসিক পরিবর্তন

(ক) অন্যের, বিশেষত নিকটজনের মনোযোগ, যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হওয়া
(খ) আবেগ দ্বারা চালিত হওয়ার প্রবণতা
(গ) ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি হওয়া
(ঘ) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া
(ঙ) নেশা দ্রব্য, যেমন সিগারেটের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া
(চ) মানসিক পরিপক্কতার পর্যায় শুরু হওয়া
(ছ) পরনির্ভরতার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার পর্যায় শুরু হওয়া।

৩. আচরণগত পরিবর্তন

(ক) প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করা
(খ) সে যে একজন আলাদা ব্যক্তিত্ব, এ বিষয়টি বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা
(গ) প্রত্যেক বিষয়ে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা
(ঙ) দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া।

কর্মপত্র (Activity Sheet)

কাজ : নিচের ছকটি পূরণ কর (একক কাজ)

বয়ঃসন্ধিকালের		
শারীরিক পরিবর্তন (মেয়েদের)	শারীরিক পরিবর্তন (ছেলেদের)	মানসিক পরিবর্তন (উভয়ের)

বয়ঃসন্ধিকাল পরিবর্তনের কারণ

সাধারণত ছেয়ে মেয়েদের ১১–১৯ বছরের সময়কালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময়ে ছেলে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তবে আবহাওয়া, স্থান, খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও মানের তারতম্যের কারণে এক এক জনের বয়ঃসন্ধিকালের সময়টা আলাদা হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন ঘটে তার জন্য দায়ী হরমোন নামক রাসায়নিক পদার্থ যা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। হরমোন শরীরের ভিতরে স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। ছেলে ও মেয়েদের শরীরে এ হরমোন এক রকম নয়। এ কারণে এদের শরীর ও মনে যে পরিবর্তন হয় তাও আলাদা। মেয়েদের শরীর বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য দায়ী প্রধানত দুটি হরমোন। এ দুটোকে বলা ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন।

এসব হরমোনের অভাবে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়, দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের আকার

বৃদ্ধিসহ অন্যান্য পরিবর্তন ঘটে। এ হরমোনের কারণে মেয়েদের ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হয়। বয়স যখন ১০–১৭ বছর হয়, সাধারণত তখনই মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হয়। ঋতুস্রাব শুরু হওয়া সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। বাংলাদেশের মহিলাদের সাধারণত ৪৫–৫৫ বছর বয়সের মধ্যে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। ২৮ দিন পরপর বা মাসে একবার এই ঋতুস্রাব প্রক্রিয়া চলে এবং সাধারণত ৩–৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। নারীর সন্তান ধারণের সক্ষমতার লক্ষণ হলো নিয়মিত ঋতুস্রাব।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য যে হরমোন দায়ী তার নাম হলো টেস্টোস্টেরন। এ হরমোনের প্রভাবে তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। ছেলেদের গলার স্বর ভারী হয়। মুখে দাড়ি ও গোঁফ গজায়, দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি হয়।



চিত্র : ৪.৩ বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের দাড়ি–গোঁফ গজায়

১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ছেলেদের শরীরে শুক্রাণু তৈরি হয়। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মানসিক পরিবর্তন হয়। ছেলে ও মেয়েরা এ বয়সে কল্পনাপ্রবণ হয়, আবেগ দ্বারা চালিত হয়। পরিপাটিরূপে নিজেকে সাজিয়ে রাখতে চায়। এ সময় ছেলেরা মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। এভাবেই ধীরে ধীরে কিশোর–কিশোরীরা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষে পরিণত হতে শুরু করে।



চিত্র : ৪.৪ কিশোরীটি নিজেকে পরিপাটি করে সাজছে

কাজ : নিচের যে বিবৃতিটি সত্য তার বিপরীত 'স' ও যেটি মিথ্যা তার বিপরীত 'মি' লিখো

বিবৃতি	'স'	'মি'
• বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো ঘটে হরমোনের কারণে		
• বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনের কারণ অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ		
• মেয়েদের শরীরে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোন কাজ করে		
• ইস্ট্রোজেন হরমোন ছেলেদের শরীরে তৈরি হয়		
• ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো ঘটে প্রজেস্টরন হরমোনের প্রভাবে		
• ইস্ট্রোজেন খাদ্য হজমে সহায়তা করে		

তোমরা জেনেছ যে ছেলে-মেয়েদের ১১-১৯ বছর বয়সের সময়কালকে বলা হয় বয়ঃসন্ধিকাল। তোমরা এও জেনেছ এ সময় ছেলে-মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলোর সাথে স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি জড়িত।

দৈহিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের দাড়ি ও গোঁফ উঠে এবং মাঝে মাঝে রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত ঘটে। যাকে অনেকে স্বপ্নদোষ বলে থাকেন। স্বপ্নদোষ ভয় বা লজ্জার কোনো বিষয় নয়। স্বপ্নদোষ বলা হলেও এটি কোন দোষ নয়। এটা এ বয়সে শরীরের একটি স্বাভাবিক কার্যক্রম। বয়ঃসন্ধিকালে সাধারণত ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ছেলেদের শুক্রাণু তৈরি শুরু হয়। কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে এ শুক্রাণু দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে। শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই শরীর থেকে শুক্রপাত হয় এবং তা অবিরাম তৈরি হতে থাকে। স্বপ্নদোষ হলে গোসল করে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

এ সময় পুষ্টিকর খাবার বিশেষ করে বেশি করে শাক-সবজি খাওয়া ও পানি পান করা এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করা উচিৎ। বয়ঃসন্ধিকালে স্বাভাবিক শারীরিক পরিবর্তন ছাড়াও নানা রকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। এ বিষয়ে মা-বাবা ও নিকটাত্মীয়দের সাথে আলাপ আলোচনা বা পরামর্শ করা দরকার। সমস্যা জটিল হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। অনেক সময় প্রজনন অঙ্গের আশে পাশে চুলকানি বা কুচকিতে (উরুর ফাঁকে) ঘা হতে পারে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। কিছু দিনের মধ্যে ভালো না হলে এসব বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।





চিত্র : ৪.৫ বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরী উভয়েরই পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন

ছেলেদের মতো মেয়েদেরও বয়ঃসন্ধিকালে অনেক পরিবর্তন ঘটে। এ সময় মেয়েদের শরীরের যেসব পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে ঋতুস্রাব বা মাসিক এবং সাদা স্রাব উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত ৯–১৩ বছর বয়সের মধ্যে মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হয়। প্রত্যেক মাসে ঋতুস্রাব হয় বলে একে মাসিক বলে। মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক শরীরের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। মাসিকের সময় ৩–৫ দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব হতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে এ সময় কিছুটা কম বেশি হতে পারে। এ সময় মেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং নিয়মিত গোসল করা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া এবং বেশি পরিমাণে পানি পান করা প্রয়োজন। এ সময় সাধারণত, বেশি বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

যেহেতু মাসিকের সময় শরীর থেকে অনেক রক্ত বেরিয়ে যায়, তাই ক্ষয়পূরণের জন্য মাছ, মাংস, সবজি এবং ফলমূল বেশি পরিমাণে খাওয়া দরকার। মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হতে পারে। সেক্ষেত্রে গরম পানির সেক দিলে আরাম বোধ হবে। এ সময় মাথাব্যথা ও কোমরে ব্যথা হতে পারে। এসব দেখে বিচলিত হওয়া বা ভয় পাবার কিছু নেই। ব্যথা বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ সেবন করতে হবে।

মাসিকের সময় পরিষ্কার ও শুকনো কাপড় শোষক হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত তুলা বা প্যাড পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করা ভালো। মাসিকের সময় ব্যবহার করা কাপড় পুনরায় ব্যবহার করতে হলে সাবান দিয়ে গরম পানিতে ধুতে হবে এবং রোদে শুকিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে। এই কাপড় অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় রাখা ঠিক নয়। তাতে বিভিন্ন রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনের সময়ে অনেকে একা থাকতে পছন্দ করে। অনেকে অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের সাথে ছেলে–মেয়েদের আবেগিক পরিবর্তন ঘটে। এ বয়সে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সে পরিবর্তনের বিষয়গুলো মনে রেখে তাদের সাথে বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। তাদেরকে মানসিক দিকসহ অন্যান্য সকল ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে এবং সাহস যোগাতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য ছেলেমেয়েরা নিজেরাও সচেষ্ট থাকবে। তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা। এ পরিবর্তনগুলো যে স্বাভাবিক, এ বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। এটা বুঝতে পারলে অস্বস্তি বা ভয় কমে যাবে। দ্বিতীয়ত: এ বিষয়গুলো নিয়ে খোলা মনে মা–বাবা বা বড় ভাই–বোনের সাথে আলোচনা করলে সংকোচ কেটে যাবে। ফলে একা থাকা বা লোকজন এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমে যাবে। এছাড়া ভালো গল্পের বই পড়া, সাথীদের সাথে খেলাধুলা করলে মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকবে।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েদের প্রয়োজনীয় মানসিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করতে হবে। এতে তারা সুস্থ সবল মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সক্ষম হবে।

কর্মপত্র (Activity Sheet)

কাজ : বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তার একটি ছক তৈরি কর :

স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্র	যেসব ব্যবস্থা নিতে হবে
দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা	• • • • • •
	• • • • •

বয়ঃসন্ধিকালীন বিবাহ ও গর্ভধারণ

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিয়ের জন্য মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হয়। কিন্তু এ আইন থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েদের মা–বাবা ১৮ বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই তাদের বিয়ে দেন। কখনও কি ভেবে দেখেছ উপযুক্ত বয়স হওয়ার আগেই মেয়েদের বিয়ে দিলে তারা কোন্ কোন্ অসুবিধার সম্মুখীন হয় ? অল্প বয়সের বিবাহিত মেয়েরা নানা ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে। এর মধ্যে একটি হলো অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ।

গর্ভধারণ কী ?

গর্ভধারণ হচ্ছে শরীরের একটি বিশেষ পরিবর্তন। সন্তান গর্ভে এলেই শুধুমাত্র শরীরের এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। পুরুষের শুক্রাণু যখন মেয়েদের ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় তখনই একটি মেয়ের গর্ভে সন্তান আসে অর্থাৎ সে গর্ভধারণ করে।

গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরে কিছু কিছু অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায়।

এ লক্ষণগুলো হলো–

– বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া ;

– মাথা ঘোরা ;

– বার বার প্রস্রাব হওয়া ;



চিত্র : ৪.৬ গর্ভধারণ কালে বমি হতে পারে

তাহলে গর্ভধারণ কী, গর্ভধারণ কীভাবে ঘটে এবং এর লক্ষণগুলো সম্পর্কে তোমরা জানলে। এরপর পরিণত ও অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে কী ঘটে সে বিষয়ে জেনে নাও।

স্বাস্থ্যঝুঁকি

পরিণত বয়সে গর্ভধারণ হলে মানসিক ও শারীরিক জটিলতা তেমন দেখা যায় না। এসময়ে যেসব শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে সেসব সমস্যা দূর হয়ে যায় এবং একটি সুস্থ শিশু জন্ম নেয়। অপরিণত বয়সে একটি মেয়ের মা হওয়ার মতো মানসিক পরিপক্কতা ও শারীরিক পূর্ণতা থাকে না। ফলে দেখা যায় কম বয়সে যে সব মেয়েরা মা হয় তারা নানা রকম মানসিক ও শারীরিক জটিলতায় ভোগে। একটি মেয়ে যদি ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভবতী হয়, তবে তার নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা হতে পারে। কারণ এ বয়সে মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি ও গঠন সম্পূর্ণ হয় না। এ ছাড়া অপরিণত বয়সের একটি মেয়ের সন্তান ধারণ এবং সন্তান জন্ম দেয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকে না। অপরিণত বয়সে যদি কোনো মেয়ে গর্ভধারণ করে তবে শুধু যে মেয়েটিই শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয় ; ভবিষ্যত শিশুটির জীবনও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এ ছাড়াও এতে পরিবার এবং সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্বাস্থ্যগত সমস্যা

অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, শরীরে পানি আসা, খুব বেশি ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, গর্ভপাত ইত্যাদি ঘটে থাকে। তাছাড়া মা ও সন্তানের মৃত্যুঝুঁকিও বেশি থাকে।

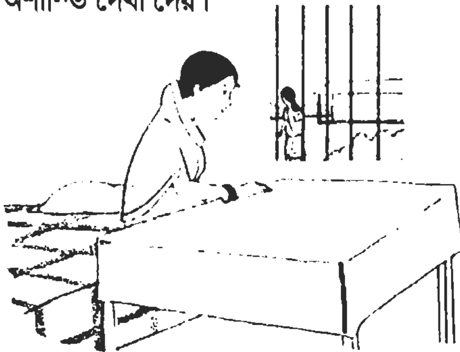
অপরিণত বয়সে গর্ভে সন্তান আসলে সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য গর্ভে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। ফলে কম ওজনের শিশু জন্ম নেয়। এসব শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। এসব শিশু স্বাস্থ্যবান ও সফল মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে না।

শিক্ষাগত সমস্যা

বিদ্যালয়ে পড়ার সময় যদি কোনো মেয়ে গর্ভধারণ করে, তবে সে লজ্জায় আর বিদ্যালয়ে যায় না। তার মানসিক চাপ বেড়ে যায় এবং সে অশান্তিতে ভোগে। শারীরিক দিক থেকেও সে চলাফেরা করতে সমস্যায় পড়ে। এসব কারণে সে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়।

পারিবারিক সমস্যা

অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে মেয়েরা সুস্থভাবে অন্যান্য কাজকর্ম করতে পারে না। অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে তার পরিবারে অশান্তি দেখা দেয়।



চিত্র : ৪.৭ গর্ভধারণের ফলে মেয়েটির বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হয়েছে



চিত্র : ৪.৮ গর্ভধারণের ফলে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা খুব কষ্টকর হয়

আর্থিক সমস্যা

গর্ভধারণের নয় মাসের পুরো সময় জুড়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়। এ ছাড়া কোনো জটিল স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিলে বারে বারে চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়। চিকিৎসক ও ঔষধপত্রের জন্য বেশ অর্থের প্রয়োজন হয়। গর্ভবতী

মায়ের জন্য অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতে হয়। এতেও বেশ অর্থের প্রয়োজন হয়।



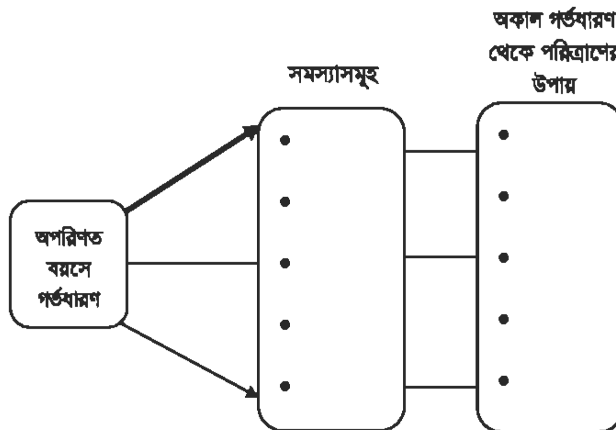
চিত্র : ৪.৯ গর্ভধারণের ফলে বার বার চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়। ফলে সংসার খরচের ওপর চাপ পড়ে।

গর্ভপাত কী এবং গর্ভপাতের জটিলতা

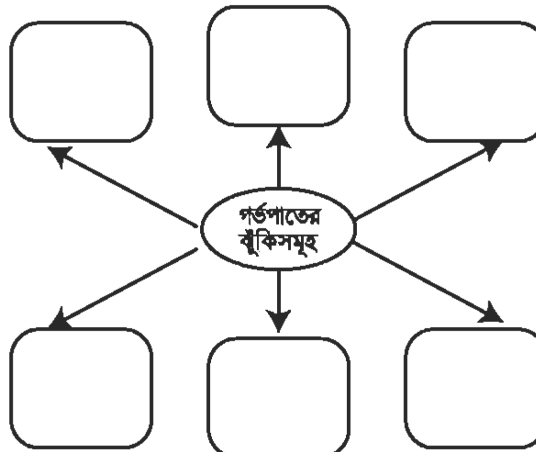
একটি মেয়ের গর্ভে যখন সন্তান আসে, তখন প্রথম অবস্থায় জরায়ুতে বৃদ্ধি ঘটে। ভ্রূণের বৃদ্ধি অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি জরায়ু থেকে ভ্রূণ বের হয়ে যায় তখন গর্ভপাত ঘটে। ইচ্ছাকৃতভাবেও অনেকে গর্ভপাত ঘটায়।

গর্ভধারণের ফলে সঙ্গীর চাপ, অন্যের প্রভাব এবং হতাশার কারণে অনেক মেয়ে আনাড়ি গর্ভপাতকারীদের কাছে যায় এবং ঝুঁকিপূর্ণভাবে গর্ভপাত ঘটায়। এ ধরনের গর্ভপাতের ফলে শারীরিক, মানসিক এবং আবেগীয় প্রভাব পড়ে। এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে।

কাজ : অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের সমস্যাসমূহ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায় নিচের ছকে লিপিবদ্ধ কর।



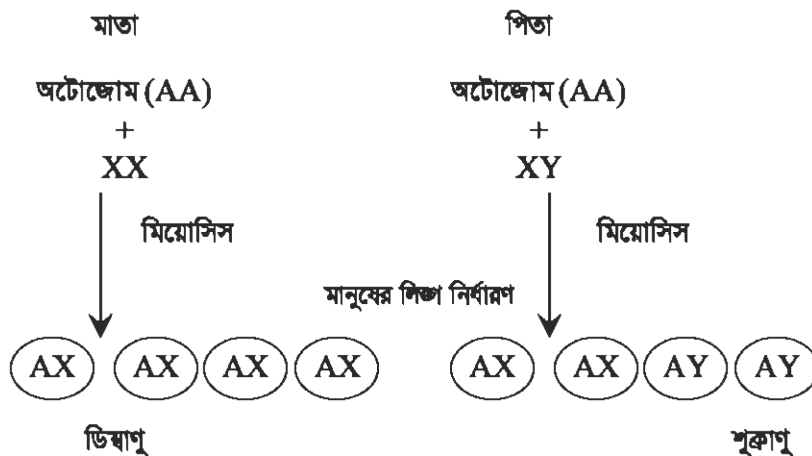
কাজ: নিচের চিত্রে গর্ভপাতের ঝুঁকিসমূহ উল্লেখ কর :



টেস্ট টিউব বেবি

কৃত্রিম উপায়ে দেহের বাইরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে প্রাথমিক ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে স্ত্রীলোকের জরায়ুতে প্রতি স্থাপনের মাধ্যমে শিশুর জন্ম হলে তাকে টেস্ট টিউব বেবি বলা হয়। দেহের বাইরে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন ঘটানোকে বলে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন। ইটালির বিজ্ঞানী ড. পেট্রুসি (Dr. Petrucci) ১৯৫৯ সালে প্রথম টেস্টটিউব বেবি করেন। তবে তিনি ততটা সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। শিশুটি মাত্র ২৯ দিন বেঁচে ছিল। এর প্রায় ১৯ বছর পর ১৯৭৮ সালে ইংল্যান্ডের ড. প্যাট্রিক স্টেপটো ও ড. রবার্ট এডওয়ার্ড এর প্রচেষ্টায় লুইস জয় ব্রাউন নামে টেস্টটিউব বেবি জন্মায়। পর্যায়ক্রমে কতগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ঘটিয়ে টেস্টটিউব বেবির জন্ম দেওয়া হয়। এগুলো হলো সক্ষম দম্পতি থেকে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করে বিশেষ ধরনের পালনমাধ্যমে (Culture medium) এদের মিলন ঘটান, এরপর পালনমাধ্যমে প্রাথমিক ভ্রূণ উৎপাদন, উৎপাদিত ভ্রূণকে স্ত্রী জরায়ুতে প্রতিস্থাপন এবং প্রসূতির পরিচর্যা ও সন্তান লাভ।

আমরা জেনেছি, কোনো জীবের প্রতিটি জীবকোষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। কিন্তু জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ বিশেষ একজোড়া ক্রোমোজোম দ্বারা ঘটে। এ ক্রোমোজোমগুলোকে লিঙ্গ নির্ধারক বা সেক্স ক্রোমোজোম বলে। লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোমগুলোকে আখ্যায়িত করা হয় X এবং Y ক্রোমোজোম নামে। এক জোড়া লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোম ছাড়া বাকি ক্রোমোজোমগুলোকে অটোজোম বলা হয়। অটোজোমগুলোকে ইংরেজি A বর্ণের দ্বারা বুঝানো হয়। মানুষের ক্ষেত্রে মহিলাদের দেহকোষে ডিপ্লয়েড অবস্থায় XX সেক্স ক্রোমোজোম থাকে এবং পুরুষের দেহকোষে ডিপ্লয়েড অবস্থায় XY ক্রোমোজোম থাকে। এ জন্য মানুষ এবং অন্যান্য জীবে সূচক বর্ণের দ্বারা ক্রোমোজোমকে দেখান হয় যেমন $2A + XY$ পুরুষে এবং $2A + XX$ নারীর ক্ষেত্রে। আমরা জেনেছি, মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬ অর্থাৎ ২৩ জোড়া। তাহলে মানুষের কত জোড়া অটোজোম এবং কত জোড়া লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম হবে? সূচকের সাহায্যে জানার চেষ্টা কর। নারীদের ডিম্বাণুতে ২২টি (১১ জোড়া) অটোজোমের সাথে একটি করে X ক্রোমোজোম থাকে এবং মাতৃ জননকোষ থেকে মিয়োসিস পদ্ধতিতে যে চারটি ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়, তার প্রত্যেকটিতে 'X' ক্রোমোজোম থাকে। ফলে সব ডিম্বাণু হয় 'X' ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু গঠনের সময় চারটি শুক্রাণুর মধ্যে দুটি শুক্রাণুর প্রতিটিতে ১১ জোড়া অটোজোমসহ 'X' ক্রোমোজোম এবং অপর দুটি প্রতিটি ১১ জোড়া অটোজোমসহ Y ক্রোমোজোম ধারণ করে। ফলে পুরুষদের শুক্রাণু দুই ধরনের– 'X ও Y' ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। গর্ভধারণকালে ডিম্বাণুর মিলন যদি 'X' ক্রোমোজোমবিশিষ্ট শুক্রাণুর সাথে হয়, তাহলে কন্যাসন্তান হবে, কারণ তখন 'XX' একসাথে হবে। আর গর্ভধারণ কালে ডিম্বাণুর মিলন যদি 'Y' ক্রোমোজোমবিশিষ্ট শুক্রাণুর সাথে হয়, তাহলে যে সন্তান হবে সেটি ছেলে সন্তান হবে, কারণ তখন 'XY' একসাথে হবে।



পুংজনন কোষ

স্ত্রীজনন কোষ		AX	AY
	AX	AAXX মেয়ে	AAXY ছেলে
	AX	AAXX মেয়ে	AAXY ছেলে

মানুষের জনন কোষ সৃষ্টি

আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কন্যা সন্তান হলে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কারণে মাকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু উপরের আলোচনা থেকে তোমরা জানতে পারলে, এতে মায়ের কোনো ভূমিকা নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণ X এবং Y বহনকারী পুরুষের শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনের সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল। স্ত্রীর ডিম্বাণু এককভাবে কখনও কন্যা সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। কন্যা সন্তান তখনই হবে যখন পুরুষের X ক্রোমোজোম ধারণকারী শুক্রাণুর স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে মিলন ঘটবে।

সুতরাং পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য মায়ের কোনো ভূমিকা নেই। লিঙ্গ নির্ধারণের অসমতার জন্য পুরুষও দায়ী নয়। কারণ পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার বিষয়টি নির্ধারণ করে প্রকৃতি ।

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি

বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে আমরা যেসব জীবের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে দশ লাখের বেশি প্রাণী–প্রজাতি এবং চার লাখের মতো উদ্ভিদ–প্রজাতিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বহু পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী অপরিবর্তিত, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর যে আকার বা আয়তন ছিল তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তাদের মতে আদি জীবজগতের সঙ্গে বর্তমানকালের জীবজগতের কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জেনোফেন (Xenophane) নামের একজন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম কতকগুলো জীবাশ্ম (fossil) আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, অতীত ও বর্তমান যুগের জীবদেহের গঠনে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ জীবদেহের আকার অপরিবর্তনীয় নয়।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) প্রমাণ করেন যে জীবজগতের বিভিন্ন জীব এবং একটি শ্রেণির জীব অপর শ্রেণির জীব থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং জীবগুলো তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিবর্তন বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। বিবর্তন একটি মন্থর ও গতিশীল প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠনগতভাবে সরল জীব থেকে জটিল জীবের উৎপত্তি ঘটেছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মতানুসারে, প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর আগে সূর্য থেকে সৃষ্ট এই পৃথিবী একটি জ্বলন্ত গ্যাস–পিণ্ড ছিল। এই জ্বলন্ত গ্যাস–পিণ্ড ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করায় এবং তার উত্তাপ কমে যাওয়ায় ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরে এই পিণ্ডটি বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে ক্রমশ কঠিন হতে থাকে এবং উদ্ভূত জলীয় বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। ওইরকম মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবীর কঠিন বহিঃস্তরে জলভাগ তথা সমুদ্রের আবির্ভাব ঘটে। সমুদ্রের পানিতে সৃষ্ট জীবকুলের ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

গভীর চিন্তা ভাবনা ও পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর আধুনিক মানুষের ধারণা হয়েছে যে, জীব সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বিবর্তন। ল্যাটিন শব্দ 'Evolveri' থেকে বিবর্তন শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। ইংরেজ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) সর্বপ্রথম ইভোলিউশন কথাটি ব্যবহার করেন। যে ধীর, অবিরাম ও গতিশীল পরিবর্তন দ্বারা কোনো সরলতর উদবংশীয় জীবের পরিবর্তন দ্বারা জটিল ও উন্নততর নতুন প্রজাতির বা জীবের উদ্ভব ঘটে তাকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বা ইভোলিউশন বলে। সময়ের সাথে কোনো জীবের পরিবর্তনের ফলে যখন নতুন কোনো প্রজাতি সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলে জৈব বিবর্তন।

জীবনের আবির্ভাব কোথায়, কবে এবং কীভাবে ঘটেছে

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমানে প্রচলিত আছে। তবে জীবনের উৎপত্তি যে প্রথমে সমুদ্রের পানিতে হয়েছিল এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে যুক্তি রেখেছেন সেগুলো হলো : প্রথমত অধিকাংশ জীবকোষ এবং দেহস্থ রক্ত ও অন্যান্য তরলে নানারকম লবণের উপস্থিতি যার সঙ্গে সমুদ্রের পানির খনিজ লবণের সাদৃশ্য। দ্বিতীয়ত সমুদ্রের পানিতে এখনো অনেক সরল এবং এককোষী জীব বসবাস করে।

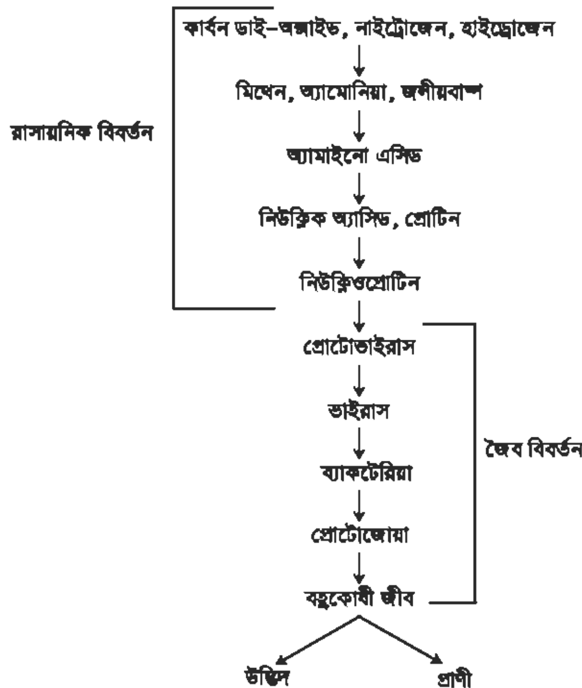
পৃথিবীতে কিভাবে জীব সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অনুমান, প্রায় ২৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রচুর পরিমাণে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছিল; কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। অহরহ আগ্নেয়গিরির আগ্নেৎপাতের ফলে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটত এবং বজ্রপাতের ফলে ও অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে এই যৌগ পদার্থগুলো মিলিত হয়ে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড উৎপন্ন করে। পরে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড মিলিত হওয়ায় নিউক্লিওপ্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়। নিউক্লিওপ্রোটিন অণুগুলো ক্রমে নিজেদের প্রতিরূপ–গঠনের (replication) ক্ষমতা অর্জন করে জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। পৃথিবীর উৎপত্তি ও জীবনের উৎপত্তির ঘটনা প্রবাহকে বলে রাসায়নিক বিবর্তন বা অভিব্যক্তি।

ধারণা করা হয় প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড সহযোগে সৃষ্টি হয় নিউক্লিওপ্রোটিন। এই নিউক্লিওপ্রোটিন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রোটোভাইরাস এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ভাইরাস। ভাইরাস এমন একটা অবস্থা নির্দেশ করে যা জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থা।

নিউক্লিওপ্রোটিন $\rightarrow$ প্রোটোভাইরাস $\rightarrow$ ভাইরাস।

এরপর সম্ভবত উদ্ভব হয় ব্যাকটেরিয়া এবং আরও পরে সৃষ্টি হয় প্রোটোজোয়া। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির, তাই এদের আদি কোষ বলা হয়। পরে প্রোটোজোয়ানদের দেহে দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। কিছু এককোষী জীবদেহে সৃষ্টি হল ক্লোরোফিল, ফলে একদিকে যেমন খাদ্য সংশ্লেষ সম্ভব হলো তেমনি পরিবেশে অক্সিজেনের সৃষ্টি হলো। তখন সবাত শ্বসনকারী জীবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। উদ্ভব হলো এককোষী থেকে বহুকোষী জীব। এরপর একদিকে উদ্ভিদ ও অপরদিকে প্রাণী– দুটি ধারায় জীবের অভিব্যক্তি বা বিবর্তন শুরু হলো।

ছকের সাহায্যে ধারণাকৃত বিবর্তনের ধাপগুলো দেখানো হলো :

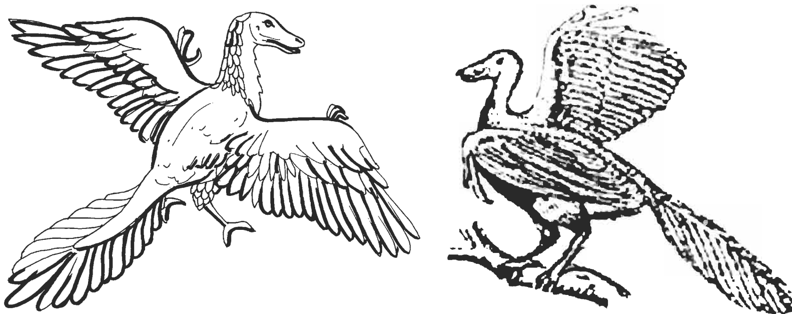


বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণ

বিবর্তনের আলোচনায় মূলত দুটি বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়; একটি হলো– বিবর্তন যে হয়েছে তার প্রমাণ, অপরটি হলো– বিবর্তনের পদ্ধতি অর্থাৎ কীভাবে জীবজগতে বিবর্তন এসেছে। সৃষ্টির পর থেকে কোটি কোটি বছর ধরে জীবজগতের পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটেছে তার স্বপক্ষে একাধিক প্রমাণ আছে। নিচে সেগুলো আলোচিত হলো।

(ক) অঙ্গাস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ : বিভিন্ন জীবের অঙ্গাপ্রত্যঙ্গোর বাহ্যিক গঠনকে অঙ্গাসংস্থান বলে। এদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোচনাকে তুলনামূলক অঙ্গাসংস্থান বলে। সমসংস্থ অঙ্গা, সমবৃত্তীয় অঙ্গা ও লুপ্তপ্রায় অঙ্গোর তুলনামূলক অঙ্গাসংস্থান এখানে আলোচিত হলো।

সমসংস্থ অঙ্গা : পাখির ডানা, বাদুড়ের ডানা, তিমির ফ্লিপার, সিলের অগ্রপদ, ঘোড়ার অগ্রপদ, মানুষের হাত ইত্যাদি সমসংস্থ অঙ্গা। আপাতদৃষ্টিতে এদের আকৃতিগত পার্থক্য দেখা গেলেও আভ্যন্তরীণ কাঠামো পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এদের অস্থিবিন্যাসের মৌলিক প্রকৃতি একই ধরনের। অর্থাৎ হিউমেরাস, রেডিও–আলনা, কার্পাল, মেটাকার্পাল ও ফ্যালাঞ্জেস অস্থিগুলো উপর থেকে নিচের দিকে পরপর সজ্জিত রয়েছে। বহিরাকৃতিতে যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হওয়ার জন্যই ঘটেছে। পাখি ও বাদুড়ের অগ্রপদ ওড়ার জন্য, তিমির ফ্লিপার সাঁতারের জন্য, ঘোড়ার অগ্রপদ দৌড়ানোর জন্য ও মানুষের অগ্রপদ কোনো জিনিস ধরা ও অন্যান্য সৃজনশীল কাজের জন্য পরিবর্তিত হয়েছে। সমসংস্থ অঙ্গাগুলো থেকে বোঝা যায় যে সংশ্লিষ্ট অঙ্গা তথা জীবগুলো উৎপত্তিগতভাবে এক, যদিও সময়ের সঙ্গো বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার ফলে বর্তমানে তাদের গঠন বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই বিবর্তনবিদগণ মনে করেন যে সমসংস্থ অঙ্গাবিশিষ্ট জীবগুলোর উৎপত্তি, একই পূর্বপুরুষ হতে ঘটেছে। এই তথ্য জৈব বিবর্তনকে সমর্থন করে। বিভিন্ন প্রাণীর যে অঙ্গাগুলোর উৎপত্তি, বিকাশ ও গঠন ভিন্ন হলেও কার্যগতভাবে এক, তাদের সমবৃত্তি অঙ্গা বলে। একইভাবে সমবৃত্তি অঙ্গা যেমন পতঙ্গা, বাদুড়, চামচিকার ডানা ওড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এদের উৎপত্তি ও গঠন আলাদা হলেও একই পরিবেশের প্রভাবে তারা একই রকম কাজ করার জন্য অভিযোজিত হয়েছে। এরকম সমবৃত্তি অঙ্গাগুলোও বিবর্তন সমর্থন করে।



চিত্র : ৪.১০ সমসংস্থ অঙ্গা

লুপ্তপ্রায় অঙ্গা : জীবদেহে এমন কতকগুলো অঙ্গা দেখা যায়, সেগুলো নির্দিষ্ট জীবদেহে সক্রিয় থাকে কিন্তু সম্পর্কিত অপর জীবদেহে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, এমন অঙ্গাগুলোকে লুপ্তপ্রায় অঙ্গা বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গা বলে। প্রাণীদেহের মধ্যে বহু লুপ্তপ্রায় অঙ্গা পরিলক্ষিত হয়। মানুষের সিকাম এবং সিকামসংলগ্ন ক্ষুদ্র অ্যাপেন্ডিক্সটি নিষ্ক্রিয়; কিন্তু স্তন্যপায়ীভুক্ত তৃণভোজী গিনিপিগের দেহে এগুলো সক্রিয়।

মানুষের দেহে লেজ নেই তবু মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে কক্‌সিক্স নামক লুপ্তপ্রায় অঙ্গ থাকে। এই কক্‌সিক্স মানুষের পূর্বপুরুষে সুগঠিত ছিল। গরু, ঘোড়া, ছাগল, হাতি, মানুষ প্রভৃতির কর্ণছত্রের গঠন বৈশিষ্ট্য একই ধরনের। এ আলোচনা থেকে বলা যায় যে লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বহনকারী প্রাণিটির উৎপত্তি ঘটেছে এমন উদ্‌বংশীয় প্রাণী থেকে, যার দেহে উক্ত অঙ্গটি সক্রিয় ছিল।



চিত্র : ৪.১১ লুপ্তপ্রায় অঙ্গ

তুলনামূলক শারীরস্থানিক প্রমাণ : বিভিন্ন জীবের অঙ্গের অন্তর্গঠনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য–সংক্রান্ত আলোচনাকে তুলনামূলক শারীরস্থান বলে। বিভিন্ন শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কোনো কোনো অঙ্গের গঠনের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এদের গঠনে মৌলিক সমতা রয়েছে। এই তথ্য জৈব বিবর্তনকে সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠনের উল্লেখ করা যায়। মৎস্যের হৃৎপিণ্ড দুটি প্রকোষ্ঠযুক্ত; উভচরের (ব্যাঙের) হৃৎপিণ্ড তিনটি প্রকোষ্ঠযুক্ত; সরীসৃপের হৃৎপিণ্ডে দুটি অলিন্দ এবং অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত দুটি নিলয় থাকে। পাখি এবং স্তন্যপায়ীর হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠযুক্ত–দুটি অলিন্দ এবং দুটি নিলয়। উপরিউক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলোর হৃৎপিণ্ডের মৌলিক গঠন এক, যদিও তা ক্রমশ জটিল হয়েছে। অর্থাৎ একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের ধারায় ক্রমশ জটিল জীবগুলোর উৎপত্তি ঘটেছে।

সংযোগকারী জীব সম্পর্কিত প্রমাণ : জীবজগতে এমন জীবের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, যাদের মধ্যে দুটি জীবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ ধরনের জীবকে সংযোগকারী জীব বা কানেকটিং লিংক বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্লাটিপাসের নাম উল্লেখ করা যায়। প্লাটিপাসের মধ্যে সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী উভয়েরই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। প্লাটিপাস সরীসৃপের ন্যায় ডিম পাড়ে। অপরদিকে স্তন্যপায়ীর ন্যায় এদের দেহ লোমে ঢাকা, বুকে দুগ্ধগ্রন্থি বর্তমান এবং ডিম ফুটে শাবক জন্মালে এরা শাবককে স্তন্য পান করায়। সংযোগকারী প্রাণীদের অধিকাংশই পৃথিবীর পরিবর্তনের সাথে কার্যকরীভাবে অভিযোজিত হতে সক্ষম না হওয়ায় পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হয়েছে।



চিত্র : ৪.১২ প্লাটিপাস

জীবাশ্মের পরীক্ষা হতে এদের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী উদ্ভিদের সাক্ষাৎ বিরল ঘটনা হলেও এমন কিছু কিছু উদ্ভিদের কথা জানা যায়, যাদের মধ্যে পাশাপাশি দুটি গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান। Gnetum (নিটাম) নামক গুপ্তবীজী উদ্ভিদে ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

জৈব বিবর্তনের মতবাদ অনুসারে এক গোষ্ঠীর জীব থেকে অপর গোষ্ঠীর জীবের আবির্ভাব ঘটে থাকলে দুই গোষ্ঠীর অন্তর্বর্তী জীবের অস্তিত্ব থাকা উচিত। সুতরাং এই সকল সংযোগকারী জীবের উপস্থিতি জৈব বিবর্তনকে সমর্থন করে।

ভ্রূণতত্ত্বঘটিত প্রমাণ : ডিমের ভিতরে অথবা গর্ভের মধ্যে (স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে) অবস্থিত শিশু প্রাণীকে এবং উদ্ভিদের বীজের মধ্যে অবস্থিত শিশু উদ্ভিদকে ভ্রূণ বলে। বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ভ্রূণের সৃষ্টি ও তাদের ক্রমবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণে যে তথ্য পাওয়া যায় তা জৈব বিবর্তনের মতবাদকে সমর্থন করে।

মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ীর অন্তর্গত মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলোর ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ করলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় কোনটি কোন প্রাণীর তা শনাক্ত করা অসম্ভব। প্রতিটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণে ফুলকা, ফুলকা ছিদ্র এবং লেজ থাকে।

ভ্রূণের এরকম সাদৃশ্য লক্ষ করে বিজ্ঞানী হেকেল (Haeckel) এই সিদ্ধান্তে আসেন, 'প্রতিটি জীব তার ভ্রূণের ক্রমপরিণতিকালে অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও উদ্‌বংশীয় জীব তথা পূর্বপুরুষের বিবর্তনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটায়।' প্রকৃতির এই নিয়মকেই হেকেল পরে বলেছিলেন, 'অনটোজেনি রিপিটস্ ফাইলোজেনি' (Ontogeny repeats phylogeny), অর্থাৎ কোনো জীবের ভ্রূণের ক্রমপরিণতি পর্যবেক্ষণ করলে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস জানা যাবে, যা বিবর্তনের স্বপক্ষে একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ

বিজ্ঞানের যে শাখা বর্তমান পৃথিবী হতে বিলুপ্ত জীব সম্পর্কে অনুসন্ধানে নিয়োজিত তাকে প্রত্নজীববিদ্যা বলে। বিজ্ঞানের এই শাখা থেকে নানা প্রকারের জীবাশ্মের পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন অবলুপ্ত জীব সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়।

বিবর্তন সম্পর্কে যেসব প্রমাণ আছে, তাদের মধ্যে জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ সবচেয়ে বলিষ্ঠ। ভূগর্ভের শিলাস্তরে দীর্ঘকাল চাপা পড়ে থাকা জীবের সামগ্রিক বা আংশিক প্রস্তরীভূত দেহ বা দেহছাপকে জীবাশ্ম বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত শিলার মধ্যে এগুলো সঞ্চিত। জীবাশ্মের সাহায্যে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় যে ধারাবাহিকভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে এক রকম জীব থেকে অন্য রকম জীবের উৎপত্তি ঘটেছে। জীবাশ্ম আবিষ্কারের পূর্বে ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব থাকায় বিবর্তনের ইতিহাসে বেশ কিছু ফাঁক থেকে গিয়েছিল। অনুমান করা হয় যে, ঐ ফাঁকগুলোতে এমন কোনো ধরনের জীব ছিল, যাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই রকম খোঁজ না পাওয়া জীবদের মিসিং লিংক (missing link) বা হৃত–যোজক বলা হয়। জীবাশ্ম আবিষ্কারের মাধ্যমে ঐ সমস্ত মিসিং লিংকের সন্ধান পাওয়ায় আজকাল বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাসের অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে।

জীবাশ্মকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বা বিগত যুগের জীবন্ত সাক্ষী হিসেবে গণ্য করা হয়। শিলাস্তর হতে প্রাপ্ত জীবাশ্ম দেখে জীবটির জীবিতকালের হিসাব পাওয়া যায়। তাছাড়া ঐ জীবাশ্মের বৈশিষ্ট্য দেখে বর্তমান এবং অতীতের যোগসূত্র নির্ধারণও সম্ভব হয়।

জীবাশ্মের পরীক্ষালব্ধ তথ্য কীভাবে বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে তা নিম্নে আলোচিত হলো–

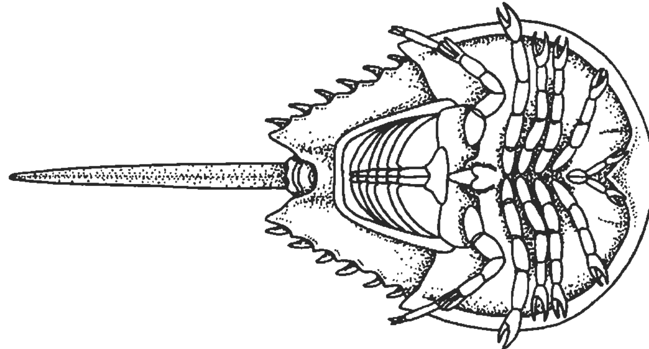
লুপ্ত আর্কিওপ্টেরিক্স (Archaeopteryx) নামে একরকম প্রাণীর জীবাশ্ম পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এদের সরীসৃপের মতো পা ও দাঁত, পাখির মতো পালকবিশিষ্ট দুটি ডানা, একটি দীর্ঘ লেজ, লেজের শেষ প্রান্তে একগুচ্ছ পালক ও চঞ্চু ছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী থেকেই বিবর্তনের মাধ্যমে পাখি জাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি ঘটেছে।



চিত্র : ৪.১৩ আর্কিওপটেরিক্স

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিলুপ্ত টেরিডোস্পার্ম (Pteridosperm) নামে এক ধরনের উদ্ভিদের জীবশ্মে ফার্ন ও ব্যক্তবীজী (gymnosperm) উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়–এ কারণে ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ থেকে জিমনোস্পার্ম অর্থাৎ ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

জীবন্ত জীবাশ্ম : কতগুলো জীব সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করেও কোনোরকম পরিবর্তন ছাড়াই এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছে, অথচ তাদের সমগোত্রীয় এবং সমসাময়িক জীবদের বিলুপ্তি ঘটেছে। এই সকল জীবদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। লিমুলাস বা রাজকাঁকড়া নামক সন্ধিপদ প্রাণী, স্ফেনোডন নামক সরীসৃপ প্রাণী, প্লাটিপাস নামক স্তন্যপায়ী প্রাণী ইত্যাদি এবং ইকুইজিটাম, নিটাম ও গিঙ্কো বাইলোবা নামের উদ্ভিদগুলো জীবন্ত জীবাশ্মের উদাহরণ।



চিত্র : ৪.১৪ জীবন্ত জীবাশ্ম–লিমুলাস

লিমিউলাস জীবাশ্মের উদ্ভব ঘটেছিল প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে। এর সাথের অন্যান্য আর্থ্রোপোডাগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এরা আজও বেঁচে আছে। তাই এদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়।

বিবর্তন বা অভিব্যক্তির উপর বিভিন্ন মতবাদ

অভিব্যক্তির ফলে নতুন প্রজাতির অথবা একটি প্রজাতি থেকে অন্য একটি প্রজাতির উৎপত্তি হয়। অভিব্যক্তির কৌশল সম্পর্কে যে সকল বিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদ (theories) প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের মতবাদগুলো আমরা এখন আলোচনা করব।

ল্যামার্কের তত্ত্ব

ল্যামার্ক 'বায়োলজি' শব্দটির প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনিই সর্বপ্রথম অভিব্যক্তির ওপর বিশ্লেষণী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উক্ত বিষয়টি ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে তার লেখা 'ফিলোসোফিক জুওলজিক' (Philosophic Zoologique) নামে একটি বইতে লিপিবন্ধ করেন।

ল্যামার্কের তত্ত্বকে ল্যামার্কিজম (Lamarckism) বা ল্যামার্কবাদ বলে। কয়েকটি প্রধান প্রতিপাদ্যের ওপর ভিত্তি করে ল্যামার্কবাদ গঠিত। প্রতিপাদ্যগুলো এখানে আলোচনা করা হলো :



চিত্র : ৪.১৫ বিজ্ঞানী ল্যামার্ক

১. ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র : ল্যামার্কের মতে, জীবের প্রয়োজনে জীবদেহে কোনো নতুন অঙ্গের উৎপত্তি অথবা কোনো পুরোনো অঙ্গের অবলুপ্তি ঘটতে পারে। তাঁর মতে, যদি কোনো জীবের কোনো অঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়, তবে সেই অঙ্গ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার জন্য ধীরে ধীরে সবল ও সুগঠিত হবে। অন্যদিকে, জীবের কোন অঙ্গ পরিবেশের অপ্রয়োজনীয় হলে ঐ অঙ্গের আর ব্যবহার থাকে না–সুতরাং ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে অঙ্গটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হবে এবং অবশেষে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। ল্যামার্কের মতে, অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার জীবদেহে পরিবর্তন সূচিত করে, যা জীবের বংশপরম্পরায় অর্জিত বৈশিষ্ট্য।

২. পরিবেশের প্রভাব : সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশে জীব নিজেকে উপযুক্তভাবে মানিয়ে নেবার জন্য সব সময় চেষ্টা করে। এটি জীবের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করতে জীবদেহে নানা রকমের পরিবর্তন দেখা যায়। ল্যামার্কের মতে, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে জীবের স্বভাব এবং দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। এটাও একটি জীবের অর্জিত বৈশিষ্ট্য।

৩. অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ ও নতুন প্রজাতির উৎপত্তি : ল্যামার্কের মতে, কোনো জীবের জীবনকালে যে সকল বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়, সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ ঘটে।

ল্যামার্কের তত্ত্ব অনুযায়ী, অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের জন্য এবং প্রতিটি প্রজন্মে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জিত

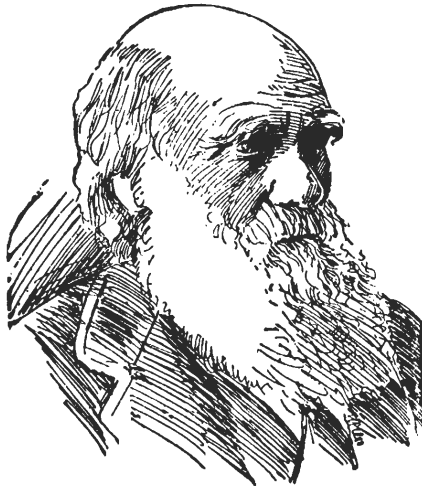
হওয়ায় ধীরে ধীরে একটি প্রজাতি থেকে অপর একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

ল্যামার্ক কতগুলো পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই তার মতবাদ রচনা করেছিলেন। তার দেওয়া কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে মতবাদটির স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো–

- ক্রমাগত পানিতে সাঁতার কাটার ফলে জলজ পাখির পায়ের আঙ্গুলের অন্তবর্তী স্থানগুলো পাতলা চামড়া দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় লিপ্তপদে পরিণত হয়েছে।
- সাপের পূর্বপুরুষদের গিরগিটির মতো চারটে পা ছিল, কিন্তু গর্ত ও ফাটলে বাস করার জন্য পায়ের ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে বর্তমানে ঐ বৈশিষ্ট্যটি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়েছে।
- ল্যামার্কের মতে, জিরাফের সুদীর্ঘ গ্রীবা, খুব উঁচু গাছ থেকে পাতা সংগ্রহের জন্য, অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের ফলেই ঘটেছে।

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা জৈব বিবর্তনে ল্যামার্কের মতবাদ গ্রহণ করতে পারেননি। সময়ের সাথে প্রজাতির পরিবর্তন হয়েছে তা বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন না। বংশগতি বিদ্যার প্রসারের পর বংশগতিবিদগণ জীবের মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম। কিন্তু বাস্তবে অর্জিত বৈশিষ্ট্য যে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয় এর স্বপক্ষে বর্তমান বংশগতিবিদগণ কোনো প্রমাণ পাননি।

ডারউইনবাদ বা ডারউইনের মতবাদ : ল্যামার্ক বিবর্তনের যে মতবাদ দেন, তার ৫০ বছর পর ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Darwin, 1809-1882) ইংল্যান্ডের স্রাসবেরি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণকালে তিনি ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের প্রায় ২০ বছর পরে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির উদ্ভব' (Origin of species by means of natural selection) শীর্ষক পুস্তকে তাঁর মতবাদটি প্রকাশ করেন।



চিত্র : ৪.১৬ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন

ডারউইনের দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে সংঘটিত সাধারণ সত্যগুলো হলো–

১. অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি : ডারউইনের মতে, অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি করাই জীবের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ : একটি সরিষা গাছ থেকে বছরে প্রায় ৭৩০,০০০টি বীজ জন্মায়। একটি স্ত্রী স্যামন মাছ প্রজনন ঋতুতে প্রায় ৩ কোটি ডিম পাড়ে। ডারউইনের মতে এক জোড়া হাতি থেকে উদ্ভূত সকল হাতি বেঁচে থাকলে ৭৫০ বছরে হাতির সংখ্যা হবে এক কোটি নব্বই লাখ।

২. সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান : ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমাবদ্ধ হওয়ায় জীবের বাসস্থান এবং খাদ্যও সীমিত।

৩. অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম : জীবের জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় এবং খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় জীবকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ডারউইন এ ধরনের সংগ্রামকে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন। ডারউইন লক্ষ করেন যে জীবকে তিনটি পর্যায়ে এই সংগ্রাম করতে হয়। যথা–

(ক) **আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম :** উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যাঙ একদিকে কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করে, অন্যদিকে তেমনি ব্যাঙেরা সাপ কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আবার, ময়ূর কর্তৃক ব্যাঙ ও সাপ উভয়েই ভক্ষিত হয়–এভাবে নিতান্ত জৈবিক কারণেই বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য–খাদক সম্পর্কযুক্ত একটি নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম গড়ে ওঠে।

(খ) **অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম :** একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের খাদ্য ও বাসস্থান একই রকমের হওয়ায়, এদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়; উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি দ্বীপে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পেলে খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সবল প্রাণীগুলো দুর্বল প্রাণীদের প্রতিহত করে গ্রাসাচ্ছাদন করে। ফলে দুর্বল প্রাণীগুলো কিছুদিনের মধ্যেই অনাহারে মারা পড়ে।

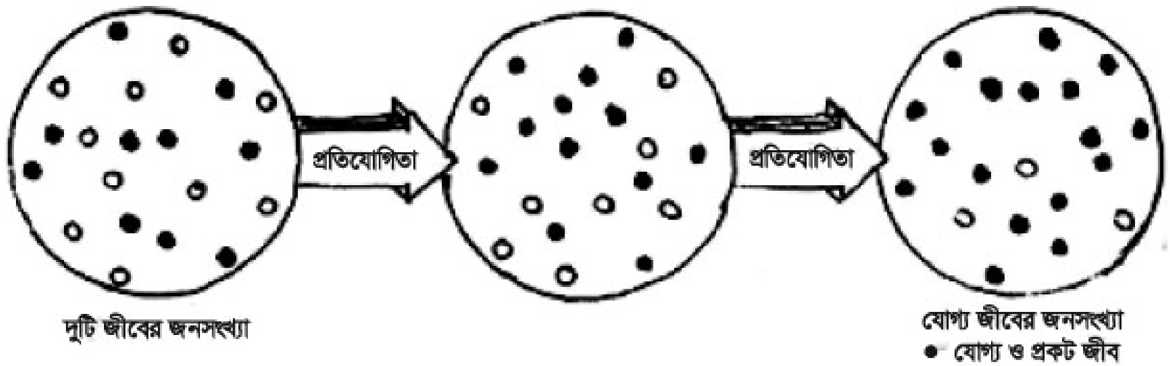
(গ) **পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম :** বন্যা, খরা, ঝড়–ঝঞ্ঝা, প্রচণ্ড বালিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্রতিকূল পরিবেশ জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। সুতরাং জীবকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এসব প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর ও মধ্য আমেরিকার কোয়েল পাখি প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তুষারপাতের ফলেই বিলুপ্ত হয়েছে।

৪. প্রকরণ বা জীবদেহে পরিবর্তন : চার্লস ডারউইনের মতে, পৃথিবীতে দুটি জীব অবিকল একই ধরনের হয় না। এদের কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। জীব দুটির মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাকে প্রকরণ বা পরিবৃত্তি বলে। অনুকূল প্রকরণ অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রামে জীবকে সহায়তা করে।

৫. যোগ্যতমের জয় : ডারউইনের মতে, যেসব প্রকরণ জীবের জীবন সংগ্রামের পক্ষে সহায়ক এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনমূলক, তারাই কেবল বেঁচে থাকবে; অন্যরা কালক্রমে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হবে। মেরু অঞ্চলের ভাল্লুক বা বাঘ বা উদ্ভিদ গ্রীষ্মপ্রধান পরিবেশে বাঁচতে পারে না।

৬. প্রাকৃতিক নির্বাচন : ডারউইন তত্ত্বের এই প্রতিপাদ্যটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় অনুকূল প্রকরণ বা অভিযোজনমূলক প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশি সুযোগ–সুবিধা ভোগ করে, তাকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে।' অনুকূল প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হলে বেশি সংখ্যায় বেঁচে থাকে এবং অত্যধিক হারে বংশবিস্তার করে। অপরপক্ষে, প্রতিকূল প্রকরণসম্পন্ন জীবেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।

ডারউইনের মতবাদ অনুসারে পরিবেশে যে জীবটি খাপ খাইয়ে নিবে, সে হবে যোগ্য। যোগ্য জীবটি পরিবেশে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে বেঁচে থাকার জন্য বংশবৃদ্ধি করবে এবং প্রকট হবে।



চিত্র : ৪.১৭ দুটি জীবের মধ্যে প্রতিযোগিতার রেখা চিত্র

৭. নতুন প্রজাতির উৎপত্তি : যে সব প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সুবিধাজনক প্রকরণ দেখা যায়, প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করে এবং তাদের লালন করে। সুবিধাজনক প্রকরণযুক্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং অযোগ্যদের তুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে। এদের বংশধরদের মধ্যে প্রকরণগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে যায়। এই বংশধরদের মধ্যে যাদের সুবিধাজনক প্রকরণ বেশি থাকে, প্রকৃতি আবার তাদের নির্বাচন করে। এভাবে যুগ যুগান্তর ধরে নির্বাচিত করে প্রকৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে। বর্তমানে বংশগতিবিদ, কোষতত্ত্ববিদ ও শ্রেণিবিদগণ নতুন প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়ে মেন্ডেলের বংশগতি মতবাদের এবং ডারউইনের বিবর্তন মতবাদের ভিত্তিতে বলেন, ধীর গতিতে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে– (১) মূল প্রজাতি থেকে পৃথক হয়ে (isolation) যাওয়ার ফলে, (২) সংকরায়ণের (hybridization) ফলে এবং (৩) সংকরায়ণ প্রজাতিতে কোষ বিভাজনের সময় কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যার বৃদ্ধির (Polyploidy) ফলে। এর ফলে নতুন জীবটির অভিযোজন ঘটবে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা নতুন প্রজাতির সৃষ্টি ঘটবে।

চার্লস ডারউইনকে জৈব বিবর্তনের জনক বলা হলেও বিবর্তনের উপর তার রচিত মতবাদ সর্বাংশে নির্ভুল নয়। তিনি তার মতবাদের কয়েকটি বিষয় ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারেননি বা যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে অনেকে মনে করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন পানিতে সর্বপ্রথম জীবের উৎপত্তি হয়েছিল?

ক. নদীর　　খ. ঝরনার

গ. সমুদ্রের　　ঘ. পুকুরের

২. প্রোটোভাইরাস সৃষ্টির আগে বায়ুমণ্ডলে যে গ্যাসটি ছিল তা হলো-

i. অক্সিজেন

ii. হাইড্রোজেন

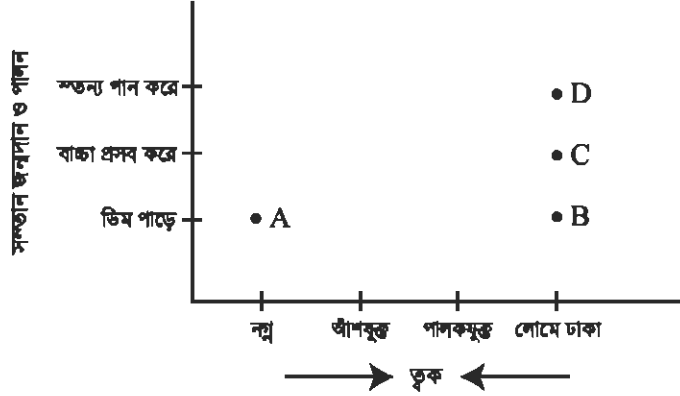
iii. নাইট্রোজেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের গ্রাফটি থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩. গ্রাফের A অবস্থানে কোন প্রাণীটি থাকবে?

ক. মাছ খ. ব্যাঙ

গ. সাপ ঘ. কচ্ছপ

৪. প্লাটিপাসের অবস্থান গ্রাফের কোথায়?

ক. A ও B খ. B ও C

গ. B ও D ঘ. C ও D

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. মিসেস সান্তা সন্তানধারণে অক্ষম হওয়ায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার এ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতিতে তার ডিম্বাণুর পরিস্ফুটন ঘটান। অন্যদিকে মিসেস সান্তার চাচাত বোন মিতা পুত্র সন্তানের আশায় এখন পাঁচ কন্যা সন্তানের জননী।

ক. নিউক্লিওপ্রোটিন কাকে বলে?

খ. জীবন্ত জীবাশ্ম বলতে কী বুঝায়?

গ. মিসেস সান্তার ক্ষেত্রে ডাক্তার কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিতার একই রকম সন্তান হওয়ার বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ কর।

২. জামান বিবর্তন অধ্যায়টি ভালো বুঝতে না পেরে তার বাবার কাছে যায়। বাবা সমসংস্থ বিবর্তন সম্পর্কিত প্রমাণটি বুঝিয়ে দিলেন। এরপর জামান তার বাবার কাছে বিবর্তনের মতবাদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ল্যামার্কের মতবাদ ও ডারউইনের মতবাদ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

ক. সেক্স ক্রোমোজোম কাকে বলে?

খ. বিবর্তন বলতে কী বুঝায়?

গ. বাবা কীভাবে বিবর্তন সম্পর্কিত উল্লিখিত প্রমাণটি ব্যাখ্যা করেন।

ঘ. বাবার বুঝিয়ে দেয়া মতবাদ দুটির মধ্যে কোনটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য? তুলনামূলক আলোচনা করে মতামত দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

দেখতে হলে আলো চাই

আলোর প্রয়োজন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিসীম। আমরা চোখ বন্ধ করলে কিছুই দেখি না। আবার সম্পূর্ণ অন্ধকার স্থানে আমরা চোখ খোলা রাখলেও কোনো কিছু দেখতে পাই না। আলো হচ্ছে সেই নিমিত্ত, যার সাহায্যে আমরা দেখতে পাই। তোমরা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে আলোর বিভিন্ন ঘটনার সাথে পরিচিত হয়েছ। বর্তমান অধ্যায়ে দর্পণের ব্যবহার ছাড়াও আলোর প্রতিসরণ সম্পর্কে আরও জানবে। এছাড়া চোখের ক্রিয়া, স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম বিন্দু, লেন্সের ক্ষমতা, চোখের ত্রুটি ও লেন্সের ব্যবহার এবং চোখ ভালো রাখার উপায় জানবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

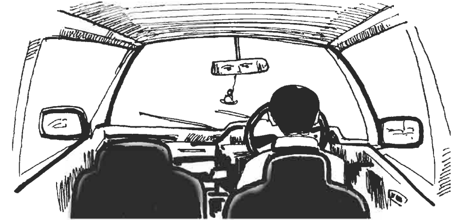
- দর্পণের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোর প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৃষ্টি কার্যক্রমে চোখের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম বিন্দু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেন্সের ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চোখের ত্রুটি সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেন্স ব্যবহার করে চোখের ত্রুটি সংশোধনের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- চোখ ভালো রাখার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চোখের ত্রুটি সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে পারব।
- চোখের প্রতি যত্ন নেব এবং অন্যদের সচেতন করব।

দর্পণের ব্যবহার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দর্পণের বিভিন্ন রকম ব্যবহার আছে। বর্তমান পাঠে আমরা দর্পণের দুটি বিশেষ ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব। এ দুটি হলো নিরাপদ ড্রাইভিং এবং অন্যটি হলো পাহাড়ি রাস্তার অদৃশ্য বাঁক/পার্বত্য সড়কের বিপজ্জনক বাঁকে দর্পণের ব্যবহার।

নিরাপদ ড্রাইভিং

গাড়ি নিরাপদে ড্রাইভিং করার অন্যতম শর্ত হলো নিজ গাড়ির আশেপাশে সর্বদা কী ঘটছে তা খেয়াল রাখা। সাধারণত গাড়ির সামনের দরজার সম্মুখ দিকে দু'পাশে দুটি দর্পণ ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া গাড়ির ভিতরে সামনের দিকে মাঝখানে আরেকটি দর্পণ থাকে। এগুলো গাড়ির দুপাশে এবং পিছনের দিকে দেখার কাজে সহায়তা করে। ফলে ড্রাইভারকে শরীরে কোনো রকম মোচড় দিতে বা নাড়াতে হয় না।



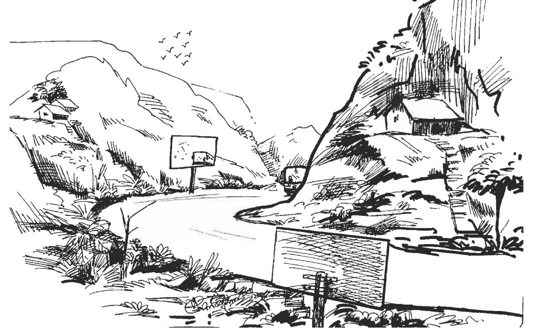
চিত্র : ৫.১ নিরাপদ ড্রাইভিং

এর ফলে কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য ড্রাইভারকে তার হাতকে সর্বদা হুইলে রেখে সামনে বা পিছনের দিকে নজর রাখতে সহজ হয়। গাড়ি চালনা শুরু করার পূর্বেই দর্পণ দুটিকে যথাযথ জায়গায় স্থাপন করে নিতে হয়, যাতে ড্রাইভিং সিটে বসেই পিছন এবং দুপাশ সঠিকভাবে দেখা যায়।

পাশাপাশি এটি যথাযথ পরিষ্কার করে নিতে হয় যাতে কোনো ময়লা বা ধুলাবালি না থাকে। এতে অন্য গাড়ির প্রতিবিম্বের অবস্থান পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। গাড়ি কোনো কারণে পিছানোর দরকার হলে প্রথমে তিনটি দর্পণেই চোখ বুলিয়ে নিতে হবে এবং গাড়িটি না থামানো পর্যন্ত সারাক্ষণ তিনটি দর্পণেই চোখ রাখতে হবে। তাছাড়া গাড়ি লেন পরিবর্তন করার পূর্বেও দর্পণ তিনটির দিকে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে পিছনের ও পাশের গাড়ির অবস্থান বুঝা যায়।

পাহাড়ি রাস্তার অদৃশ্য বাঁক

পাহাড়ি রাস্তা সাধারণত আঁকাবাঁকা হয়। অনেক সময় এমনও অদৃশ্য বাঁক থাকে যে পরবর্তী রাস্তাটি প্রায় ৯০° কোণে থাকে। এই কারণে পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভিং করা বিপজ্জনক। একারণে পাহাড়ি রাস্তায় বিভিন্ন বাঁকে বড় সাইজের গোলীয় দর্পণ স্ট্যান্ডে দাঁড় করে রাখা হয়। ফলে এর কাছাকাছি এসে দর্পণে তাকালে বাঁকের অন্য পাশ থেকে কোনো গাড়ি আসে কিনা তা দেখা যায় এবং ড্রাইভার সাবধান হয়ে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করে নিরাপদে গাড়ি চালাতে পারে।

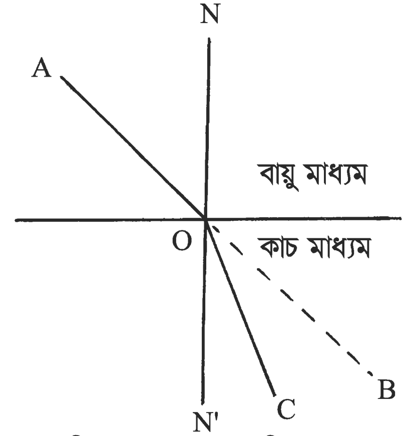


চিত্র : ৫.২ পাহাড়ি রাস্তার অদৃশ্য বাঁক

আলোর প্রতিসরণ

তোমরা অষ্টম শ্রেণিতে আলোর প্রতিসরণ এবং এর বাস্তব প্রয়োগ দেখেছ। আমরা জানি, আলোক রশ্মি কোনো স্বচ্ছ ও সমসত্ত্ব মাধ্যমে সর্বদা সরলরেখায় চলে। আলো যখন একটি স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে লম্বভাবে আপতিত না হয়ে তির্যকভাবে আপতিত হয়, তখন মাধ্যম দুটির বিভেদতলে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। আলোক রশ্মির এভাবে দিক পরিবর্তন করার ঘটনাই হলো আলোর প্রতিসরণ।

পাশের চিত্রটি লক্ষ কর। এখানে NN' হলো মাধ্যম দুটির অভিলম্ব। আলোক রশ্মি AO বরাবর আপতিত হলে AO আপতিত রশ্মি এবং O বিন্দু হলো আপতন বিন্দু। প্রথম মাধ্যম বায়ু এবং দ্বিতীয় মাধ্যমটি কাচ হওয়ায় এবং কাচের ঘনত্ব বায়ু অপেক্ষা বেশি বিধায় আলোক রশ্মি OB পথে না গিয়ে ON'-এর দিকে সরে এসে OC বরাবর চলে যায়। এখানে OC প্রতিসরিত রশ্মি। $\angle AON$ হলো আপতন কোণ এবং $\angle CON'$ হলো প্রতিসরণ কোণ। এখানে উল্লেখ্য, আলোক রশ্মি যদি AO বরাবর আপতিত না হয়ে NO বরাবর আপতিত হতো তাহলে এটি সোজা ON' বরাবর চলে যেত।



চিত্র : ৫.৩ আলোর প্রতিসরণ

প্রতিসরণের সূত্র : আলোর প্রতিসরণের সময় এর রশ্মির চলাচলের ধর্মের উপর ভিত্তি করে যে সাধারণ সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় তাকে দুটি সূত্রে প্রকাশ করা যায়।

১। আপতিত রশ্মি, আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের ওপর অংকিত অভিলম্ব এবং প্রতিসরিত রশ্মি একই সমতলে থাকে।

২। এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদাই ধ্রুব থাকে।

দ্বিতীয় সূত্রে যে ধ্রুব সংখ্যাটির কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো নির্দিষ্ট রঙের জন্য প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক। অর্থাৎ বিভিন্ন রঙের জন্য এই প্রতিসরাঙ্কের মাত্রা বিভিন্ন হয়।

আমরা কীভাবে দেখতে পাই- চোখের ক্রিয়া

তোমরা অষ্টম শ্রেণিতে চোখের গঠন সম্পর্কে জেনেছ। বর্তমান পাঠে চোখের ক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কীভাবে দেখতে পাই তা আলোচনা করব।

চোখের উপাদানগুলোর মধ্যে রেটিনা, চোখের লেন্স, অ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার মিলে একত্রে একটি অভিসারী লেন্সের মতো কাজ করে। যখনই আমাদের সামনে কোনো বস্তু থাকে, তখন ঐ বস্তু হতে আলোক রশ্মি ঐ লেন্স দ্বারা প্রতিসরিত হয় এবং রেটিনার ওপর একটি উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। রেটিনার ওপর আলো পড়লে স্নায়ুর সাথে সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রড ও কোণ কোষসমূহ সেই আলো গ্রহণ করে তাকে তড়িৎ প্রেরণায় পরিণত করে। ঐ স্নায়ু তড়িৎ প্রেরণাকে তাৎক্ষণিকভাবে অক্ষি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। এখানে উল্লেখ্য, কোণকোষগুলো তীব্র আলোতে সাড়া দেয় এবং রঙের অনুভূতি ও রঙের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। অন্যদিকে রডকোষগুলো ক্ষীণ আলোতেও সংবেদনশীল হয় এবং বস্তুর নড়াচড়া ও আলোর তীব্রতার সামান্য হ্রাস–বৃদ্ধি বুঝিয়ে দেয়। মস্তিষ্ক রেটিনায় সৃষ্ট উল্টো প্রতিবিম্বকে পুনরায় উল্টো করে দেয়। ফলে আমরা বস্তুটি যে রকম থাকে সেরকমই দেখি।

স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব

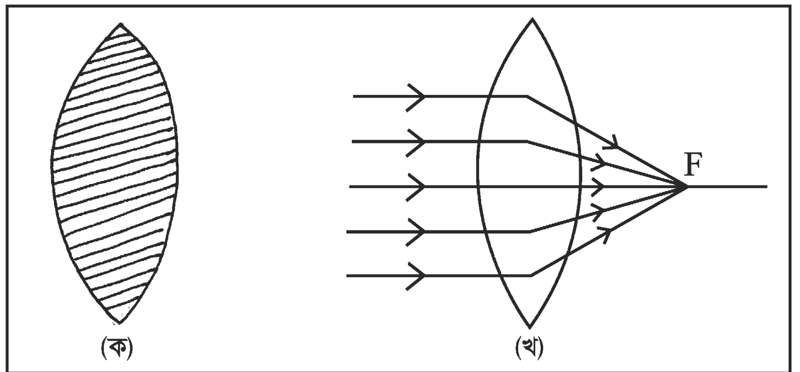
স্বাভাবিক চোখের উপযোজন ক্ষমতা সীমাহীন নয়। লক্ষ্যবস্তু চোখের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অপেক্ষা কম দূরত্বে অবস্থান করলে তা আর চোখে স্পষ্ট দেখা যায় না। চোখের সাপেক্ষে সবচেয়ে নিকটের যে বিন্দু পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুকে বিনা শ্রান্তিতে চোখে স্পষ্ট দেখা যায়, তাকে স্পষ্ট দৃষ্টির নিকট বিন্দু বলে এবং চোখ হতে ঐ বিন্দুর দূরত্বকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব বলে। এই দূরত্ব মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। একজন শিশুর এই দূরত্ব ৫ সেন্টিমিটার এবং একজন স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের এই দূরত্ব ২৫ সেমি পর্যন্ত হতে পারে।

লেন্স কী

দুটি গোলীয় পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলে। অধিকাংশ লেন্সই কাচের তৈরি। তবে কোয়ার্টজ এবং প্লাস্টিক দ্বারাও লেন্স তৈরি হয় এবং এদের ব্যবহারও দিন দিন বাড়ছে।

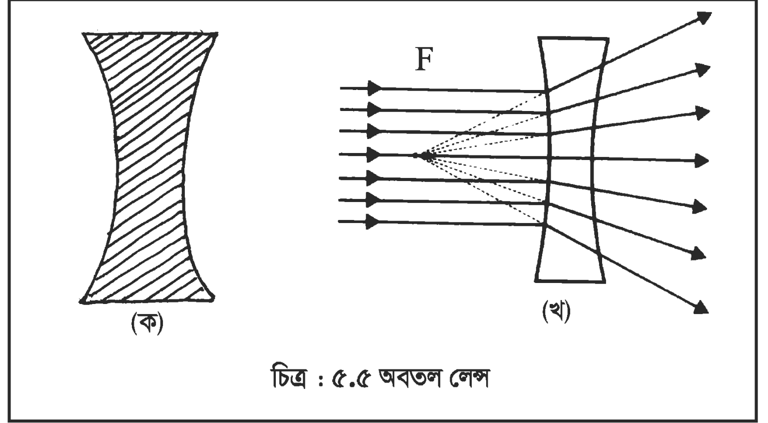
লেন্স প্রধানত দুই প্রকার। যথা– ক. উত্তল বা অভিসারী লেন্স (Convex lens) ও খ. অবতল বা অপসারী লেন্স (Concave lens)

চিত্রে ৫.৪ (ক) হলো উত্তল লেন্স। একে স্থূলমধ্য লেন্সও বলা হয়। কারণ এই লেন্সের মধ্যভাগ মোটা ও প্রান্ত সরু। আলোক রশ্মি উত্তল লেন্সের উত্তল পৃষ্ঠে আপতিত হয়। এই লেন্স সাধারণ একগুচ্ছ আলোক রশ্মিকে অভিসারী করে কোনো একটি বিন্দুতে মিলিত করে [চিত্র ৫.৪ (খ)]। অন্যদিকে অবতল লেন্সের মধ্যভাগ সরু ও প্রান্তের দিকটা মোটা [চিত্র ৫.৫ (ক)]। এই



চিত্র : ৫.৪ উত্তল লেন্স

লেন্সের অবতল পৃষ্ঠে আলোক রশ্মি আপতিত হয়। এই লেন্স একগুচ্ছ আলোক রশ্মিকে অপসারী করে। ফলে অপসারিত রশ্মিগুচ্ছ পিছনের দিকে বর্ধিত করলে কোনো একটি বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে বলে মনে হয়।



চিত্র : ৫.৫ অবতল লেন্স

সাধারণত লেন্সের পৃষ্ঠসমূহ যে গোলকের অংশ তার কেন্দ্রকে বক্রতার কেন্দ্র বলে এবং লেন্সের দুই পৃষ্ঠের জন্য বক্রতার কেন্দ্র দুটি।

বক্রতার কেন্দ্র দুটির মধ্য দিয়ে গমনকারী সরলরেখাই হলো লেন্সের প্রধান অক্ষ। লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এবং নিকটবর্তী রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের যে বিন্দুতে মিলিত হয় (উত্তল লেন্স) বা যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় (অবতল লেন্স) সেই বিন্দুকে লেন্সের প্রধান ফোকাস বলে। ৫.৪ (খ) ও ৫.৫ (খ) চিত্রে F বিন্দু হলো প্রধান ফোকাস। লেন্সের আলোক বিন্দু থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বই হলো লেন্সের ফোকাস দূরত্ব।

লেন্সের ক্ষমতা

আমরা জানি, প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এক গুচ্ছ আলোক রশ্মিকে উত্তল লেন্স অভিসারী করে এক বিন্দুতে মিলিত করে। অপরদিকে অবতল লেন্স একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মিকে অপসারী করে; ফলে ঐ রশ্মিগুচ্ছ কোনো একটি বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে বলে মনে হয়। লেন্সের এই আলোক রশ্মিকে অভিসারী বা অপসারী করার ক্ষমতাই হলো লেন্সের ক্ষমতা। প্রকৃত অর্থে এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মিকে কোনো লেন্সের অভিসারী (উত্তল লেন্সে) গুচ্ছ বা অপসারী (অবতল লেন্স) গুচ্ছে পরিণত করার প্রবণতাই হলো লেন্সের ক্ষমতা।

লেন্সের ক্ষমতার প্রচলিত একক হলো ডায়প্টার (diopter)। এর এসআই একক হলো রেডিয়ান/মিটার। লেন্সের ক্ষমতা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে। কোনো লেন্সের ক্ষমতা $+1D$ বলতে বোঝায়, লেন্সটি উত্তল এবং এটি প্রধান অক্ষের ১ মিটার দূরে আলোক রশ্মিগুচ্ছকে মিলিত করবে।

অনুরূপভাবে লেন্সের ক্ষমতা $-2D$ হলো লেন্সটি অবতল এবং এটি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোক রশ্মিকে এমনভাবে অপসারিত করে যে, এগুলো কোনো লেন্স থেকে ৫০ সেমি দূরের কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে হলে মনে হয়।

চোখের ত্রুটি এবং তার প্রতিকার

তোমাদের কী চোখের কোনো সমস্যা সম্পর্কে ধারণা আছে? এ পাঠে আমরা চোখের বিভিন্ন ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করব।

আমরা জানি সুস্থ এবং স্বাভাবিক চোখের নিকট বিন্দু (Near point) চোখ হতে প্রায় ২৫ সেমি দূরে এবং দূর বিন্দু (Far point) চোখ হতে অসীম দূরে অবস্থান করে। এই সুদীর্ঘ দূরত্বের মধ্যে বস্তু যে স্থানেই থাকুক না কেন চোখ তাকে নির্বিঘ্নে দেখবে। এটাই চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি। এই স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হলেই তাকে চোখের দৃষ্টির ত্রুটি বলা হয়।

চোখের দৃষ্টির ত্রুটি মোট চার রকমের। যথা:

(ক) হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia or short sight)
(খ) দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia or long sight)
(গ) বার্ধক্য দৃষ্টি বা চালশে (Presbyopia)
(ঘ) বিষম দৃষ্টি বা নকুলান্ধতা (Astigmatism)

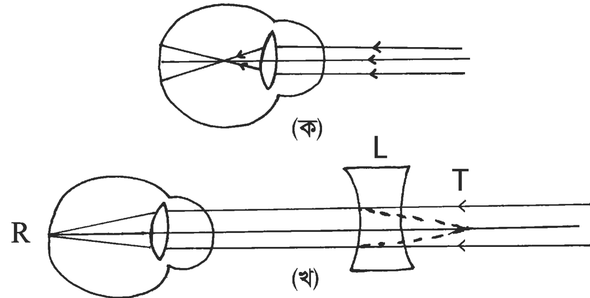
এদের মধ্যে প্রথম দুটিকে দৃষ্টির প্রধান ত্রুটি বলা হয়। নিচে এ দুটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia or short sight)

যখন চোখ কাছের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু দূরের বস্তু দেখতে পায় না, তখন চোখের এই ত্রুটিকে হ্রস্বদৃষ্টি বলে। এরূপ চোখের দূর বিন্দুটি অসীম দূরত্ব অপেক্ষা খানিকটা নিকটে থাকে এবং বস্তুকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব হতে আরও কাছে আনলে অধিকতর স্পষ্ট দেখায়। নিম্নলিখিত দুটি কারণে এই ত্রুটি হয়ে থাকে ।

(১) চোখের লেন্সের অভিসারী শক্তি বৃদ্ধি পেলে ও
(২) কোনো কারণে অক্ষি–গোলকের ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেলে।

ফলে দূরের বস্তু হতে নির্গত আলোক রশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার সামনে (F) বিন্দুতে প্রতিবিম্ব গঠন করে (চিত্র ৫.৬ক)। ফলে চোখ বস্তু দেখতে পায় না।



চিত্র : ৫.৬ হ্রস্বদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

প্রতিকার

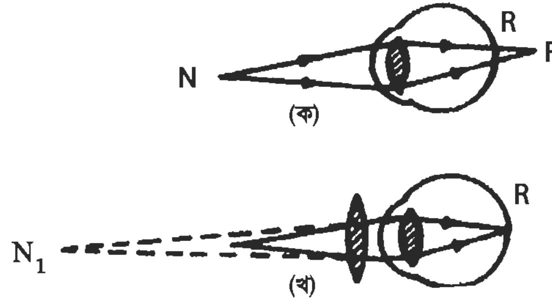
এই ত্রুটি দূর করার জন্য এমন একটি অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে যার ফোকাস দূরত্ব হ্রস্বদৃষ্টির দীর্ঘতম দূরত্বের সমান। এই চশমা লেন্সের অপসারী ক্রিয়া চোখের উত্তল লেন্সের অভিসারী ক্রিয়ার বিপরীতে ক্রিয়া করে। ফলে অসীম দূরত্বের বস্তু হতে নির্গত সমান্তরাল আলোক রশ্মি এই সাহায্যকারী অবতল লেন্স L (চিত্র ৫.৬ খ) এর মধ্য দিয়ে চোখে পড়ার সময় প্রয়োজনমতো অপসারিত হয় এবং অপসারিত রশ্মিগুলো চোখের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনা বা অক্ষিপট R এর ওপর পড়ে। এই অপসারিত রশ্মিগুচ্ছকে পিছনের দিকে বর্ধিত করলে, এরা T বিন্দুতে মিলিত হবে। অতএব চোখ বস্তুটাকে T বিন্দুতে দেখবে এবং T বিন্দুই হ্রস্বদৃষ্টির দীর্ঘতম দূরত্ব।

দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia or long sight)

যখন কোনো চোখ দূরের বস্তু দেখে কিন্তু কাছের বস্তু দেখতে পায় না তখন এই ত্রুটিকে দীর্ঘদৃষ্টি বলে। সাধারণত: বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে এই ত্রুটি দেখা যায়। নিম্নলিখিত দুটি কারণে এই ত্রুটি ঘটে।

(১) চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা হ্রাস পেলে অথবা চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে।
(২) কোনো কারণে অক্ষি–গোলকের ব্যাসার্ধ হ্রাস পেলে।

ফলে স্বাভাবিক নিকট বিন্দু (N) হতে নির্গত আলোক রশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার পিছনে (F) বিন্দুতে মিলিত হয় (চিত্র ৫.৭ ক)। ফলে চোখ কাছের বস্তু দেখতে পায় না।



চিত্র : ৫.৭ দীর্ঘদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

প্রতিকার

এই ত্রুটি দূর করার জন্য চোখের সামনে একটি উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে। ফলে চোখের নিকটতম বিন্দু (N) চিত্র ৫.৭ খ হতে নির্গত আলোক রশ্মি এই সাহায্যকারী লেন্সে এবং চোখের লেন্সে পর পর দুইবার প্রতিসরিত হবার পর প্রয়োজনমতো অভিসারী হয়ে রেটিনা (R) এর উপরে পড়বে। এই প্রতিসরিত রশ্মিগুলোকে পিছনের দিকে বর্ধিত করলে এরা N_1 বিন্দুতে মিলিত হবে। অতএব চোখ বস্তুটিকে N_1 বিন্দুতে দেখবে এবং এই (N_1) বিন্দুই দীর্ঘদৃষ্টির নিকটমত দূরত্ব।

চোখ ভালো রাখার উপায়

আমাদের চোখ অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। এটির যথাযথ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন যাতে এটিকে ত্রুটিমুক্ত রাখা যায়। বিভিন্ন উপায়ে আমাদের চোখকে ভালো রাখা যায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সঠিক পুষ্টি গ্রহণ, সঠিক জীবন ধারা অনুসরণ, দৈনন্দিন কার্যক্রমে পর্যাপ্ত আলো ব্যবহার, সঠিক পদ্ধতিতে বই পড়া বা কম্পিউটার ব্যবহার করা। নিম্নে এগুলোকে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

সঠিক পুষ্টি গ্রহণ চোখের জন্য খুবই দরকারি। এর মধ্যে অন্যতম সঠিক খাবার নির্বাচন করা। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ভিটামিন এ, সি ও ই সমৃদ্ধ খাবার; ফ্যাটি এসিড যুক্ত খাবার, জিংকসমৃদ্ধ খাবার, গাঢ় সবুজ শাকসবজি ও বিভিন্ন ফল চোখের জন্য খুবই ভালো। এ ধরনের খাবার চোখকে রোগমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। গাজর, মাছ, ব্রকলি, গম, মিষ্টি কুমড়া, হলুদ (যেমন– পাকা পেঁপে, আম) ফল ইত্যাদি বেশি করে খেতে হবে।

চোখের সঠিক যত্নের জন্য সঠিক জীবনধারণ পদ্ধতি মেনে চলাও অন্যতম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শরীরের মতো চোখও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চোখকে পুনরায় সতেজ করতে সারারাত ঘুমের প্রয়োজন। তাই এই নির্ধারিত সময় ঘুম নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে, ধমপানও চোখের ক্ষতি করে। তাই ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রখর রোদে বাইরে বেরুলে সাবধানতা হিসেবে ‘সানগ্লাস’ ব্যবহার করা জরুরি। এক্ষেত্রে অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিহত করতে সক্ষম এমন সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। তেল দিয়ে রান্নার সময়; ঝালাইয়ের কাজ করার সময় সাবধান থাকতে হবে। তাছাড়া কেমিক্যাল দিয়ে কাজ করার পর চোখে হাত দেওয়া ঠিক নয়।

আবছা বা অপর্যাপ্ত আলো চোখের জন্য ক্ষতিকর। কক্ষের আলো পর্যাপ্ত রাখতে হবে যেন পড়তে অসুবিধা না হয়। চোখকে যদি ক্লান্ত মনে হয় তবে না পড়ে বরং বিশ্রাম নেওয়াই ভাল।

আমাদের চোখের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব থেকে কম বা বেশি দূরত্বে রেখে বই বা কিছু পড়লে চোখে চাপ পড়ে। তাই সঠিক দূরত্বে রেখে পড়তে হয়। তুমি হয়তো খেয়াল করেছ অনেকক্ষণ ধরে কম্পিউটার ব্যবহার করলে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘক্ষণ টেলিভিশন দেখা ও কম্পিউটার ব্যবহারে চোখের ক্ষতি হয়। তাই এই ক্ষতি থেকে চোখকে রক্ষা করতে নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে ও বিরতি দিয়ে টেলিভিশন দেখা ও কম্পিউটার ব্যবহার করা উচিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্বাভাবিক চোখে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব কত?

ক. ৫ সেমি খ. ১০ সেমি

গ. ২৫ সেমি ঘ. ৫০ সেমি

২. উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো–

i. এটির ক্ষমতা ধনাত্মক

ii. লেন্সের মধ্যভাগ সরু ও মোটা

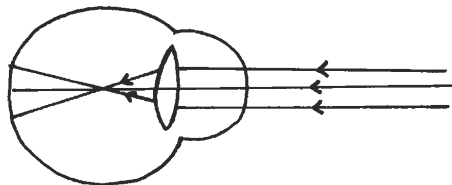
iii. সমান্তরাল রশ্মিগুলোকে একটি বিন্দুতে মিলিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত চোখের ত্রুটিকে কী বলা হয়?

ক. হ্রস্বদৃষ্টি খ. দীর্ঘদৃষ্টি

গ. বার্ধক্য দৃষ্টি ঘ. বিষম দৃষ্টি

৪. উল্লিখিত ত্রুটি দূর করতে হলে কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করতে হবে?

ক. উত্তল লেন্স খ. অবতল লেন্স

গ. উত্তলাবতল লেন্স ঘ. সমতলাবতল লেন্স

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সেঁজুতি দূর থেকে ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষকের লেখা স্পষ্ট দেখতে পায় না। অন্যদিকে সেঁজুতির বাবার কাছের জিনিস দেখতে সমস্যা হয়। পরবর্তীতে সেঁজুতি ও তার বাবা ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার সেঁজুতির জন্য এক ধরনের লেন্স এবং তার বাবার জন্য ভিন্ন ধরনের লেন্স ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন।

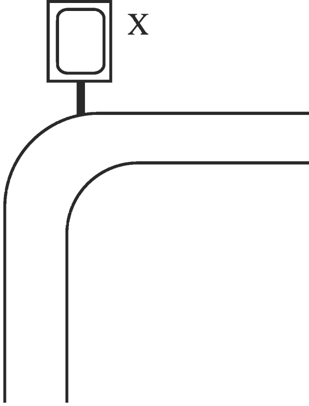
ক. আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে?

খ. স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব বলতে কী বুঝায়?

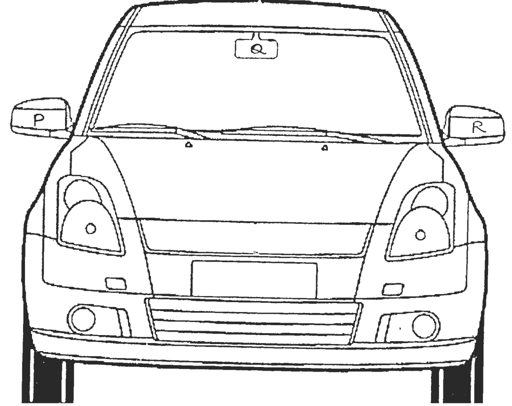
গ. সেঁজুতি চোখের কোন ধরনের ত্রুটিতে আক্রান্ত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সেঁজুতির বাবার জন্য ডাক্তারের ভিন্ন ধরনের লেন্স ব্যবহারের পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

২. **নিচের চিত্র দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**



চিত্র–১



চিত্র–২

ক. লেন্স কাকে বলে?

খ. লেন্সের ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?

গ. চিত্র–১ এ X দর্পণটি ব্যবহারের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্র–২ এর গাড়িটিতে P, Q, R দর্পণের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পলিমার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন রকমের পলিমার পদার্থ। এদের কোনোটি প্রাকৃতিক আবার কোনোটি কৃত্রিম। কিছু কিছু পলিমার পদার্থ আছে, যারা পরিবেশবান্ধব আবার কোনোটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পলিমারকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তু ও বস্ত্রের উৎস, বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- তন্তু হতে সুতা তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সুতার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাবার ও প্লাস্টিকের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টিতে রাবার ও প্লাস্টিকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তাপ প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকার সুতার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় রাবার ও প্লাস্টিকের ব্যবহার ও সংরক্ষণে সচেতন হব।

পলিমার (Polymer)

মেলামাইনের থালা–বাসন, বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, কার্পেট, পিভিসি পাইপ, পলিথিনের ব্যাগ, পাটের ব্যাগ, সিল্কের বা উলের কাপড়, সুতি কাপড়, নাইলনের সুতা, রাবার–এসব জিনিস আমাদের খুবই পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত। এরা সবাই পলিমার। পলিমার (Polymer) শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ পলি (Poly) ও মেরোস (Meros) থেকে, যার অর্থ হলো যথাক্রমে অনেক (Many) ও অংশ (Part)। অর্থ্যাৎ অনেকগুলো একই রকম ছোট ছোট অংশ একের পর এক জোড়া লাগালে যে একটি বড় জিনিস পাওয়া যায়, তাই পলিমার। তোমরা একটি লোহার শিকলের কথা চিন্তা করতে পার। লোহার ছোট ছোট অংশ জোড়া দিয়ে একটি বড় শিকল তৈরি হয়। অর্থাৎ বড় শিকলটি হলো এখানে পলিমার। রসায়ন বিজ্ঞানের ভাষায় একই ধরনের অনেকগুলো ছোট অণু পর পর যুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি করে। যে ছোট অণু থেকে পলিমার তৈরি হয়, তাদেরকে বলে মনোমার (Monomer) ।

আমরা যে পলিথিনের ব্যাগ ব্যাবহার করি, তা হলো ইথিলিন মনোমার থেকে তৈরি পলিমার। একইভাবে আমরা যে পিভিসি পাইপ (PVC) ব্যবহার করি, তা হলো ভিনাইল ক্লোরাইড নামক মনোমার থেকে তৈরি পলিমার। তবে সব সময় একটি মনোমার থেকেই পলিমার তৈরি হবে এমন কোনো কথা নেই, একের অধিক মনোমার থেকেও তৈরি হতে পারে। যেমন– বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড বা বৈদ্যুতিক সুইচ হলো বাকেলাইট নামের একটি পলিমার, যা তৈরি হয় ফেনল

ও ফরমালডিহাইড নামের দুটি মনোমার থেকে। আবার মেলামাইনের থালা–বাসন হলো মেলামাইন রেজিন নামের পলিমার, যা তৈরি হয় মেলামাইন ও ফরমালডিহাইড নামের দুটি মনোমার থেকে। শুরুতে আমরা পলিমারের যে উদাহরণগুলো দেখেছি তাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এদেরকে আমরা বলি প্রাকৃতিক পলিমার।

তোমরা নিজেরা বলতো ঐ উদাহরণগুলোর মধ্যে কোনগুলো প্রাকৃতিক পলিমার?

পাট, সিল্ক, সুতি কাপড়, রাবার–এগুলো প্রাকৃতিক পলিমার। অন্যদিকে মেলামাইন, রেজিন, বাকেলাইট, পিভিসি, পলিথিন– এগুলো প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, শিল্প–কারখানায় কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়। এরা হলো কৃত্রিম পলিমার।

পলিমারকরণ প্রক্রিয়া

মনোমার থেকে পলিমার তৈরি হয় নির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোমার সংযুক্ত করে পলিমার তৈরি হয়, তাকেই বলে পলিমারকরণ প্রক্রিয়া। সাধারণত পলিমারকরণে উচ্চচাপ ও তাপের প্রয়োজন হয়। যদি দুটি মনোমার একসাথে যুক্ত হয় তাহলে উৎপন্ন পদার্থ কেমন হবে? উৎপন্ন পদার্থটিতে দুটির বেশি মনোমার থাকতে পারবে না। আমরা এটিকে এভাবে লিখতে পারি–


১টি মনোমার + ১টি মনোমার ⟶ মনোমার – মনোমার বা (মনোমার)$_২$

তিনটি মনোমার হলে উৎপন্ন পদার্থটিতে তিনটি মনোমার থাকবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি–

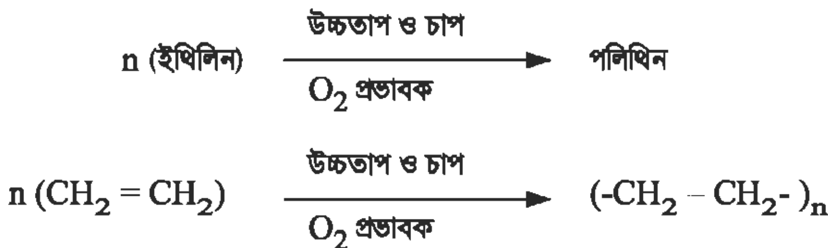

১টি মনোমার + ১টি মনোমার + ১টি মনোমার ⟶ মনোমার – মনোমার – মনোমার বা (মনোমার)$_৩$

আমরা যদি n সংখ্যক মনোমার নিয়ে একটি পলিমার বানাতে চাই, তাহলে পলিমারকরণ প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত উপায়ে দেখানো যায়।


n মনোমার ⟶ (মনোমার)$_n$

পলিথিন কীভাবে তৈরি হয় তোমরা জান?

ইথিলিন গ্যাসকে ১০০০–১২০০ বায়ুমন্ডলীয় চাপে ২০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে পলিথিন পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে পলিমারকরণ দ্রুত করার জন্য প্রভাবক হিসেবে অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।



$$\text{n (ইথিলিন)} \xrightarrow[\text{O}_2 \text{ প্রভাবক}]{\text{উচ্চতাপ ও চাপ}} \text{পলিথিন}$$

$$n\,(CH_2 = CH_2) \xrightarrow[\text{O}_2 \text{ প্রভাবক}]{\text{উচ্চতাপ ও চাপ}} (\text{-}CH_2 - CH_2\text{-})_n$$

তবে উচ্চ চাপ পদ্ধতি সহজসাধ্য না হওয়ায় ইদানীং এটি তেমন জনপ্রিয় নয়। এখন টাইটেনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ($TiCl_3$) নামক প্রভাবক ব্যবহার করে বায়ুমন্ডলীয় চাপেই পলিথিন তৈরি হয়।

তন্তু ও সুতা

তোমরা জান যে আমাদের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হলো বস্ত্র বা কাপড়। এই বস্ত্র আমাদের শীতের হাত থেকে রক্ষা করে, মানসম্ভ্রম রক্ষা করে। সৃষ্টির আদিকালে যখন বস্ত্র ছিল না, তখন লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা ছিল না, তাই ঐ যুগে সভ্যতা ছিল না বলে মনে করা হয়। তাই বস্ত্র বা কাপড়–চোপড় আধুনিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তোমরা কি জান, বস্ত্র কিভাবে তৈরি হয়? সব বস্ত্রই তৈরি হয় সুতা থেকে। আবার সুতা তৈরি হয় তন্তু থেকে। তন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ দিয়ে তৈরি। তাই তন্তু বলতে আঁশজাতীয় পদার্থকেই বুঝায়। কিন্তু বস্ত্রশিল্পে তন্তু বলতে বুনন ও বয়নের কাজে ব্যবহৃত আঁশসমূহকেই বুঝায়। তন্তু দিয়ে সুতা ও কাপড় ছাড়াও কার্পেট, ফিল্টার, তড়িৎ নিরোধক ইত্যাদি বিভিন্ন রকম পদার্থ তৈরি করা হয়।

আমাদের অতি প্রয়োজনীয় তন্তু উৎস অনুযায়ী দুই রকম হয়। সুতি কাপড় তৈরির জন্য তুলা (Cotton), পাট, লিনেন, রেশম, পশম, উল, সিল্ক, অ্যাসবেস্টস ও ধাতব তন্তু ইত্যাদি যেগুলো প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, তাদেরকে প্রাকৃতিক তন্তু বলে। অন্যদিকে পলিস্টার, রেয়ন, ডেক্রন, নাইলন ইত্যাদি যেগুলো বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়, তারা হলো কৃত্রিম তন্তু।

প্রাকৃতিক তন্তুসমূহের মধ্যে আবার তুলা, পাট ইত্যাদি পাওয়া যায় উদ্ভিদ থেকে। তাই এদেরকে উদ্ভিদ তন্তু বলে। পক্ষান্তরে রেশম, পশম এগুলো পাওয়া যায় প্রাণী থেকে। তাই এদেরকে প্রাণিজ তন্তু বলে। আবার ধাতব তন্তু পাওয়া যায় প্রাকৃতিক খনিতে। তাই এদেরকে খনিজ তন্তু বলে।

অন্যদিকে কৃত্রিম তন্তু আবার দুরকমের হয়। সেলুলোজিক তন্তু ও নন সেলুলোজিক তন্তু। রেয়ন, এসিটেট রেয়ন, ভিসকোস রেসন, কিউপ্রা অ্যামোনিয়াম রেয়ন–এগুলো সেলুলোজকে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি হয় বলে এদেরকে সেলুলোজিক তন্তু বলে।

তোমরা জান যে সেলুলোজ হলো একধরনের সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত পদার্থ, যা দিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষ তৈরি হয়। যেসব কৃত্রিম তন্তু সেলুলোজ থেকে তৈরি না করে অন্য পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হয়, তারাই হলো নন–সেলুলোজিক তন্তু। নাইলন, পলিস্টার, পলি প্রোপিলিন, ডেক্রন–এগুলো হলো নন–সেলুলোজিক কৃত্রিম তন্তু।

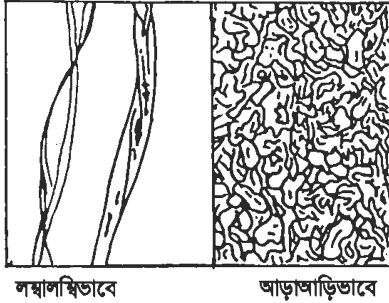
তন্তুর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

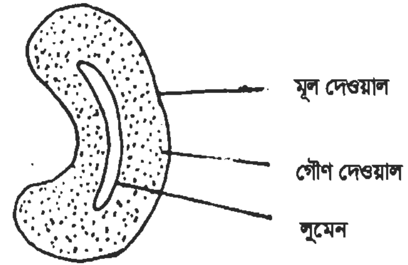
একটি বস্ত্র আরামদায়ক কি না তা নির্ভর করে এটি কী ধরনের কাপড় দিয়ে তৈরি তার ওপর। আবার কাপড় তৈরি হয় সুতা থেকে, যা আসে তন্তু থেকে। কাজেই তন্তুর বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে এখন তন্তুসমূহের বৈশিষ্ট্য জেনে নেওয়া যাক।

তুলার বৈশিষ্ট্য

গরমের দিনে আমরা সুতির পোশাক পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি কেন? কারণ সুতির সুতার তাপ পরিবহন ও পরিচালন ক্ষমতা বেশি। তুলার আঁশ থেকে সুতা তৈরি হয়। প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ তন্তুর মধ্যে প্রধান হলো সুতা। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে সুতির তন্তুকে অনেকটা নলের মতো দেখায়। নলের মধ্যে যে সরু পদার্থটি থাকে তা প্রথম অবস্থায় 'লুমেন' (Lumen) নামক পদার্থে পূর্ণ থাকে। পরে আঁশগুলো ছাড়িয়ে নেওয়ার পর রোদের প্রভাবে শুকিয়ে যায় এবং নলাকৃতি তন্তুটি ধীরে ধীরে চ্যাপ্টা হয়ে ক্রমে একটি মোচড়ানো ফিতার মতো রূপ ধারণ করে। এই ফিতার মতো সুতির আঁশে ১০০ থেকে ২৫০টি পর্যন্ত পাক বা মোচড় থাকে।

বস্ত্র তৈরির সময় এই মোচড়ানো অংশ একে অপরের সাথে সুন্দরভাবে মিশে যায় বলে সুতি বস্ত্র টেকসই হয়। আপতদৃষ্টিতে সুতি পোশাক তেমন উজ্জ্বল নয়। তবে ময়েশ্চারাইজেশনের (moisturization) মাধ্যমে একে উজ্জ্বল ও চকচকে করে তোলা হয়। সুতি তন্তুকে রং করা হলে তা পাকা হয় এবং তাপ ও ধোয়ার ফলে রঙয়ের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। অজৈব এসিডের সংস্পর্শে সুতি তন্তু নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু অন্যান্য এসিডের সংস্পর্শে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। সুতির বস্ত্র ব্যবহারে তেমন বিশেষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই বিধায় এর বহুল ব্যবহার হয়েছে। সুতি বস্ত্রের একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এর সংকোচনশীলতা।





চিত্র : ৬.১ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে সুতিতন্তু

রেশম (Silk)

আগেকার দিনের রাজা–রানির পোশাক বলতে আমরা রেশমি পোশাকই বুঝি। অর্থাৎ বিলাসবহুল বস্ত্র তৈরিতে রেশম তন্তু ব্যবহৃত হয়। রেশমের প্রধান গুণ এর সৌন্দর্য। তিন শতাধিক রঙের রেশম পাওয়া যায়। রেশম বা পলু পোকা নামক এক প্রজাতির পোকার গুটি থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তন্তু আহরণ করা হয়। রেশম মূলত ফাইব্রেয়ন (Fibroin) নামক একপ্রকার প্রোটিন জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রাকৃতিক প্রাণিজ তন্তুর মধ্যে রেশম সবচেয়ে শক্ত ও দীর্ঘ। বিভিন্ন গুণাগুণের জন্য রেশমকে তন্তুর রানি বলা হয়। সূর্যালোকে রেশম দীর্ঘক্ষণ রাখলে এটি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। রেশম হালকা কিন্তু অধিকতর উষ্ণ এবং খুবই কম পরিসরে রাখা যায়।

পশম (Wool)

আমরা শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে পোশাকের কথা সবচেয়ে আগে ভাবি তা হচ্ছে পশম বা উলের পোশাক। তাপ কুপরিবাহী বলে পশমি পোশাক শীতবস্ত্র হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়। নমনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা, কুঞ্চন প্রতিরোধের ক্ষমতা, রং ধারণক্ষমতা ইত্যাদি পশমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই তন্তুর মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকে যেখানে বাতাস আটকে থাকতে পারে। পশম তাপ কুপরিবাহী বিধায় শীতের দিনে শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না। তাই গায়ে দিলে গরম বোধ হয়। লঘু এসিড ও ক্ষারে পশমের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। মথ পোকা পশম তন্তু নষ্ট করে। তাছাড়া ছত্রাক পশম তন্তুকে সহজে আক্রান্ত করে নষ্ট করে দিতে পারে। পশম একটি অতি প্রাচীন তন্তু। বিভিন্ন জাতের ভেড়া বা মেষের লোম হতে পশম উৎপন্ন হয়। প্রায় ৪০ জাতের মেষ থেকে ২০০ প্রকার পশম তৈরি করা হয়। জীবন্ত মেষ থেকে লোম সরিয়ে যে পশম তৈরি করা হয় তাকে 'ফ্লিস উল' (Fleece wool) এবং মৃত বা জবাই করা মেষ থেকে যে পশম তৈরি করা হয় তাকে 'পুলড উল' (Pulled wool) বলা হয়। মানুষের চুল ও নখে যে প্রোটিন থাকে অর্থাৎ কেরাটিন (Keratin), তা দিয়ে পশম তন্তু গঠিত। পশমের মধ্যে আলপাকা, মোহেরা, কাশ্মিও, ভিকুনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

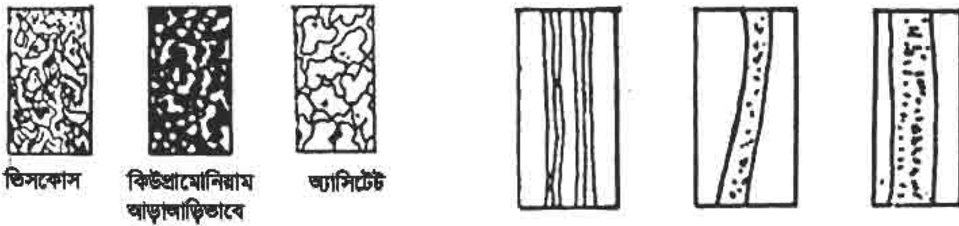
নাইলন

কৃত্রিম নন-সেলুলোজিক তন্তুর মধ্যে নাইলন সর্বপ্রধান। সাধারণত এডিপিক এসিড ও হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন নামক রাসায়নিক পদার্থের পলিমারকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাইলন তৈরি হয়। নাইলনকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়– নাইলন ৬৬ এবং নাইলন ৬।

নাইলন খুব হালকা ও শক্ত। এর স্থিতিস্থাপকতা ভিজলে দ্বিগুণ হয়। এটি আগুনে পোড়ে না, তবে গলে গিয়ে বোরাক্স বিডের (Borax Bead) মতো স্বচ্ছ বিড গঠন করে। কার্পেট, দড়ি, টায়ার, প্যারাসুটের কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুতিতে নাইলন ব্যবহৃত হয়।

রেয়ন

কৃত্রিম তন্তুর মধ্যে রেয়ন হলো প্রধান ও প্রথম তন্তু। উদ্ভিজ্জ সেলুলোজ ও প্রাণিজ্জ পদার্থ থেকে রেয়ন প্রস্তুত করা হয়। তিন প্রকারের প্রধান রেয়ন হলো (১) ভিসকোস, (২) কিউপ্রামোনিয়াম ও (৩) অ্যাসিটেট। এরা সুন্দর, উজ্জ্বল, মনোরম, অভিজাত এবং আকর্ষণীয় রূপ এবং মোটামুটি টেকসই। লঘু এসিডের সাথে তেমন কোনো বিক্রিয়া করে না কিন্তু ধাতব লবণে সহজে রেয়ন বিক্রিয়া করে। অধিক উত্তাপে রেয়ন গলে যায়। তাই রেয়ন বস্ত্রে বেশি গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যায় না।



চিত্র : ৬.২ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেয়ন তন্তুর রূপ

তন্তু হতে সুতা তৈরি

তন্তু দিয়ে কি সরাসরি কাপড় বানানো যায়? না, যায় না। এর জন্য তন্তু দিয়ে প্রথমে সুতা তৈরি করা হয়। তন্তু থেকে কোন প্রক্রিয়ায় সুতা তৈরি হবে তা নির্ভর করে তন্তুর বৈশিষ্ট্যের ওপর। একেক রকমের তন্তুর জন্য একেক রকম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। তাহলে সুতা তৈরির বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে আমরা জেনে নিই।

তন্তু সংগ্রহ

যে কোনো ধরনের সুতা তৈরির প্রথম ধাপ হলো তন্তু সংগ্রহ, যা তন্তুর উৎস অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন–তুলার বেলায় গাছ থেকে কার্পাস ফল সংগ্রহ করে বীজ থেকে তুলা আলাদা করে ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম হলো জিনিং। জিনিং প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত তন্তুকে বলে কটন লিন্ট । অনেকগুলো কটন লিন্ট একত্রে বেঁধে বেল বা গাঁইট তৈরি করা হয়। এই গাঁইট থেকেই স্পিনিং মিলে সুতা কাটা হয়।

তোমরা বলতো পাট বা পাটজাতীয় (যেমন– শণ, তিসি ইত্যাদি) গাছ থেকে কী একই পদ্ধতিতে তন্তু সংগ্রহ করা যাবে? না, যাবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে বীজ থেকে তন্তু সংগ্রহ করা হয় না। তন্তু সংগ্রহ করা হয় সরাসরি গাছ থেকে। এর জন্য গাছ কেটে প্রথমে কয়েক দিন মাঠেই একসাথে জড়ো করে রাখা হয় পাতা ঝরানোর জন্য। এতে সাধারণত ৫–৮ দিন সময় লাগে। এলাকা ভেদে জড়ো করে রাখা গাছকে চেল্লা বা পিল বলে। এভাবে জড়ো করে রাখার ফলে উদ্ভিদের পাতায় পচন ধরে, ফলে একটু ঝাঁকুনি দিলেই তা গাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। তবে খেয়াল রাখতে হয় গাছের পাতা

যেন পুরোপুরি পচে না যায়। সেক্ষেত্রে পচা পাতা গাছের গায়ের সাথে লেগে যায়, যা সরানো কষ্টসাধ্য হয়। পাতা ঝরানোর পর প্রাপ্ত গাছ একসাথে আটি বেঁধে ১০–১৫ দিন পানিতে ডুবিয়ে পচানো হয়। পচানোর কারণ জান? পচালে খুব সহজেই গাছ থেকে আঁশ বা তন্তু আলাদা করা যায়। গাছ থেকে আঁশ আলাদা করে পানিতে ধুয়ে রৌদ্রে শুকানো হয়। শুকনো আঁশ একত্রিত করে গাইট বা বেল বাঁধা হয়। তুলার মতোই এই গাঁইট বা বেল সুতা কাটার জন্য স্পিনিং মিলে নেয়া হয়।

এবার প্রাণিজ তন্তু সংগ্রহ কীভাবে করা হয় তা দেখা যাক। তোমরা আগেই জেনেছ যে, রেশমি সুতা তৈরি হয় রেশম তন্তু থেকে। এক্ষেত্রে সরাসরি সূতা উৎপাদিত হয়, অন্য কোনো প্রক্রিয়ার দরকার হয় না। কৃত্রিম তন্তুর ক্ষেত্রেও কিন্তু রেশম তন্তুর মতো সরাসরি সুতা তৈরি হয়। কিন্তু উল বা পশমি সুতার জন্য দরকারি প্রাণিজ তন্তু অর্থাৎ প্রাণিজ পশম, লোম বা চুল সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন প্রাণীর শরীর থেকে কেটে নিয়ে। এভাবে প্রাণীর দেহ থেকে লোম পশম চুল কেটে নিলে কি তাদের মারাত্মক ক্ষতি হয়? না, তন্তু কেটে নেওয়ার পর ঐ সকল প্রাণীর তেমন কোনো ক্ষতি হয় না এবং কিছু দিনের মধ্যে আবার লোম গজায় যা বড় হলে আবার কেটে তন্তু সংগ্রহ করা হয়। তাহলে এটি পরিষ্কার যে, একই পশুর গা থেকে বার বার পশম সংগ্রহ করা যায়। এভাবে সংগৃহীত পশম, লোম বা চুলকে ফ্লিস উল বলা হয়। এই ফ্লিস উল বস্তায় করে সুতা কাটার জন্য স্পিনিং মিলে আনা হয়।

সুতা কাটা (Spinning)

সুতা কাটা হয় স্পিনিং মিলে। সাধারণত একটি মিল বা কারখানায় এক ধরনের তন্তু থেকে সূতা কাটা হয়। কারণ সুতা কাটার যে বিভিন্ন ধাপ রয়েছে তা একেক ধরনের তন্তুর জন্য একেক রকম। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন তন্তু ও তা থেকে তৈরি সুতার কারখানাও আলাদা। তবে তন্তু ভেদে সুতা কাটার পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকলেও কিছু সাদৃশ্য আছে। এখন আমরা তন্তু থেকে সূতা কাটার পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জেনে নিই।

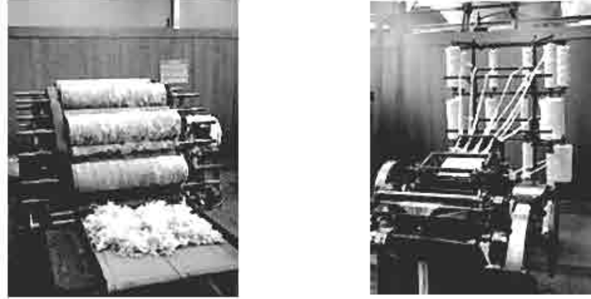
ব্লেন্ডিং এবং মিক্সিং

কারখানায় আনা তন্তুর বেল বা গাঁইট ব্লেন্ডিং রুমে নিয়ে প্রথমে খুলে ফেলা হয়। এরপর বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এক সাথে গুচ্ছাকারে থাকা তন্তুকে ভেঙে যথাসম্ভব ছোট ছোট গুচ্ছে পরিণত করা হয়। এ সময় তন্তুর সাথে থাকা ময়লার ছোট ছোট টুকরা, বীজ বা পাতার ভাঙা কোনো অংশ ইত্যাদিও দূর করা হয়। এরপর বিভিন্ন রকম তুলার মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণ তৈরি করা হয় কেন? কারণ হলো, গুণে ও মানে ঠিক একই রকম তুলা পাওয়া সব সময় সম্ভব নয়, মিশ্রণ না করলে একেক সময় একেক রকম সুতা তৈরি হবে, কখনো ভালো, কখনো মন্দ অর্থাৎ সুতার মান এক হবে না। এছাড়া বিভিন্ন রকম তুলা মিশিয়ে সুতা তৈরি করলে উৎপাদন খরচও কম হয়। আরেকটি ব্যাপার হলো, বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ এবং বাণিজ্যিকভাবে তুলার উৎপাদন হয় না বললেই চলে। বেশির ভাগ তুলাই আমদানিনির্ভর। আর তুলা আমদানি করা হয় বিভিন্ন দেশ থেকে। একেক দেশের তুলার মানও একেক রকম হয়। একই রকম তুলার যোগান পাওয়া বাস্তবে অসম্ভব। এজন্য বিভিন্ন রকম তুলা সংগ্রহ করেই মিশ্রণ তৈরি করা হয়। বেল বা গাঁইট থেকে তুলার এই মিশ্রণ তৈরিই হলো ব্লেন্ডিং এবং মিক্সিং। তবে পাট তন্তুর বেলায় এই প্রক্রিয়াকে ব্যাচিং (Batching) বলে।

কার্ডিং এবং কম্বিং (Carding & Combing)

সুতা কাটার দ্বিতীয় ধাপ হলো কার্ডিং এবং কম্বিং। তুলা, লিনেন, পশম এসব তন্তুর বেলায় এই ধাপটি প্রয়োগ করা হয়। তন্তুর বৈশিষ্ট্য ও দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কার্ডিং এবং কম্বিং –এর কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র ঠিক করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহার অনুপযোগী অতি ছোট তন্তু বাদ দেওয়া হয় এবং ধুলাবালি বা ময়লার কণা থাকলে তাও দূরীভূত হয়। কোনো কোনো

ক্ষেত্রে শুধু কার্ডিং করলেই চলে। তবে মিহি মসৃণ ও সরু সুতা তৈরি করতে কম্বিং দরকার হয়। লিনেন তন্তুর জন্য বিশেষ ধরনের কম্বিং করা হয়, যা হেলকিং নামে পরিচিত। হেলকিং করলে সুতা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও মিহি হয়।

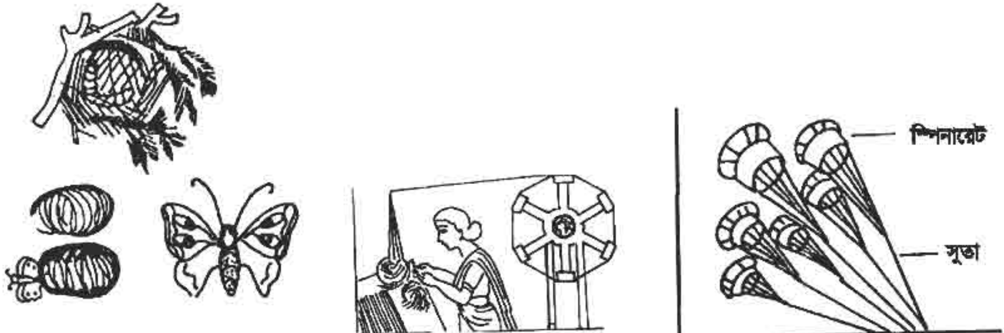


চিত্র : ৬.৩ স্পিনিং মিলে সুতা তৈরি

কার্ডিং ও কম্বিং করে প্রাপ্ত তন্তু পাতলা আস্তরের মতো হয় এবং এটিকে স্লাইভার (Sliver) বলে। এ স্লাইভার পাকালেই সুতা তৈরি হয়। পাকানোই হলো মূলত স্পিনিং। এ পর্যায়ে স্লাইভারকে টেনে ক্রমশ অধিকতর সরু করা হয়। একসময় স্লাইভারের শেষ প্রান্তে মাত্র কয়েক গোছা তন্তু বিদ্যমান থাকে। এভাবে পরিবর্তিত স্লাইভারকে মোচড়ানো বা পাকানো হয়। স্লাইভারকে টেনে সরু করার প্রক্রিয়া হলো রোডিং আর টুইস্টিং (Twisting)। স্লাইভারকে মোচড় দেওয়ার ফলে তন্তুগুলো একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে যায় এবং সুতায় পরিণত হয়। মোচড় কম-বেশি করে সুতা শক্ত বা নরম করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই মোচড় বেশি দিলে সুতা বেশি শক্ত হয়, তবে মোচড় অতিরিক্ত হলে সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে। মোচড়ের পরিমাণ নির্ভর করে মূল তন্তুর বৈশিষ্ট্যের উপর। সাধারণত লম্বা তন্তুর বেলায় (যেমন- পাট বা লিনেন) তুলনামূলকভাবে বেশি মোচড় লাগে। টুইস্ট কাউন্টার (Twist Counter) নামক একধরনের যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজ করা হয়।

রেশম তন্তু থেকে রেশম সুতা তৈরি

রেশম পোকা থেকে তৈরি হয় একধরনের গুটি। একে কোকুনও (cocoon) বলে। পরিণত কোকুন বা গুটি সাবান পানিতে লোহার কড়াইয়ে সেদ্ধ করা হয়। এতে কোকুন নরম হয়ে যায় এবং ওপর থেকে খোসা খুব সহজেই আলাদা হয়ে যায়। খোসা উঠে গেলে তন্তুর প্রান্ত বা নাল পাওয়া যায়। এই নাল ধরে আস্তে আস্তে টানলে লম্বা সুতা বের হয়ে আসে। চিকন বা মিহি সুতার জন্য ৫-৭টি কোকুনের নাল আর মোটা সুতার জন্য ১৫-২০টি কোকুনের নাল একত্রে করে টানা হয়। এ কাজে চরকা ব্যবহার করা হয়। চিত্রে চরকার সাহায্যে কোকুন থেকে সুতা তৈরি দেখানো হয়েছে। নালগুলো একত্রিত করলে এদের গায়ে লেগে থাকা আঠার কারণে একটি আরেকটির সাথে লেগে যায় ও সুতার গোছা তৈরি হয়।



চিত্র : ৬.৪ রেশম তন্তু থেকে সুতা তৈরি

কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা তৈরি

কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা তৈরির পদ্ধতি প্রায় সব তন্তুর ক্ষেত্রে একই রকম। একের অধিক ক্ষুদ্র আঁশ ও উপযুক্ত দ্রাবকের সাহায্যে ঘন ও আঠালো দ্রবণ তৈরি করা হয়। এই দ্রবণ হলো স্পিনিং দ্রবণ। এই স্পিনিং দ্রবণকে স্পিনারেট (চিত্রে) নামক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে উচ্চ চাপে প্রবাহিত করা হয়। দ্রবণকে জমাট বাধানোর জন্য এর সাথে প্রবাহপথে উপযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এতে স্পিনারেট থেকে সুতার দীর্ঘ নাল বের হয়ে আসে যা সরাসরি ব্যবহারযোগ্য। এই সুতা কাপড় তৈরি বা বয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার সুতার বৈশিষ্ট্য : সুতার বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তন্তুর উপর। সব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সুতার বৈশিষ্ট্য তন্তুর বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। তোমরা ইতিমধ্যেই তন্তুর বৈশিষ্ট্য জেনেছ, তাই নিশ্চই বুঝতে পারছ সুতার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে।

রাবার ও প্লাস্টিক

তোমরা পেনসিলের লেখা মোছার জন্য যে ইরেজার ব্যবহার করো, তা কী ধরনের বস্তু জান?

এটি হলো রাবার। সাইকেল, রিক্সা বা অন্যান্য গাড়ির টায়ার, টিউব, জন্মদিনে ব্যবহৃত বেলুন–এসবই রাবার। পানির পাইপ, সার্জিক্যাল মোজা, কনভেয়ার বেল্ট, রাবার ব্যান্ড, বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর নিপল–এসবই রাবারের তৈরি সামগ্রী। তাহলে দেখা যাচ্ছে, রাবার ও রাবারজাত পণ্যসামগ্রী আমাদের জীবনের অনেক কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখন রাবারের ধর্ম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

রাবারের ভৌত ধর্ম

প্রাকৃতিক রাবার পানিতে অদ্রবণীয় একটি অদানাদার কঠিন পদার্থ। রাবার কিছু কিছু জৈব দ্রাবক যেমন– এসিটোন, মিথানল ইত্যাদিতে অদ্রবণীয় হলেও টারপেন্টাইন, পেট্রোল, ইথার, বেনজিন ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। রাবার সাধারণত সাদা বা হালকা বাদামি রঙের হয়। রাবার একটি স্থিতিস্থাপক পদার্থ অর্থাৎ একে টানলে লম্বা হয় ও ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে যায়। বেশিরভাগ রাবারই তাপ সংবেদনশীল অর্থাৎ তাপ দিলে গলে যায়। বিশুদ্ধ রাবার বিদ্যুৎ ও তাপ কুপরিবাহী। তবে ইদানীং বিশেষভাবে তৈরি বিদ্যুৎ পরিবাহী রাবার বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন।

রাবারের রাসায়নিক ধর্ম

- তোমরা জান, প্রায় প্রতিটি পদার্থ তাপ দিলে আয়তনে বাড়ে। কিন্তু রাবারের বেলায় ঠিক উল্টোটি ঘটে অর্থাৎ তাপ দিলে রাবারের আয়তন কমে যায়।
- রাবারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক ধর্ম হলো, এটি বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যেমন– দুর্বল ক্ষার, এসিড, পানি ইত্যাদির সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। যে কারণে প্রলেপ দেওয়ার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

তোমরা কি খেয়াল করে দেখেছ, রাবার দীর্ঘদিন রেখে দিলে কী ঘটে? ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। এর কারণ হলো, রাবার বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। অক্সিজেন ছাড়াও আরও কিছু রাসায়নিক পদার্থ, বিশেষ করে ওজোন (O_3) প্রাকৃতিক রাবারের সাথে বিক্রিয়া করে, ফলে রাবার ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

প্লাস্টিক

প্লাস্টিক শব্দের অর্থ হলো সহজে ছাঁচযোগ্য। নরম অবস্থায় প্লাস্টিক দিয়ে ইচ্ছামতো ছাঁচে ফেলে নির্দিষ্ট আকার–

আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থ তৈরি করা যায়। আমরা বাসাবাড়িতে নানা রকম প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহার করছি। মগ, বালতি, জগ, মেলামাইনের থালা–বাসন, পিভিসি পাইপ, বাচ্চাদের খেলনা, গাড়ির সিটকেল্ট, এমনকি আসাবাবপত্র সবকিছুই কিন্তু প্লাস্টিক। তোমরা এও জান যে এগুলো সবই পলিমার পদার্থ। এখন প্লাস্টিকের ধর্ম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

ভৌত ধর্ম

তোমরা বলতো প্লাস্টিক কি পানিতে দ্রবীভূত হয়? না, হয় না। বেশির ভাগ প্লাস্টিকই পানিতে অদ্রবণীয়। প্লাস্টিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হলো এরা বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবহন করে না। তাই বিদ্যুৎ ও তাপ নিরোধক হিসেবে এদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। প্লাস্টিকের সবচেয়ে বড় ধর্ম হলো গলিত অবস্থায় এদেরকে যে কোনো আকার দেওয়া যায়। এই সুবিধার কারণেই এটি নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। তাপ দিলে প্লাস্টিকে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে? পলিথিন, পিভিসি পাইপ, পলিস্টার কাপড়, বাচ্চাদের খেলনা এসব প্লাস্টিক তাপ দিলে নরম হয়ে যায় এবং গলিত প্লাস্টিক ঠান্ডা করলে শক্ত হয়ে যায়। এভাবে যতবারই এদেরকে তাপ দেওয়া যায়, এরা নরম হয় ও ঠান্ডা করলে শক্ত হয়। এদেরকে থার্মোপ্লাস্টিকস (Thermoplastics) বলে। পক্ষান্তরে মেলামাইন, বাকেলাইট (যা ফ্রাইং প্যানের হাতলে এবং বৈদ্যুতিক সকেটে ব্যবহার করা হয়) এগুলো তাপ দিলে নরম হয় না বরং পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। এদেরকে একবারের বেশি ছাঁচে ফেলে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায় না। এই সকল প্লাস্টিককে থার্মোসেটিং প্লাস্টিকস (Thermosetting Plastics) বলে।

রাসায়নিক ধর্ম

বেশির ভাগ প্লাস্টিক রাসায়নিকভাবে অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। তাই বাতাসের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে না এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এমনকি পাতলা এসিড বা ক্ষারের সাথেও বিক্রিয়া করে না। তবে শক্তিশালী ও ঘনমাত্রার এসিডে কিছু কিছু প্লাস্টিক দ্রবীভূত হয়। প্লাস্টিক সাধারণত দাহ্য হয় অর্থাৎ এদেরকে আগুন ধরালে পুড়তে থাকে ও প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন করে।

প্লাস্টিক কি পচনশীল? না, পচনশীল নয়। দীর্ঘদিন মাটি বা পানিতে পড়ে থাকলেও এরা পচে না। অবশ্য ইদানীং বিজ্ঞানীরা পচনশীল প্লাস্টিক আবিষ্কার করেছেন, যা বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়। হাত–পা কেটে গেলে বা মেডিক্যাল অপারেশনের পড়ে সেলাইয়ের কাজে যে সুতা ব্যবহৃত তা এক ধরনের পচনশীল প্লাস্টিক।

প্লাস্টিক পোড়ালে অনেক ক্ষতিকর পদার্থ তৈরি হয়। যেমন– পিভিসি পোড়ালে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) নিঃসৃত হয়। আবার পলিইউরেথেন (Polyurethane) প্লাস্টিক (যা আসবাবপত্র, যেমন– চেয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়) পোড়ালে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস ও হাইড্রোজেন সায়ানাইড তৈরি হয়।

পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় রাবার ও প্লাস্টিক

তোমরা জেনেছ যে বেশির ভাগ প্লাস্টিক এবং কৃত্রিম রাবার পচনশীল নয়। এর ফলে পুনঃব্যবহার না করে বর্জ্য হিসেবে অপসারণ করলে এগুলো পরিবেশে জমা হতে থাকে এবং নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তোমরা কি খেয়াল করে দেখেছ ঢাকা বা অন্যান্য শহরের বেশির ভাগ নর্দমার নালায় প্রচুর প্লাস্টিক বা রাবার জাতীয় জিনিস পড়ে থাকে? এগুলো জমতে জমতে একপর্যায়ে নালা বন্ধ হয়ে যায় ও নর্দমার নালায় পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেখা যায়, সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই রাস্তায় পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, যা পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা নষ্ট করে। একই ভাবে প্লাস্টিক ও বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থাপনা না করায় এর বড় একটি অংশ নদ–নদী, হ্রদ বা জলাশয়ে

গিয়ে পড়ে। এভাবে জমতে থাকলে একসময় নদীর গভীরতা কমে যায়, যা নাব্যতার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আবার ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বা রাবারের বর্জ্য অনেক সময় মাটিতে থাকলে তা মাটির উর্বরতা নষ্ট করতে পারে। ফেলে দেওয়া এসব বর্জ্য অনেক সময় গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুর খাবারের সাথে মিশে পাকস্থলীতে যায় এবং এক পর্যায়ে তা মাংস ও চর্বিতে জমতে থাকে। এমনকি নদ–নদী, খাল–বিলে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক/রাবার বর্জ্য খাবার গ্রহণের সময় মাছের দেহেও প্রবেশ করতে পারে ও জমা হতে থাকে। আর আমরা মাছ, মাংস খেলে শেষ পর্যন্ত তা আমাদের দেহে প্রবেশ করে, যা ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাহলে এটি স্পষ্ট যে, প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী সঠিক ব্যবস্থাপনা না করলে তা মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। তাই প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী যতবার সম্ভব নিজেরা পুনরায় ব্যবহার করতে হবে ও অন্যদের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়লে যেখানে–সেখানে ফেলে না দিয়ে একসাথে জড়ো করে রাখতে হবে। এভাবে জড়ো করা সামগ্রী বিক্রিও করা যায়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হওয়া যায়। বিক্রি করার সুযোগ না থাকলে এটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ : ১

তাপ প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকার সুতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : সিল্ক, উল, সুতি কাপড়, পলিস্টার কাপড়, নাইলন ইত্যাদি কাপড় বা সুতা, একটি মোমবাতি ও দিয়াশলাই।

পদ্ধতি : দিয়াশলাই দিয়ে মোমবাতি জ্বালাও। এবার একে একে কাপড় বা সুতা নিয়ে পুড়িয়ে দেখ কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে। সুতি কাপড়ের বেলায় কী ঘটল? কাপড় খুব দ্রুত পুড়ে গেল। কোনো গন্ধ পাওয়া গেল কি? হ্যাঁ, কাগজ পোড়ালে যে রকম গন্ধ পাওয়া যায়, অনেকটা সে রকম গন্ধ পাওয়া গেল। কারণ হলো, কাগজে যেমন সেলুলোজ থাকে, তুলা দিয়ে তৈরি সুতি কাপড়েও তা থাকে। আর সে কারণেই একই রকম গন্ধ পাওয়া যায়। নাইলন পুড়িয়ে কী দেখলে? সুতি কাপড়ের মতো এটিও কি দ্রুত পুড়ে গেল? না, অতটা দ্রুত পুড়ল না, ধীরে ধীরে পুড়ল। পোড়া শেষে একটি গুটির মতো তৈরি হলো যা সুতি কাপড়ের বেলায় হয়নি। আবার কাগজ পোড়ানোর মতো গন্ধও পাওয়া গেল না, কারণ নাইলন সেলুলোজ থেকে তৈরি হয় না। এভাবে তোমরা সবগুলো কাপড় ও সুতার বৈশিষ্ট্য টেবিল করে খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

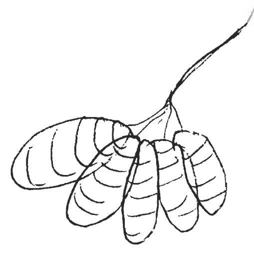
অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ধরনের তন্তুর জন্য হেলকিং করা প্রয়োজন?

ক. পাট খ. পশম

গ. রেশম ঘ. লিনেন



২. ওপরের চিত্রে উৎপাদিত তন্তুটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি–

i. বেশ মিহি

ii. খুব সস্তা

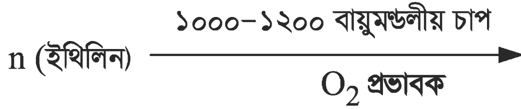
iii. দ্রুত গরম হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের রেখাচিত্রটি থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র- A



চিত্র- B

৩. B চিত্রে উৎপাদিত দ্রব্যটি কী?

ক. রেজিন   খ. পলিথিন

গ. মেলামাইন   ঘ. অ্যাসবেস্টস

৪. B চিত্রে উৎপাদিত দ্রব্যটির সাথে কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. সিল্কের   খ. পশমের

গ. উলের   ঘ. পলিস্টারের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরজু জানুয়ারি মাসের এক সকালে স্কুলে যাচ্ছিল। শীত নিবারণের জন্য সে একটি সুতি শার্টের উপর আর একটি সুতি শার্ট পড়ল। সে লক্ষ করল তাতেও তার বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। কিন্তু তার মনে হলো তিন মাস আগে সে যখন শুধুমাত্র একটি শার্ট পরেই স্কুলে যেত তখন এ ধরনের কোন সমস্যা হতো না।

ক. নন সেলুলোজিক তন্তু কাকে বলে?

খ. লিলেনকে কেন প্রাকৃতিক তন্তু বলা হয়?

গ. আরজুর কোন ধরনের কাপড় পরা দরকার ছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. একই কাপড়ে দুই সময় দুই ধরনের অনুভূতি লাগার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. মিলন সাহেবের একটি পিভিসি পাইপ তৈরির কারখানা আছে। তিনি ইমন ও মামুনকে কাঁচামাল সরবরাহ করতে বললেন। ইমন যে কাঁচামাল সরবরাহ করল সেটি স্থিতিস্থাপক এবং অক্সিজেন ও জলীয়বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে। আবার মামুনের সরবরাহকৃত কাঁচামালের ভৌত গুণ হচ্ছে গলিত অবস্থায় এটিকে যে কোনো আকার দেওয়া যায়। রাসায়নিকভাবে এটি নিষ্ক্রিয়। তবে দুটি কাঁচামালই মাটিতে অপচনশীল।

ক. মনোমার কী?

খ. মেলামাইনকে কেন পলিমার বলা হয়?

গ. ইমন ও মামুনের সরবরাহকৃত কাঁচামালগুলো কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পিভিসি পাইপ তৈরিতে মিলন সাহেবের কোন কাঁচামালটি ব্যবহার করা উচিত বলে তুমি মনে কর?

সপ্তম অধ্যায়

অম্ল, ক্ষারক ও লবণের ব্যবহার

অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা অম্ল, ক্ষার ও লবণ কী ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তা জেনেছ। তোমাদের কি এদের কিছু বৈশিষ্ট্য মনে আছে? এই অধ্যায়ে অম্ল, ক্ষার ও লবণের নানাবিধ ব্যবহার সম্পর্কে তোমরা জানবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- শক্তিশালী ও দুর্বল এসিডের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে এসিডের ব্যবহার এবং সাবধানতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এসিড অপব্যবহারের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নির্দেশক ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব চিহ্নিত করতে পারবে (লিটমাস, পূর্বের শ্রেণিতে তৈরিকৃত ফুল, সবজির নির্যাসের সাহায্যে)।
- পাকস্থলীতে এসিডিটির কারণ এবং সঠিক খাদ্য নির্বাচন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পদার্থের pH- এর মান জানার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্ষারকের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষারের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহারে সাবধানতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লবণের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে লবণের প্রয়োজীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার লবণ তৈরি করতে পারব। (ধাতু+এসিড, ধাতুর অক্সাইড+এসিড)
- আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অম্ল, ক্ষার ও লবণের অবদানকে প্রশংসা করব।

শক্তিশালী ও দুর্বল এসিড

অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা বেশ কিছু জৈব এসিডের নাম জেনেছ। তোমরা এটাও জান যে এসিডসমূহ পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে। তবে মজার ব্যাপার হলো, কিছু কিছু এসিড বিশেষ করে জৈব এসিডসমূহ পানিতে পুরোপুরিভাবে বিয়োজিত না হয়ে আংশিকভাবে বিয়োজিত হয় অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অণু থাকে তার সবগুলো হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে না। এই এসিডসমূহকে দুর্বল এসিড বলা হয়।

পক্ষান্তরে, খনিজ এসিডসমূহ পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে। অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অণু থাকে তার সবগুলোই বিয়োজিত হয়।

দুর্বল এসিড	শক্তিশালী এসিড
এসিটিক এসিড (CH_3COOH)	সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4)
সাইট্রিক এসিড ($C_6H_8O_7$)	নাইট্রিক এসিড (HNO_3)
অক্সালিক এসিড (HOOC-COOH)	হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl)

তবে কিছু এসিড আছে যেমন– কার্বোনিক এসিড (H_2CO_3), যা জৈব এসিড না হলেও দুর্বল এসিড।

প্রাত্যহিক জীবনে এসিডের ব্যবহার ও সাবধানতা

তোমরা কি জান, বোলতা বা বিচ্ছু হুল ফুটালে প্রচণ্ড জ্বালা করে কেন? এর কারণ হলো বোলতা ও বিচ্ছুর হুলে থাকে হিস্টামিন (Histamine) নামক ক্ষারক পদার্থ। তাই এসব ক্ষেত্রে জ্বালা নিবারণের জন্য যে মলম ব্যবহার করা হয়, তাতে থাকে ভিনেগার অথবা বেকিং সোডা, যেগুলো এসিড। এরা ঐ ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষারককে নিষ্ক্রিয় করে; ফলে জ্বালা আর থাকে না।

আবার আমরা প্রায় সবাই সাধারণত মাংস, পোলাও, বিরিয়ানি ইত্যাদি খাবার খাওয়ার পর পেপসি, স্প্রাইট বা কোকাকোলা জাতীয় কোমল পানীয় পান করি। এটা কি আমাদের কোনো কাজে আসে? আসলে খাবার হজম করার জন্য আমাদের পাকস্থলীতে নির্দিষ্ট মাত্রায় হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন হয়। এই মাত্রার হেরফের হলে আমাদের পরিপাকে অসুবিধা হয়।

অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে লেবু, কমলা, আপেল, পেয়ারা, আমলকী, কামরাঙ্গা ইত্যাদি নানা রকম ফলে আছে নানা রকমের জৈব এসিড, যেগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আবার কিছু কিছু এসিড আছে, যারা রোগ প্রতিরোধও করে। যেমন– ভিটামিন সি বা এসকরবিক এসিড। তোমরা কি জান, ভিটামিন সি ক্ষত সারাতে খুবই সহায়ক হিসেবে কাজ করে এবং আমাদের শরীরে এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়?

আম, জলপাই ইত্যাদি নানা রকম আচার সংরক্ষণে কী এসিড ব্যবহার করা হয় তোমরা জান? এটি হলো ভিনেগার বা এসিটিক এসিড (CH_3COOH)। বিয়ে বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার পর বোরহানি বা দই খেলে কোনো লাভ হয় কি? হ্যাঁ, কোমল পানীয়ের মতো বোরহানি বা দই খেলে এতে বিদ্যমান ল্যাকটিক এসিড হজমে সহায়তা করে।

তোমরা কি জান, কেক, বিস্কুট বা পাউরুটি ফোলানো হয় কীভাবে? এটি করা হয় বেকিং সোডা ব্যবহার করে। তাপ দিলে বেকিং সোডা ভেঙে কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়, যা কেক বা পাউরুটিকে ফুলিয়ে তোলে।

আমরা টয়লেট পরিষ্কার করার জন্য যেসব পরিষ্কারক ব্যবহার করি, তার মূল উপাদান কী তোমরা জান? এর মূল উপাদান হলো শক্তিশালী এসিড, যেমন– HCl, HNO_3, H_2SO_4।

আবার সৌর বিদ্যুৎ তৈরির জন্য সৌর প্যানেলের জন্য বা বাসাবাড়িতে আইপিএস (IPS) চালানোর জন্য বা গাড়িতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, তাতে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো সালফিউরিক এসিড।

তোমরা জান যে ফসল উৎপাদনের জন্য সার হলো অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। সার হিসেবে আমরা যেগুলো ব্যবহার করি তার অন্যতম হলো অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3), অ্যামোনিয়াম সালফেট [$(NH_4)_2SO_4$] ও অ্যামোনিয়াম ফসফেট [$(NH_4)_3PO_4$], আর সার কারখানায় এদেরকে তৈরি করা হয় যথাক্রমে নাইট্রিক এসিড (HNO_3), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ও ফসফরিক এসিড [$H_3(PO_4)$] থেকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নানা রকম এসিড। তাই আমাদের জীবনে এসিডের ভূমিকা অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। তবে কিছু কিছু এসিড, বিশেষ করে শক্তিশালী এসিডসমূহ (যেমন– H_2SO_4, HNO_3, HCl) মানবদেহের জন্য যেমন মারাত্মক ক্ষতিকর, তেমনি আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রেরও ক্ষয় সাধন করে। আমাদের শরীরে কোথাও লাগলে সেই স্থান পুড়ে যায় ও

ক্ষত সৃষ্টি করে। তোমরা হয়তো এসিড ছুড়লে মানুষের শরীর কীভাবে ঝলসে যায় তা পত্রিকায় বা টেলিভিশনে দেখেছ। অন্যদিকে কাপড়ে লাগলে কাপড়ও পুড়ে যায় ও ছিদ্র হয়ে যায়। একইভাবে ধাতব পদার্থসমূহ এসিডের সংস্পর্শে আসলে তাও ক্ষয় হয়ে যায়। অতএব এসিডের ব্যবহারে আমাদের খুবই সাবধান হতে হবে। কোন কারনে গায়ে এসিড পড়লে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

এসিডের অপব্যবহার, আইনকানুন ও সামাজিক প্রভাব

আমাদের সমাজের কিছু দুষ্টু চরিত্রের মানুষ এসিডকে মানুষের শরীরে ছুড়ে মেরে একদিকে যেমন মারাত্মক অপরাধ করছে, অন্যদিকে তেমনি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ–এসিডের অপব্যবহার করছে। এসিড ছুড়ে মারার ফলে মানুষের শরীর সম্পূর্ণ ঝলসে যায়। ফলে মুখমন্ডলে এসিড ছুড়লে তা বিকৃত আকার ধারণ করে। এ কারণে এসিড–সন্ত্রাসের যারা শিকার হন (যারা সাধারণত নারী), তারা বিকৃত চেহারা নিয়ে জনসম্মুখে আসতে চায় না, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা এসিড সন্ত্রাসের শিকার হন, তাদের বেশির ভাগই স্কুল কলেজের ছাত্রী বা গৃহবধু। ফলে দেখা যাচ্ছে, যে এসিড–সন্ত্রাসের কারণে অনেক সম্ভাবনাময় ও মেধাবী ছাত্রীদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে গৃহবধূরা এর শিকার হলে একটি পরিবারে নেমে আসছে দুর্বিসহ জীবন। তাই এসিড–সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে এবং মানুষকেও সচেতন করতে হবে।

এসিড ছুড়লে শাস্তি : এসিড ছোড়া একটি মারাত্মক অপরাধ। বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী এসিড ছোড়ার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড থেকে মৃত্যুদন্ড হতে পারে। এসিড যে ছোড়ে, সে একদিকে যেমন অন্যের ক্ষতিসাধন করছে, অন্যদিকে নিজেও শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারছে না। তাই আমাদের সব মানুষকে এসিড ছোড়ার ভয়াবহতার কথা বোঝাতে হবে। বাংলাদেশের অনেক এলাকা আছে, যেখানে কয়েকটি গ্রামজুড়ে হয়তো একজন ভালো ছাত্রীর সন্ধান পাওয়া যাবে। ঐ ছাত্রীটি এসিড–সন্ত্রাসের শিকার হলে তা মূলত ঐ অঞ্চলের জন্য অর্থাৎ দেশের জন্যই এক অপূরণীয় ক্ষতি।

নির্দেশক ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব শনাক্তকরণ

আগের শ্রেণিতে তোমরা বেশ কয়েকটি ফুলের নির্যাস তৈরি করেছ এবং এদেরকে নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করে এসিড ও ক্ষারক শনাক্ত করেছ। এখন এসব নির্দেশক দিয়ে আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কিছু জিনিসের অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব দেখে নেওয়া যাক।

নিজেরা কর : ৭.১

কাজ : মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব দেখা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বিকার, কিছু মাটি, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, ফুলের নির্যাস, নাড়ানি, পানি, চিমটা।

পদ্ধতি : বিকারে মাটি নিয়ে (১০০ গ্রাম) ১০–২০ মিলিলিটার পানি যোগ করো। নাড়ানি দিয়ে খুব ভালোভাবে নাড়া দাও। চিমটা দিয়ে প্রথমে নীল লিটমাস কাগজ বিকারের মিশ্রণে ডুবাও। কিছু সময় অপেক্ষা কর। তলানি জমা হলে লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন খাতায় লিখে রাখ। এবার তোমরা আগের শ্রেণির তৈরি করা নির্যাস একে একে টেস্টটিউবে বিকারের মিশ্রণে যোগ করে দেখ নির্যাসের রং কিভাবে পরিবর্তন হয়।

মাটি অম্লীয়, ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ তিন রকমেরই হতে পারে এবং এটি মূলত নির্ভর করে এতে কী ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান তার উপর।

নিজেরা কর : ৭.২

কাজ : টুথপেস্টের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব দেখা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : টুথপেস্টে, লিটমাস কাগজ, বিকার, ফুলের নির্যাস, নাড়ানি, পানি, চিমটা।

পদ্ধতি : বিকারে ৪–৫ গ্রাম টুথপেস্ট নাও। ৫–১০ সিসি বিশুদ্ধ পানি যোগ করে ভালোভাবে নাড়ানি দিয়ে নাড়া দাও। মিশ্রণটি কিছুক্ষণ রেখে দাও। এবার চিমটা দিয়ে প্রথমে নীল লিটমাস কাগজ বিকারের মিশ্রণে ডুবাও এসব এর বর্ণ পরিবর্তন লক্ষ কর। একইভাবে লাল লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে বর্ণ পরিবর্তন লক্ষ কর। তোমরা কী দেখতে পেলে? লাল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে নীল হলো আর নীল লিটমাসের কোনো পরিবর্তন হলো না। অর্থাৎ টুথপেস্ট হলো ক্ষারীয় পদার্থ। এবার একটি টেস্টটিউবে টুথপেস্টের ১–২ মিলিলিটার পরিমাণ নিয়ে তাতে একে একে সবজি ও ফুলের নির্যাস যোগ করে দেখ কী ধরনের বর্ণ পরিবর্তন হয়।

নিজেরা কর: ৭.৩

কাজ : বিভিন্ন রকম পানীয় ও ফলের রসের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব শনাক্তকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : নানা রকম পানীয় (কোকা কোলা, স্প্রাইট, সেভেন আপ, ফানটা ইত্যাদি) ও ফলের জুস (আম, লিচু, কমলা ইত্যাদি), বিকার, লিটমাস কাগজ, ফুলের নির্যাস।

পদ্ধতি : বিকারে একে একে পানীয় নাও এবং লাল ও নীল লিটমাস কাগজ ডুবাও। কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করলে? লাল লিটমাস কাগজের রঙে কোনো পরিবর্তন হলো না, কিন্তু নীল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে লাল হয়ে গেল। এ থেকে কী বুঝা গেল? আমরা সচারচর যে সব পানীয় ও ফলের রস পান করে থাকি, সেগুলো অম্লীয় পদার্থ। এবার প্রতিটি পানীয় ও ফলের রসে তোমাদের আগের তৈরি ফুলের নির্যাস একে একে যোগ করে দেখ কী ধরনের রং পরিবর্তন হয়।

পাকস্থলীতে এসিডিটির কারণ ও সঠিক খাদ্য নির্বাচন

তোমরা জান, পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য আমাদের হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন হয়। আর কোনো কারণে যদি এই এসিডের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন ঐ অবস্থাকেই আমরা পাকস্থলীর এসিডিটি বলি। এখন প্রশ্ন হলো, কখন এবং কী কী কারণে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়? নানাবিধ কারণে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে, যার মধ্যে অন্যতম হলো খাদ্যদ্রব্য। তোমরা নিজেরা কর ৭.৩ এ দেখেছ যে আমরা যেসব পানীয় ও ফলের রস পান করি, তার প্রায় সবই অম্লীয়। কাজেই এসব পানীয় বেশি মাত্রায় পান করলে বা খালি পেটে পান করলে তা এসিডিটি সৃষ্টি করে। অন্যান্য পানীয় বিশেষ করে চা, কফি বা মদজাতীয় পানীয়সমূহও পাকস্থলীতে এসিডিটি বাড়ায়। বেশি ভাজা, তেলযুক্ত ও চর্বি জাতীয় খাবারও পাকস্থলীতে এসিডিটি বাড়িয়ে দেয়। আমেরিকার স্বাস্থ্য

অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী পেয়াজ, রসুন, মরিচ ও অন্যান্য অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার, চকলেট–এগুলোও এসিডিটি তৈরির কারণ।

খাদ্য ছাড়াও আরো কিছু কারণে এসিডিটি বেড়ে যেতে পারে। এর মধ্যে একটি হলো দুশ্চিন্তা, নিয়মিত সময়মতো খাবার না খাওয়া, এমনকি প্রয়োজনমাফিক ঘুম না হলেও এসিডিটি হতে পারে। আবার কখনো কখনো ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণও এসিডিটির কারণ হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করে এসিডিটির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়?

প্রথমত: যেসব খাদ্যদ্রব্য বা পানীয়ের কারণে এসিডিটি হয়, সেগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ না করে পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সাময়িকভাবে ঐ সব খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত: বেশ কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে যেগুলো কিছুটা ক্ষার ধর্মী এবং ফলে এসিডিটি নিষ্ক্রিয় করতে পারে। ঐ সব খাদ্য গ্রহণ করে আমরা এসিডিটির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। এসব খাদ্যের মধ্যে রয়েছে বেশির ভাগ শাকসব্জি। যেমন– ব্রুকলি, পুঁইশাক, পালংশাক, গাজর, শিম, বীট, লেটুসপাতা, এ্যাসপারাগাস, মাশরুম, ভুট্টা, আলু, ফুলকপি ইত্যাদি।

আবার কিছু কিছু খাদ্যশস্য আছে (যেমন– ডাল, দেয়া ধান, মিষ্টি ভুট্টা), যারা এসিডিটি কমাতে সাহায্য করে। দুধ জাতীয় খাবারের মধ্যে সয়া মাখন, ছাগলের দুধ থেকে তৈরি করা মাখন, সয়া দুধ, বাদাম দুধ, এগুলোও ক্ষার ধর্মী, যা এসিডিটি নষ্ট করতে পারে।

নানা রকমের বাদাম, হারবাল চা, সবুজ চা, আদা চা খেয়েও অতিরিক্ত এসিড কমানো যায়।

pH এর মান জানার প্রয়োজনীয়তা

তোমরা জান, কোনো একটি পদার্থ এসিড, ক্ষার না নিরপেক্ষ তা নির্দেশক ব্যবহার করে জানা যায়। কিন্তু তাতে কী পরিমাণ এসিড বা ক্ষার আছে তা কীভাবে বুঝা যাবে? সেটি বুঝা যায় pH এর মান পরিমাপ করে। তাহলে এই pH কী তা জেনে নিই। কোনো একটি জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার নেগেটিভ লগারিদমকে pH বলে।

এখন কথা হলো, pH-এর মানের সাথে কীভাবে অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের তারতম্য ঘটে?

নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণ বা বিশুদ্ধ পানি যেখানে কোনো এসিড বা ক্ষার থাকে না, তার pH হয় ৭। আর যদি এতে এসিড যোগ করা হয় তাহলে pH-এর মান কমে যায়। যত বেশি এসিড যোগ করা যায়, pH-এর মান ততই কমে যায়। পক্ষান্তরে যদি বিশুদ্ধ পানি বা নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণে ক্ষার যোগ করা হয়, তাহলে এর pH বাড়তে থাকে। যত বেশি ক্ষার যোগ করা হয়, pH-এর মান ততই বাড়তে থাকে।

সুতরাং বলা যায়–

কোনো দ্রবণের $pH = 7$ হলে তা নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণ বা বিশুদ্ধ পানি হবে।

কোনো দ্রবণের $pH < 7$ হলে তা অম্লীয় বা এসিডীয় দ্রবণ হবে।

কোনো দ্রবণের $pH > 7$ হলে তা ক্ষারীয় দ্রবণ হবে।

মানবদেহ থেকে শুরু করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এমনকি

রাসায়নিক শিল্পে pH-এর মান জানা ও নিয়ন্ত্রণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তোমরা কি জান আমাদের ধমনির রক্তের pH কত? আমাদের ধমনির রক্তের pH হলো প্রায় ৭.৪। এর সামান্য হেরফের হলে (~ ০.৪) মারাত্মক বিপর্যয়, এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। আবার আমাদের জিহবার লালার pH ৬.৬–এর কাছাকাছি থাকলে তখন তা সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। আবার আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য দরকারি pH হলো ২। এই মান ০.৫–এর মতো হেরফের হলেই তা বদহজম সৃষ্টি করে। আমাদের প্রস্রাবের pH ৭–এর কম থাকা স্বাভাবিক।

মাটির pH সাধারণত ৪–৮ হয়ে থাকে। মাটির pH ৩–এর কম অর্থাৎ অম্লীয়(Acidic) হলে মাটির অনেক দরকারি উপাদান যেমন– ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) মাটি থেকে চলে যায়। ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। এসিডিক মাটির জন্য ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত সার ব্যবহার করে pH–এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অন্যদিকে মাটি খুব ক্ষারীয় হলে অর্থাৎ pH–এর মান ৯.৫–এর বেশি হলেও মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে Al^{3+} (অ্যালুমিনিয়াম আয়ন) সহজে মাটি থেকে গাছের মূলে চলে যায় এবং এতে গাছের মারাত্মক ক্ষতি হয়। ক্ষারীয় মাটির জন্য নাইট্রেট ও ফসফেট জাতীয় সার ব্যবহার করে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অতিরিক্ত এসিড বা ক্ষার অর্থাৎ pH খুব কমে গেলে বা বেড়ে গেলে মাটিতে থাকা উপকারী অনেক অণুজীব মারা যায়, ফলে গাছপালার জৈবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়।

বাজারে মুখ ধোয়ার জন্য যেসব প্রসাধন সামগ্রী পাওয়া যায় তাতে লেখা থাকে pH ৫.৫,–এর কারণ কী? এর কারণ আমাদের ত্বক সাধারণত এসিডিক হয় এবং এর pH ৪–৬ এর মধ্যে থাকে। তবে নবজন্ম নেওয়া শিশুদের ত্বকের pH ৭–এর কাছাকাছি থাকে। তাই বড়দের জন্য যেসব প্রসাধনী ব্যবহৃত হয়, তা শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এতে শিশুদের ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

বিভিন্ন শিল্প রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় pH নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানারকম ঔষধ, কলমের কালি, বেকারিতে লজেন্স জাতীয় মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য, চামড়া প্রস্তুতি ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে pH–এর মান নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। এছাড়া আলোকচিত্র–সংক্রান্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, রং তৈরি ও ব্যবহারে, ধাতব পদার্থের ইলেকট্রোপ্লেটিং ইত্যাদি হাজারো ক্ষেত্রে pH–এর মান নিয়ন্ত্রণ করে কাজ করা হয়।

ক্ষারকের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা ক্ষারক ও ক্ষার কী তা জেনেছ। এখন এদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য জানা যাক।

নির্দেশকের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে রং পরিবর্তন : সকল ক্ষারক লাল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করে নীল করে। এছাড়া আরো কিছু নির্দেশক আছে, যারা পরীক্ষাগারে বহুল ব্যবহৃত (যেমন– মিথাইল অরেঞ্জ, মিথাইল রেড, ফেনলফথেলিন), তাদেরও রং পরিবর্তন করে। টেবিল–১ এ ক্ষারক নির্দেশকের কী ধরনের রং পরিবর্তন করে তা দেখানো হলো।

টেবিল– ১ : ক্ষারক ও নির্দেশকের বিক্রিয়ার ফলে রং পরিবর্তন

নির্দেশক	নির্দেশকের রং	ক্ষারকে ধারণকৃত রং
লাল লিটমাস কাগজ	লাল	নীল
মিথাইল অরেঞ্জ	কমলা	হলুদ
মিথাইল রেড	লাল	হলুদ
ফেনলফথ্যালিন	বর্ণহীন	গোলাপি

পানিতে দ্রবণীয় ক্ষারক অর্থাৎ ক্ষারসমূহ পানিতে হাইড্রক্সাইড আয়ন (OH^-) উৎপন্ন করে।

$NaOH$  $Na^+ + OH^-$

KOH  $K^+ + OH^-$

NH_4OH  $NH_4^+ + OH^-$

ক্ষারক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ উৎপন্ন করে। ক্ষারক ও এসিড পরস্পর বিপরীতধর্মী পদার্থ এবং বিক্রিয়া করে একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করে নিরপেক্ষ পদার্থ লবণ ও পানি তৈরি করে। পরে তোমরা এই বিক্রিয়া শিখবে।

নিজেরা কর : ৭.৪

কাজ : ক্ষারকের রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি ক্ষারক ($NaOH$), একটি এসিড (HCl), একটি নির্দেশক (লাল লিটমাস কাগজ বা ফেনলফথ্যালিন), একটি বিকার, অ্যাপ্রোন, নাড়ানি, কাচের ড্রপার।

পদ্ধতি: অ্যাপ্রোন পরে বিকারে ৫০ মিলিলিটার পাতলা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ নাও। লাল লিটমাস কাগজ দ্রবণে ডুবাও। লিটমাস কাগজটি নীল হয়ে গেল, তাইতো? এতে প্রমাণিত হলো যে ক্ষারক লাল লিটমাসকে নীল করে। এবার ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড বিকারে নেওয়া $NaOH$ দ্রবণে যোগ কর ও নাড়া দাও। নীল লিটমাস কাগজটি দ্রবণে ডুবিয়ে কোনো পরিবর্তন হয় কিনা দেখ। প্রথম দিকে দেখবে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে। ক্রমাগত হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করতে থাক আর লিটমাস কাগজ দিয়ে রং পরিবর্তন হয় কি না খেয়াল করো। এক পর্যায়ে দেখবে নীল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে লাল হয়ে গেল। কেন এমন হলো? কারণ হলো, এসিড যোগ করাতে তা আস্তে আস্তে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করেছে। এভাবে যখন সমস্ত $NaOH$ বিক্রিয়া করে ফেলেছে, তখন এসিড যোগ করার ফলে দ্রবণটি এসিডিক হয়ে গেছে আর সে কারণেই নীল লিটমাস লাল হয়ে গেছে।

প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষারের ব্যবহার ও সাবধানতা

তোমরা কি জান, মৌমাছি হুল ফুটালে বা পিঁপড়া কামড় দিলে জ্বলে কেন, ফুলে যায় কেন? কারণ হলো, পিঁপড়ার কামড়ের মাধ্যমে মূলত ফরমিক এসিড নিঃসৃত হয়, যা আমাদের শরীরে জ্বালা–পোড়া সৃষ্টি করে। আর মৌমাছি হুল ফুটালে ফরমিক এসিড, মেলিটিন (Melittin) ও অ্যাপামিন (Apamin) নামক এসিডিক পদার্থ নিঃসৃত হয়, যার কারণে জ্বালা পোড়াও হয় আবার আক্রান্ত স্থান ফুলেও যায়।

এখন প্রশ্ন পিঁপড়া কামড়ালে বা মৌমাছি হুল ফুটালে করণীয় কী?

যেহেতু এসব ক্ষেত্রে জ্বালা–পোড়ার কারণ হচ্ছে এসিড, তাই আমরা এসিডকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে এরকম মলম, লোশন বা চুন ব্যবহার করতে পারি। এরকম একটি লোশন হলো ক্যালামিন (Calamine), যা মূলত জিংক কার্বোনেট ($ZnCO_3$)। বেকিং সোডা ব্যবহার করেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

মাটির এসিডিটি দূর করতে ক্ষার : তোমরা আগেই জেনেছ, মাটিতে এসিডিটি বাড়লে উর্বরতা নষ্ট হয়। তখন ক্ষারক ব্যবহার করে এসিডিটিকে প্রশমিত করা যায় ও উর্বরতা ফিরিয়ে আনা যায়। এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত ক্ষারক হলো চুন (CaO) এবং মিল্ক অব লাইম [$Ca(OH)_2$]। অবশ্য এ কাজে চুনাপাথরও ($CaCO_3$) ব্যবহার করা হয়।

বাসাবাড়িতে পরিষ্কারক হিসেবে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বহুল ব্যবহৃত হয়। টুথপেস্ট বা টুথ পাউডার আমাদের নিত্যদিনের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, যা ক্ষারীয়। খাওয়ার পরে সাধারণত আমাদের মুখে এসিডীয় অবস্থা তৈরি হয়। আর টুথপেস্ট বা পাউডার দিয়ে ব্রাশ করলে একাদিকে যেমন দাঁত পরিষ্কার হয়, অন্যদিকে তেমনি পেস্ট বা পাউডারের ক্ষার সৃষ্ট এসিডকে নিষ্ক্রিয় করে। ফলে দাঁতের ক্ষয় রোধ হয়।

আবার থালা–বাসন পরিষ্কার করার জন্য যে শক্ত সাবান, তরল সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, সেগুলোতেও ক্ষারক থাকে। এমনকি আমরা যে কাপড় কাচার সাবান ব্যবহার করি, তা তৈরি করা হয় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও চর্বি বা তৈল থেকে। একইভাবে সেভিং ফোম বা নরম সাবান তৈরি করা হয় পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড ও চর্বি বা তৈল থেকে।

তোমরা জান যে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বা এসিডিটির কারণে আমরা যে এন্টাসিড খাই তা হলো ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড $Al(OH_3)$ নামের ক্ষার।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষারক বা ক্ষারসমূহ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অনেক কাজে লাগে। তাই এগুলো ব্যবহারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং অপচয় রোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

ক্ষার ও ক্ষারক ব্যবহারে সাবধানতা : তোমরা নিজের হাতে কখনো নিজেদের জামাকাপড় পরিষ্কার করে দেখেছ কী ঘটে? একটু বেশি কাপড় একসাথে পরিষ্কার করলে দেখা যায়, হাতের তালু থেকে ছোট ছোট চামড়া উঠে যায়। এর জন্য দায়ী হলো সাবানে থাকা ক্ষার। এসিড যেমন মানুষের শরীরে ছুড়লে ক্ষতি হয়, তেমনি ক্ষারও শরীরের ক্ষতি করে। তাই ক্ষারীয় দ্রব্যাদি নিয়ে কাজ করার সময় হাতে রবারের মোজা ও গায়ে অ্যাপ্রোন পরে নেওয়া উত্তম।

প্রশমন এবং এর প্রয়োজনীয়তা

পাকস্থলীর এসিডিটির জন্য পেটের ব্যথা হলে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড নামক এন্টাসিড খেলে ব্যথা সেরে যায় কেন? কারণ হলো, এসিডিটির জন্য দায়ী হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডের প্রশমন বিক্রিয়া ঘটে যার ফলে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিষ্ক্রিয়

হয়ে যায় এবং ব্যথা আর থাকে না। বিক্রিয়াটি নিচে দেখানো হলো:



$$2HCl + Mg(OH)_2 \longrightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$



$$3HCl + Al(OH)_3 \longrightarrow AlCl_3 + 3H_2O$$

আবার চুন (CaO) ও স্ল্যাক লাইম $[Ca(OH)_2]$ দিয়ে মাটির যে এসিডিটি দূর করে উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়, সেটিও হয় প্রশমন বিক্রিয়ার মাধ্যমে, যা নিচে দেখানো হলো:



$$CaO + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + H_2O$$



$$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + 2H_2O$$

তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছ খাওয়ার পরে আমাদের মুখে এসিড তৈরি হয় আর টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলে এসিডজনিত কারণে দাঁতের ক্ষয়রোধ হয়। এখানেও কিন্তু একধরনের প্রশমন বিক্রিয়াই ঘটে। টুথপেস্টের pH সাধারণত ৯–১১ এর মধ্যে হয় অর্থাৎ এরা ক্ষারীয় এবং এতে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, বেকিং সোডা, ট্রেট্রাসোডিয়াম পাইরোফসফেট জাতীয় পদার্থ থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রশমন বিক্রিয়া আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

লবণের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

এর আগে তোমরা জেনেছ যে লবণ হলো এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ। এখন তোমরা এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য জানবে।

নিজেরা কর : ৭.৫

কাজ: লবণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি পাত্র, খাবার লবণ, বিশুদ্ধ পানি, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, নাড়ানি।

পদ্ধতি : পাত্রে ৫–১০ গ্রাম লবণ নিয়ে ৫০ মিলিলিটার বিশুদ্ধ পানি যোগ করো। নাড়ানি দিয়ে ভালভাবে নাড়া দিয়ে লবণের দ্রবণ তৈরি কর। এবার একে একে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ যোগ করে দেখ এদের রং পরিবর্তন হয় কি না।

লিটমাস কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো? না, হলো না। এতে প্রমাণিত হলো যে লবণ নিরপেক্ষ পদার্থ। তবে কিছু কিছু লবণের জলীয় দ্রবণ অম্লীয় বা ক্ষারীয় হতে পারে। যেমন– বেকিং সোডা ($NaHCO_3$) বা খাবার সোডা। এটিও একটি লবণ, কিন্তু' এর জলীয় দ্রবণ এসিডিক এবং এটি নীল লিটমাসকে লাল করে। এর কারণ হলো, যদিও এটি একটি লবণ কিন্তু' পানিতে এটি হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে।



$$NaHCO_3 \longrightarrow Na^+ + H^+ + CO_3^{2-}$$

আবার সোডিয়াম কার্বোনেটের (Na_2CO_3) এ জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় এবং তা লাল লিটমাসকে লাল করে। এর কারণ হলো, পানিতে সোডিয়াম কার্বোনেট, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও কার্বোনিক এসিড তৈরি করে। কিন্তু উৎপন্ন কার্বোনিক এসিড দুর্বল এসিড হওয়ায় তা পুরোপুরি বিয়োজিত হয় না, আংশিকভাবে বিয়োজিত হয়। পক্ষান্তরে সোডিয়াম

হাইড্রক্সাইড একটি শক্তিশালী ক্ষার বলে তা পুরোপুরি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রক্সাইড আয়ন তৈরি করে। ফলে দ্রবণে হাইড্রক্সাইড আয়নের আধিক্য থাকে আর সে কারণেই দ্রবণ ক্ষারীয় হয় এবং লাল লিটমাসকে নীল করে, কার্বোনেট লবণসমূহ এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অন্য একটি লবণ, কার্বন–ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও পানি তৈরি করে।



$$Na_2CO_3 + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2$$



$$CaCO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$$

প্রায় সব লবণই কঠিন এবং উচ্চ গলনাংক ও স্ফুটনাংক বিশিষ্ট হয়। বেশির ভাগ লবণই পানিতে দ্রবণীয়, তবে কিছু কিছু লবণ আছে যারা পানিতে দ্রবীভূত হয় না। যেমন– ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$), সিলভার সালফেট ($AgSO_4$), সিলভার ক্লোরাইড ($AgCl$)।

লবণের ব্যবহার

তোমরা বলতো লবণ ছাড়া তরি–তরকারি রান্না করলে কেমন হবে? খুবই বাজে স্বাদযুক্ত হবে এবং আমরা অনেকেই তা খেতে পারব না। যে লবণ আমাদের খাদ্যের স্বাদ বাড়িয়ে খাওয়ার উপযোগী করে তোলে, তা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$), যা সাধারণ লবণ বা টেবিল লবণ নামেও পরিচিত। তরি–তরকারি ছাড়াও আরো অনেক খাবার যেমন– পাউরুটি, আচার, চানাচুর ইত্যাদিতে খাবার লবণ ব্যবহার করা হয়। খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করার জন্য আরেকটি লবণ সোডিয়াম গ্লুটামেট ব্যবহার করা হয়, যা 'টেস্টিং সল্ট' নামে পরিচিত।

আমরা কাপড় কাচার যে সাবান ব্যবহার করি তা হলো মূলত সোডিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COONa$) আর সেভিং ফোম বা জেলে থাকে পটাসিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COOK$)। কাপড় কাচার সোডা হিসেবে আমরা যে সোডিয়াম কার্বোনেট ($Na_2CO_3.10H_2O$) ব্যবহার করি তাও একটি লবণ। আবার আমরা জীবাণুনাশক যে তুঁতে বা ফিটকিরি ব্যবহার করি, সেগুলোও লবণ।

কৃষিতে লবণের ব্যবহার : তোমরা জান যে মাটির এসিডিটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য আমরা যে চুনাপাথর ব্যবহার করি, এই চুনাপাথর একটি লবণ। আবার আমরা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যে সার ব্যবহার করে থাকি, তাদের বেশির ভাগই হলো লবণ। যেমন– অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3), অ্যামোনিয়াম ফসফেট [$(NH_4)_3PO_4$], পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) ইত্যাদি।

তুঁতে বা কপার সালফেট ($CuSO_4.5H_2O$) কৃষিজমিতে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রতিরোধে বহুল ব্যবহৃত একটি লবণ। এটি শৈবালের উৎপাদন বন্ধে খুব কার্যকরী।

শিল্প–কারখানায় লবণ : শিল্প–কারখানায় নানা কাজে খাবার লবণ অপরিহার্য। যেমন– চামড়াশিল্পে চামড়ার ট্যানিং করতে, মাখন ও পনিরের শিল্পোৎপাদন, কাপড় কাচার সোডা ও খাবার সোডা তৈরি করতে, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ ইত্যাদি কাজে খাবার লবণ ব্যবহৃত হয়। বেশ কিছু লবণ যেমন– তুঁতে, মারকিউরিক সালফেট ($HgSO_4$), সিলভার সালফেট ($AgSO_4$) শিল্প–কারখানায় প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

টেক্সটাইল ও রং তৈরির কারখানায় রং ফিক্স করার কাজে লবণ প্রয়োজন হয়। ধাতুর বিশুদ্ধকরণে লবণ লাগে। রাবার প্রস্তুতিতে রাবারকে ল্যাটেক্স রবার গাছের নির্যাস থেকে আলাদা করা হয় লবণ ব্যবহার করে। ঔষধ কারখানায় স্যালাইন ও অন্যান্য ঔষধেও লবণ ব্যবহৃত হয়। ডিটারজেন্ট তৈরিতেও ফিলার হিসেবে লবণ অত্যাবশ্যক।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও শিল্প–কারখানায় লবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিজেরা কর : ৭.৬

কাজ : ধাতু ও এসিড হতে লবণ তৈরি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি ধাতু (যেমন– Mg), পাতলা হাইড্রোকোরিক এসিড, একটি বিকার, স্পেচুলা/চামচ, ফানেল, ১টি পাত্র, ত্রিপদী স্ট্যান্ড, স্পিরিট ল্যাম্প বা বার্নার, অ্যাপ্রোন।

পদ্ধতি : অ্যাপ্রোন পরে নাও। বিকারে ৫০ মিলিলিটার পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও। এবার ৫–১০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম রিবন (সরু তার) বা গুঁড়া স্পেচুলা/চামচ দিয়ে বিকারে যোগ করে। কোনো বুদবুদ উঠছে কি? না উঠলে হালকা তাপ দাও। বুদবুদ উঠা শেষ হলে আরো কিছু ম্যাগনেসিয়াম যোগ কর। বুদবুদ না উঠলে বুঝতে হবে এসিড পুরোপুরি বিক্রিয়া করে ফেলেছে এবং আর কোনো এসিড বিকারে অবশিষ্ট নেই। এভাবে সমস্ত এসিড বিক্রিয়া না করা পর্যন্ত অল্প অল্প করে ম্যাগনেসিয়াম রিবন (সরু তার) বা গুঁড়া যোগ করতে থাক। এবার ফানেল ও ফিল্টার কাগজের সাহায্যে অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম মিশ্রণ থেকে আলাদা কর। প্রাপ্ত দ্রবণকে ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর বসিয়ে স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে তাপ দিতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাত্রের গায়ে লবণের ছোট ছোট দানা দেখা যায়। অতঃপর তাপ দেওয়া বন্ধ করে পাত্রটিকে ঠান্ডা কর। পাত্রের তলায় বা গায়ে দানাদার বস্তু পেলে? এটি হলো ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড লবণ। এখানে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে $MgCl_2$ ও H_2 গ্যাস উৎপন্ন করে। এই গ্যাসের কারণেই আমরা বিকার থেকে বুদবুদ উঠতে দেখি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি দুর্বল এসিড?

ক. HCl
খ. HNO_3
গ. H_2CO_3
ঘ. H_2SO_4

২. একটি বর্ণহীন দ্রবণে NaOH মিশালে দ্রবনটি গোলাপী হয়ে গেল। দ্রবণটি কী?

ক. মিথাইল রেড
খ. মিথাইল অরেঞ্জ
গ. ফেনফথ্যালিন
ঘ. লিটমাস দ্রবণ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাজ্জির পায়ে পিঁপড়া কামড় দেয়ায় পায়ে যন্ত্রনা হয় এবং ফুলে যায়। তার মা পায়ে একটু কেরামিন লোশন লাগিয়ে দেন। এতে রাজ্জির পায়ের জ্বালা কমে যায়।

৩. রাজ্জির পা ফুলে যাওয়ার কারণ কোনটি?

ক. ফরমিক এসিড
খ. অক্সালিক এসিড
গ. এসিটিক এসিড
ঘ. সাইট্রিক এসিড

৪. পায়ে লাগানো লোশনটি–

i. এসিডকে প্রশমিত করে

ii. জিংক কার্বনেট জাতীয় লবণ

iii. মেলিটিন ও অ্যাপারিন নামক এসিডিক পদার্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অন্তু সবসময় মাংস, তৈলাক্ত খাবার ও চকলেট খায়। একদিন অন্তু বিরিয়ানী খাওয়ার পর তার বদহজম হয়। তার মা তাকে কোমল পানীয় খাওয়ালে সুস্থ্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে তার বোন শৈলী সয়াদুধ, সয়ামাখন এবং ফলমূল বেশি পছন্দ করে।

ক. আচার সংরক্ষণে কোন এসিড ব্যবহার করা হয়?

খ. দুর্বল এসিড বলতে কী বুঝায়?

গ. অন্তু কীভাবে সুস্থ হলো? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অন্তু ও শৈলীর খাবারের মধ্যে কোনটি এসিডিটির কারণ– বিশ্লেষণ কর।

২. তুহিন সাহেবের পেটে প্রায়ই বিভিন্ন সমস্যা হয়। ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি কিছু পরীক্ষা করাতে বলেন। পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা গেল, পাকস্থলিতে pH ১.৬ এবং ধমনীর রক্তে ৭.৫। রিপোর্ট নিয়ে বাসায় ফেরার সময় সে তার দুই মাসের বাচ্চার জন্য একটি লোশন কিনতে চাইলো যার pH ৫.৫। কিন্তু দোকানী তাকে বাচ্চার জন্য অন্যটি নিতে বললেন।

ক. অ্যামোনিয়াম সালফেটের সংকেত লেখ?

খ. ভিনেগারকে কেন দুর্বল এসিড বলা হয়?

গ. দোকানী তাকে লোশনটি নিতে নিষেধ করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুহিন সাহেবের পাকস্থলিতে এবং রক্তে এসিড ও ক্ষারের পরিমাণ যথাযথ আছে কি? মতামত দাও।

অষ্টম অধ্যায়

আমাদের সম্পদ

মাটি আমাদের অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। মাটিতে গাছপালা জন্মায়, ফসল উৎপন্ন হয়। মাটি আমাদের তেল, গ্যাস, কয়লাসহ নানা রকম খনিজ পদার্থের উৎস। এই অমূল্য সম্পদ প্রতিনিয়ত নানাভাবে দূষিত হচ্ছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- মাটি ও ভূমির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার মাটির মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- মাটির গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাটির pH মান জানার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাটি দূষণের কারণ, ফলাফল এবং মাটি সংরক্ষণের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- মাটিতে অবস্থিত খনিজের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খনিজের ব্যবহার এবং সংরক্ষণের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- প্রাকৃতিক জ্বালানির উৎস এবং এদের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাকৃতিক জ্বালানির গঠন, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার এবং সংরক্ষণের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- শিক্ষার্থীর এলাকায় মাটি দূষণের কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করতে পারব।
- pH পেপার দিয়ে মাটির pH নির্ণয় অথবা লিটমাস পেপার দিয়ে মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নির্ণয় করতে পারব।
- সম্পদ সংরক্ষণে যত্নবান হব ও অন্যদের সচেতন করব।

মাটির গঠন

তোমরা কি বলতে পার মাটি আমাদের কী কী কাজে লাগে?

প্রথমত: মাটিতে গাছপালা জন্মায়। আর গাছপালা থেকেই আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেন গ্যাসও আমরা পাই গাছপালা থেকেই। মাটি না থাকলে গাছপালা জন্মাতে পারত না, আমরা খাদ্যশস্য ও অক্সিজেন পেতাম না। দ্বিতীয়ত: মাটিতেই আমরা ঘরবাড়ি, অফিস, রাস্তাঘাট তৈরি করি। এছাড়া মাটির নিচ থেকে জীবনধারণের দরকারি পানির বড় একটি অংশ আসে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জ্বালানির (যেমন– তেল, গ্যাস, কয়লা) সিংহভাগ আমরা আহরণ করি মাটির নিচ থেকে। একইভাবে সোনা, রুপা, লোহাসহ নানারকম খনিজ পদার্থ মাটিরই অবদান। এখন আমরা অতি প্রয়োজনীয় এই মাটির গঠন সম্পর্কে জেনে নিই।

মাটি হলো নানারকম জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ। এলাকাভেদে মাটির গঠন ভিন্ন হয়। সাধারণত মাটিতে বিদ্যমান পদার্থসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এরা হলো খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, বায়বীয় পদার্থ ও পানি। তবে এসব পদার্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে মিশে একধরনের জটিল মিশ্রণ তৈরি করে এবং একটিকে আরেকটি থেকে সহজে পৃথক করা যায় না। মাটিতে বিদ্যমান খনিজ পদার্থসমূহ অজৈব যৌগ হয়।

মাটিতে বিদ্যমান প্রধান প্রধান খনিজ পদার্থ বা অজৈব পদার্থসমূহ হলো ক্যালসিয়াম (Ca), অ্যালুমিনিয়াম (Al), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), লোহা (Fe), সিলিকন (Si), পটাসিয়াম (K) ও সোডিয়াম (Na), অল্প পরিমাণে ম্যাংগানিজ (Mn), কপার (Cu), জিংক (Zn), কোবাল্ট (Co), বোরন (B), আয়োডিন (I), এবং ফ্লোরিন (F)। এছাড়া মাটিতে কার্বোনেট, সালফেট, ক্লোরাইড, নাইট্রেট এবং ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg),পটাশিয়াম (K), সোডিয়াম (Na) ইত্যাদি ধাতুর জৈব লবণও পাওয়া যায়।

মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ হিউমাস (Humus) নামে পরিচিত। হিউমাস আসলে অ্যামিনো এসিড, প্রোটিন, চিনি, অ্যালকোহল, চর্বি, তেল, লিগনিন, ট্যানিন ও অন্যান্য অ্যারোমেটিক যৌগের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ জটিল পদার্থ। এটি দেখতে অনেকটা কালচে রঙের হয়। হিউমাস তৈরি হয় মৃত গাছপালা ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে।

আয়তন অনুসারে মাটিতে বিদ্যমান পদার্থসমূহ টেবিল–১ এ দেখানো হলো :

টেবিল–১: মাটির গঠন

ক্রমিক নং	পদার্থ	পরিমাণ
০১	অজৈব বা খনিজ পদার্থ	৪৫%
০২	জৈব পদার্থ	৫%
০৩	পানি	২৫%
০৪	বায়বীয় পদার্থ	২৫%

মাটিতে বিদ্যমান পানির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে গাছপালার জন্য। আচ্ছা তোমাদের কি মনে প্রশ্ন জাগছে যে মাটিতে পানি কোথায় ও কীভাবে থাকে? মাটিতে পানি থাকে মাটির কণার মাঝে থাকা ফাঁকা স্থান বা রন্ধ্রে। এই রন্ধ্রের আকার–আকৃতির উপর নির্ভর করে মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা। তোমরা বলতো বালি ও কাদামাটির কোনটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি? নিঃসন্দেহে কাদা মাটির। এর কারণ হলো কাদামাটির ক্ষেত্রে মাটির কণাগুলোর ফাঁকে বিদ্যমান রন্ধ্র খুব সূক্ষ্ম, যা পানি ধরে রাখে। অন্যদিকে বালি মাটির বেলায় রন্ধ্রগুলো বড় বড়, যে কারণে পানি আটকে থাকে না বা ধরে রাখতে পারে না।

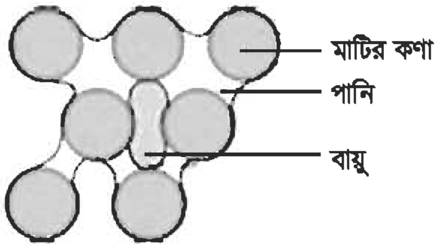
ফাঁকা স্থান বা রন্ধ্র ছাড়াও মাটির কণায় শোষিত অবস্থায়ও পানি থাকতে পারে। মাটিতে থাকা হিউমাস পানি শোষণ করে রাখতে পারে। হিউমাসে শোষিত পানি সহজে গাছপালায় স্থানান্তরিত হয় না।

মাটিতে পানি না থাকলে কী সমস্যা হয়? মাটিতে পানি না থাকলে কী সমস্যা হয় তার বড় প্রমাণ হলো মরুভূমি যেখানে দু–একটি বিশেষ প্রজাতির গাছ ছাড়া জন্মায় না। অর্থাৎ মাটিতে পানি না থাকলে গাছপালা জন্মাতে পারে না এবং বেড়ে উঠতে পারে না। তোমরা জান যে উদ্ভিদকোষের অন্যতম অংশ হলো প্রোটোপ্লাজম, আর এই প্রোটোপ্লাজমের শতকরা

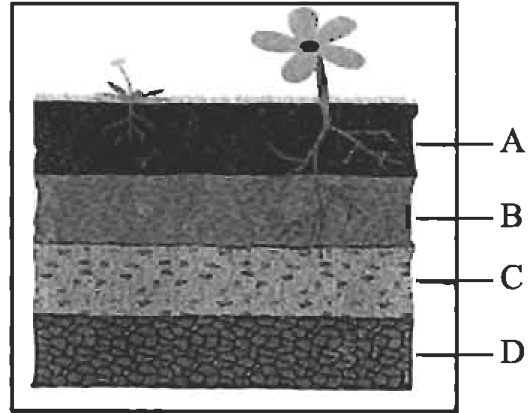
৮৫–৯৫ ভাগই হলো পানি, যা আসে মাটি থেকে। গাছ কিছু পানি পাতায় থাকা স্টোমাটার (Stomata) মাধ্যমে গ্রহণ করলেও বেশির ভাগই আসে মাটি থেকে মূলের মাধ্যমে। মাটি থেকে পাওয়া পানির সাহায্যেই গাছপালা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের খাবার তৈরি করে ও আমাদেরকে অক্সিজেন দেয়। গাছপালার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি (যেমন– খনিজ পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি) মাটি থেকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না।। এগুলো গ্রহণ করে মূলের সাহায্যে এবং এক্ষেত্রে পানি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কাজেই পানি না থাকলে উদ্ভিদ মাটি থেকে এসব পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে না, ফলে এদের বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয়।

এবার আসা যাক মাটিতে থাকা বায়বীয় পদার্থের প্রসঙ্গে। মাটির কণার মধ্যকার ফাঁকা স্থান বা রন্ধ্রে যেমন পানি থাকতে পারে, তেমনি বায়বীয় পদার্থ বা বাতাসও থাকতে পারে। মাটিতে থাকে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস।

মজার ব্যাপার হলো, মাটিতে থাকা গ্যাসের সাথে বায়ুমন্ডলে থাকা বাতাসের গ্যাসের বিনিময় হয় অর্থাৎ বায়ুমন্ডলের গ্যাস মাটিতে যায় এবং মাটিতে থাকা গ্যাস বায়ুমন্ডলে চলে আসে। এই প্রক্রিয়াকে মাটির বায়বায়ন (Soil Aeration) বলে। এখন প্রশ্ন হলো মাটিতে থাকা গ্যাস কি কোনো কাজে লাগে? হ্যাঁ, অবশ্যই এটি কাজে লাগে। মাটিতে নানারকম উপকারী অণুজীব (Microorganism) থাকে। এর মধ্যে কিছু অণুজীবের জন্ম ও বেড়ে ওঠার জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যক। অক্সিজেন না থাকলে এরা বাঁচতে পারে না। আবার অক্সিজেন পানিতে অদ্রবণীয় খনিজ পদার্থকে ভেঙে দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত করে, যা পরে মাটিতে থাকা পানির দ্বারা উদ্ভিদে স্থানান্তরিত হয়। চিত্র: ৮.১–এ মাটির কণা, পানি ও বায়ু কীভাবে থাকে তা দেখানো হলো:



চিত্র: ৮.১ মাটির গঠন



চিত্র: ৮.২ মাটির বিভিন্ন স্তর

আচ্ছা, আমরা যদি কোনো একটি স্থানের মাটির গভীরে যেতে থাকি, তাহলে কী পাব? সব জায়গায় কি মাটির গঠন একই হবে, নাকি ভিন্ন হবে? নিচের দিকে মাটির গঠন পরীক্ষা করে দেখা যায় যে মাটি ৪টি সমান্তরাল স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরকে দিগবলয় বা হরাইজোন (Horizon) বলে। সবার উপরে যে স্তরটি থাকে তাকে বলে হরাইজোন A (Horizon A) বা টপ সয়েল (Top Soil)। এই স্তরেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর মরা দেহে পচন শুরু হয় ও উৎপাদিত পদার্থ বিশেষ করে হিউমাসসহ অন্যান্য জৈব পদার্থ এই স্তরেই থাকে। সাধারণত খনিজ পদার্থ এই স্তরে থাকে না, বরং পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে নিচের স্তরে চলে যায়। এই স্তরের মাটি সাধারণত বালুময় হয়। মাটির দ্বিতীয় স্তরটিকে সাবসয়েল (Sub Soil) বা হরাইজোন B (Horizon B) বলে। এ স্তরে সামান্য পরিমাণ হিউমাস থাকে। তবে এই স্তর ওপরের স্তর থেকে আসা খনিজ পদার্থে ভরা থাকে।

মাটির তৃতীয় স্তরটিকে হরাইজোন C (Horizon C) বলে। মাটি তৈরি হয় শিলা থেকে, যেখানে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া জড়িত। মূল শিলা আস্তে আস্তে নরম হয়ে এক পর্যায়ে মাটির কণায় পরিণত হয়। হরাইজোন C– তে মূল শিলা থেকে পরিবর্তিত হয়ে প্রথম যে নরম শিলা তৈরি হয় সেগুলো থাকে। এই নরম শিলা মূল শিলা থেকে নরম কিন্তু মাটির কণা থেকে অনেক গুণ শক্ত থাকে। এই শিলাই পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়ে মাটির কণায় পরিণত হয়। এই স্তরের নিচে থাকে মূল শিলা যা খুবই শক্ত। চিত্র: ৮.২ এ মাটির উলম্ব গঠন দেখানো হলো।

মাটির প্রকারভেদ

তোমরা বলতো সব জায়গার মাটি কি এক রকম? না, একেক জায়গার মাটি একেক রকম। মাটির গঠন, বর্ণ, পানি ধারণক্ষমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মাটিকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এরা হলো বালু মাটি, পলি মাটি, কাদামাটি এবং দো–আঁশ মাটি। এবার আমরা বিভিন্ন প্রকার মাটির বৈশিষ্ট্য জেনে নিই।

বালু মাটি

বালু মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এদের পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। এটি প্রমাণ করে দেখ তোমরা। অল্প পরিমাণ বালু মাটি নিয়ে তাতে পানি যোগ কর। এবার হাতের তালুতে নিয়ে দেখ গোল গোল ছোট মাটির বলের মতো বানাতে পার কি না। পারবে না, কারণ বালু মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা নেই বলে পানি যোগ করলেও বালু মাটি তা শোষণ করতে পারে না। যদি পারত তাহলে পানি মাটির কণার গায়ে লেগে থাকত আর তোমরা খুব সহজেই বলের মতো মাটির গুটি বানাতে পারতে।

বালু মাটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে বিদ্যমান মাটির কণার আকার সবচেয়ে বড় থাকে, ফলে কণাগুলোর মাঝে ফাঁকা জায়গা বেশি থাকে, যার ফলে বায়বায়ন অনেক বেশি হয়। বালু মাটি তোমরা হাতে নিলে দেখবে যে, এরা দানাযুক্ত হয়। বালু মাটিতে অতি ক্ষুদ্র শিলা ও খনিজ পদার্থ থাকে। বালু মাটিতে হিউমাস থাকলে এটি চাষাবাদের জন্য সহজসাধ্য, তবে যেহেতু এই মাটির পানি ধারণক্ষমতা কম, তাই পানি দিলে তা দ্রুত নিষ্কাশিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে বিশেষ করে উদ্ভিদে পানির স্বল্পতা দেখা যায়। তাই যে সকল ফসলাদিতে অনেক বেশি পানি লাগে সেগুলো বালু মাটিতে ভালো হয় না। তবে যখন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় যা জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে, সে সকল ক্ষেত্রে বালু মাটি চাষাবাদের জন্য উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। কারণ, বালু মাটিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় না যার ফলে গাছের শিকড় পঁচে না। জলাবদ্ধতা হলে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো গাছের শিকড়ে পঁচন ধরে যার ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়।

পলি মাটি

পলি মাটির পানি ধারণক্ষমতা বালু মাটির চেয়ে বেশি। পলি মাটি চেনার উপায় কী? সামান্য পানিযুক্ত মাটি নিয়ে আঙুল দিয়ে ঘষলে যদি মসৃণ অনুভূত হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি পলি মাটি। পলি মাটি হাতের সাথে লেগে থাকবে। এতে উপস্থিত পানির জন্য যা বালু মাটির বেলায় ঘটে না। পলি মাটি খুবই উর্বর হয় আর মাটির কণাগুলো বালু মাটির কণার তুলনায় আকারেও ছোট হয়। জমিতে পলি পড়ার কথা তোমরা জান। পলি মাটির কণাগুলো ছোট হওয়ায় এরা পানিতে ভাসমান আকারে থাকে এবং একপর্যায়ে পানির নিচে থাকা জমিতে পলির আকারে জমা পড়ে। পলি মাটিতে জৈব পদার্থ ও খনিজ পদার্থ (যেমন– কোয়ার্টজ) থাকে। বালু মাটির মতো পলি মাটির কণাগুলোও দানাদার হয় এবং এতে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান বেশি থাকে।

কাদা মাটি

তোমরা কাদা মাটি দেখেছ? এই মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা প্রচুর পানি ধারণ করতে পারে। এরা অনেকটা আঠালো ধরনের হয় এবং হাত দিয়ে ধরলে হাতে লেগে থাকে। এই মাটিতে মাটির কণাগুলো খুব সূক্ষ্ম হয়, ফলে কণাগুলোর মধ্যকার রন্ধ্র খুব ছোট ও সরু হয়। কাদা মাটি থেকে সহজে পানি নিষ্কাশিত হয় না। এই জাতীয় মাটিতে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় যা ফসলাদি বা উদ্ভিদের মূলে পঁচন সৃষ্টি করে। কাদা মাটিতে ফসল চাষের জন্য জৈব সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে থাকে। এই মাটিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এই মাটি দিয়ে ঘর, সাজানোর তৈজসপত্র, এমনকি গহনাও তৈরী করা হয়।

দো–আঁশ মাটি

এই মাটি বালু, পলি ও কাদা মাটির সমন্বয়েই তৈরি হয়। দো–আঁশ মাটিতে থাকা বালু, পলি ও কাদা মাটির অনুপাতের উপর নির্ভর করে দো–আঁশ মাটির ধরন কেমন হবে। দো–আঁশ মাটির একদিকে যেমন পানি ধারণ ক্ষমতা ভাল আবার প্রয়োজনের সময় পানি দ্রুত নিষ্কাশনও হতে পারে। তাই ফসল চাষাবাদের জন্য দো–আঁশ মাটি খুবই উপযোগী।

উপরে উল্লেখিত চার প্রকার ছাড়াও আরো দু–প্রকারের মাটি পাওয়া যায়। এরা হলো পিটি মাটি (Peaty Soil) ও খড়িমাটি (Chalky Soil) । পিটি মাটি তৈরি হয় মূলত জৈব পদার্থ থেকে; আর সেকারণে এতে অন্য সব মাটি থেকে জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। সাধারণত ডোবা ও আর্দ্র এলাকায় এই মাটি পাওয়া যায়। এই মাটিতে পুষ্টিকর উপাদান কম থাকে। তাই ফসল উৎপাদনের জন্য তেমন উপযোগী নয়। অন্যদিকে খড়িমাটি ক্ষারীয় হয় এবং এতে অনেক পাথর থাকে। এই মাটি সাধারণত দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং সেকারণে ফসল উৎপাদনের জন্য খুব একটা উপযুক্ত নয়, বিশেষ করে গ্রীস্মকালে। এছাড়াও খড়িমাটি থেকে গাছপালার জন্য অত্যাবশ্যকীয় আয়রন ও ম্যাগনেসিয়াম সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে।

মাটির pH

ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মানদন্ড হলো এর pH। তোমরা জান, যে pH মান জানা থাকলে মাটি এসিডিক, ক্ষারীয় না নিরপেক্ষ তা বোঝা যায়। যে কারণে মাটির pH অত্যন্ত গুরুত্বপূণ তা হলো বেশির ভাগ ফসলের ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া যায় মাটির pH নিরপেক্ষ হলে অর্থাৎ এর মান ৭ বা তার খুব কাছাকাছি হলে। তাই কোনো একটি জমির মাটি পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় এর pH ৭ এর চেয়ে বেশ কম বা বেশি তাহলে এর pH ৭ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে কিছু কিছু ফসল আছে, যেমন– আলু এবং গম, এরা মাটির pH ৫–৬ হলে সর্বোচ্চ উৎপাদন দেয়। অন্যদিকে কিছু ফসল যেমন– যব, মাটির pH ৮ হলে ভাল উৎপাদন হয়। তাহলে বুঝা গেল ভালো ফলনের জন্য মাটির pH অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাটিদূষণের কারণ ও ফলাফল

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমরা পানিদূষণ সম্পর্কে জেনেছ। মাটিদূষণ ও পানিদূষণ একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ পানিদূষণের জন্য যেসব কারণ দায়ী, সেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাটিদূষণেরও কারণ। এখন তাহলে মাটিদূষণের নির্দিষ্ট কিছু কারণ জেনে নিই।

শিল্প–কারখানা ও গৃহস্থালির বর্জ্য

তোমরা কি জান, আমাদের দেশে শিল্প–কারখানা ও গৃহস্থালির বর্জ্য কী করা হয়? শিল্প–কারখানা ও শহরাঞ্চলের

গৃহস্থালির বর্জ্য মাটির নিচে গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয় বা কখনো কখনো একটি খোলা জায়গা বা ডাস্টবিনে জড়ো করে রাখা হয়। আর গ্রামাঞ্চলে বাড়ির আশেপাশেই ফেলা হয়। এসব বর্জ্য জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পচতে থাকে এবং জৈব সারে পরিণত হয়।

তোমরা কি ধারণা করতে পার এই জাতীয় দূষণের ফলাফল কেমন হতে পারে?

যেহেতু শিল্প–কারখানার বর্জ্যে মারকারি, জিংক, আর্সেনিক ইত্যাদি থেকে শুরু করে এসিড, ক্ষার, লবণ, কীটনাশক ইত্যাদি হাজারো রকমের মারাত্মক ক্ষতিকর পদার্থ থাকে, তাই এই জাতীয় দূষণের প্রভাবও বহুমাত্রিক হয়। যেমন– মারকারি ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ মাটিতে বিদ্যমান উপকারী অণুজীবসমূহকে মেরে ফেলে, ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। আবার মাত্রাতিরিক্ত লবণ, এসিড বা ক্ষার গাছপালা ও ফসলের ক্ষতিসাধন করে। এই জাতীয় বর্জ্যে থাকা প্রোটিন বা অ্যামিনো এসিড ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা ভেঙে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস, সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও ফসফরাসের অক্সাইড উৎপন্ন করে, যার কারণে মাটি দূষিত হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হলো, এ ধরনের দূষণের ফলে ক্ষতিকর পদার্থ মাটি থেকে খাদ্য শৃংখলার মাধ্যমে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীদেহে প্রবেশ করে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে। সর্বোপরি এই জাতীয় দূষণের ফলে মাটির জৈব রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটতে পারে, যা ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিঃসরণ

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বা অস্ত্র তৈরির কারখানা থেকে দুর্ঘটনা বা পরীক্ষা–নিরীক্ষার ফলে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা মাটির মারাত্মক দূষণ হতে পারে। রেডন (Rn), রেডিয়াম (Ra), থোরিয়াম (Th), সিজিয়াম (Cs), ইউরেনিয়াম (U) ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ শুধু যে মাটির উর্বরতাই নষ্ট করে তা নয়, এরা প্রাণীদেহেও ত্বক ও ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টি করে। উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তার ফলে গাছপালাও মরে যায়। এছাড়া অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থের মতো এরাও খাদ্য শৃংখলের মাধ্যমে প্রাণীদেহে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে।

তোমরা কি চেরোনোবিল দুর্ঘটনার কথা জান?

অতিরিক্ত পলি থেকে মাটি দূষণ

নদীভাঙনের কথা তোমরা সবাই জান। নদীভাঙনের ফলে নদীর পাড় ভাঙা মাটি বা অন্য যেকোনভাবে সৃষ্ট মাটি বা পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ পানির দ্বারা প্রবাহিত হয়ে একপর্যায়ে গিয়ে কোথাও না কোথাও তলানি আকারে পড়ে এবং সেটি কখনো নদ–নদী, খাল–বিল ইত্যাদির তলদেশে জমা হতে পারে আবার কখনো ফসলি জমিতে জমা হতে পারে। আরেকটি বিষয় হলো, এই সমস্ত তলানিতে নানারকম ক্ষতিকর পদার্থ থাকতে পারে। এই জাতীয় তলানি ফসলি জমির ওপর পড়লে তা জমির উপরিভাগ যা ফসল উৎপাদনে মূল ভূমিকা পালন করে, তার ওপর আস্তরণ সৃষ্টি করে। ফলে এর ফসল উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এসব পদার্থ নদীগর্ভে জমা হলে কী হয় তা তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে জেনেছ।

খনিজ পদার্থ আহরণের দ্বারা মাটির দূষণ

খনি থেকে মূল্যবান খনিজ পদার্থ বা তেল, গ্যাস ও কয়লার মতো প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের সময় প্রচুর মাটি খনন করে সরিয়ে ফেলতে হয়। এতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসলহানি যেমন ঘটে, তেমনি মাটিদূষণের ফলে মাটির উর্বরতাও নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি এর ফলে সৃষ্ট মাটি ক্ষয়ের কারণে তা আশেপাশের জলাভূমি ভরাট করে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

বেশির ভাগ খনিই সাধারণত বন এলাকায় থাকে, যে কারণে খনি খননের ফলে বনজ সম্পদ ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে। ফলে ঐ সকল স্থানে মাটি দূষণ ঘটে। এছাড়া খনিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা (যা সচরাচর ঘটেই চলেছে) ঘটলে তা আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মাটির উৎপাদনশীলতা নষ্ট করে দিতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত সার, কীটনাশক, আগাছা ধ্বংসকারী, গাছপালার অবশিষ্টাংশ, প্রাণিজ বর্জ্য, মাটির ক্ষয় এমনকি কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলেও মাটি দূষণ হয় ও মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়।

আচ্ছা তোমরা বলতো মানুষের মলমূত্র, পাখির বিষ্ঠা বা অন্যান্য প্রাণীর মলমূত্র থেকে কি মাটি দূষণ হতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই পারে। কারণ, এসব মলমূত্রে রোগ সৃষ্টিকারী নানারকম জীবাণু থাকে, যারা মাটিতে বেড়ে উঠে এবং পরবর্তীতে মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে রোগ সৃষ্টি করে।

মাটি সংরক্ষণের কৌশল

মাটি আমাদের একটি অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, ঔষধসহ যে সকল চাহিদা রয়েছে তার সবগুলোই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাটির উপর নির্ভরশীল। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই সম্পদটি নানাভাবে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ও এর উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। ঝড়ো বাতাস মাটি উড়িয়ে নেয়, ভারী বৃষ্টিপাত, নদীর পানির স্রোত বা নদীর ভাঙন ইত্যাদি নানা কারণে মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মাটি ক্ষয় হলে এর উর্বরতা ধ্বংসের পাশাপাশি মাটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমরা গাছপালা ও বন জঙ্গল কেটে, পাহাড় কেটে শিল্প–কারখানা স্থাপন করে (যেমন– ইটভাটা) প্রতিনিয়ত মাটির ক্ষয়সাধন করে চলেছি। তোমরা জান যে সাম্প্রতিক কালে পাহাড় ধসে চট্টগ্রাম এলাকায় অনেক প্রাণহানি ঘটছে, যার মূল কারণ পাহাড় কেটে মাটির ক্ষয়সাধন। এই ক্ষয় বন্ধ না হলে এটি আমাদের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হতে পারে।

কীভাবে আমরা ক্ষয়রোধ করে মাটি সংরক্ষণ করতে পারি?

মাটি সংরক্ষণের অন্যতম কৌশল হলো মাটিতে বেশি করে গাছ লাগানো। মাটিতে তৃণগুল্ম ও দূর্বা বা অন্য যেকোনো ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ ও অন্যান্য গাছপালা থাকলে ভারী বৃষ্টিপাতও মাটির ক্ষয়সাধন করতে পারে না। গাছের শিকড় মাটির ভিতরে থাকায় তা মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে। জমিতে ফসল তোলার পর তা উপড়ে না তুলে গোড়া জমিতে রেখে দিলে একদিকে যেমন জমির উর্বরতা বাড়ে অন্যদিকে তেমনি জমির ক্ষয়ও কমে যায়।

বৃষ্টি হলে সাধারণত ঢালু জায়গায় মাটির ক্ষয় বেশি হয়। কাজেই ঢালু জায়গা দিয়ে পানি যাতে প্রবাহিত না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা যায়। তবে এই কাজ সহজ নয়। এক্ষেত্রেও ঢালু জায়গায় ঘাস, ধনচে বা কলমি জাতীয় গাছ লাগিয়ে মাটির ক্ষয়রোধ করা যায়। গ্রাম এলাকায় অনেকেই ঘাস কেটে বা তুলে গবাদিপশুকে খাওয়ায়। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, ঘাস মাটি থেকে তুললে তা মাটির ক্ষয়সাধন করে। তাই ঘাস কাটার সময় একেবারে মাটি ঘেঁষে কাটা উচিৎ নয়। এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া—এগুলো মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয় ঘাস খাওয়ার জন্য। এরা যেন মাটির উপরে থাকা ঘাসের আচ্ছাদান সমূলে খেয়ে না ফেলে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বনের গাছ কাটার ফলে অনেক সময় বিস্তীর্ণ এলাকা গাছশূন্য ও অনাচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। কাজেই নতুন গাছ লাগানোর ব্যবস্থা না করে কোনোমতেই বনের গাছ কাটা যাবে না। অন্যথায় মাটির ক্ষয়সাধন রোধ করা যাবে না।

রাসায়নিক সারের বদলে জৈব সার উত্তম, কারণ জৈব সারে থাকা উপাদান ও হিউমাস পানি শোষণ করতে পারে। ফলে অল্প বৃষ্টিপাতে মাটির ক্ষয় হয় না। এছাড়া রাসায়নিক সার মাটিতে বসবাসকারী উপকারী পোকামাকড় অণুজীব ধ্বংস

করে, ফলে উর্বরতাও নষ্ট হয়ে যায়। একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ করলে উর্বরতা নষ্ট হয়। তাই একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করা উচিত।

নদীভাঙনের মাধ্যমে মাটির যে ক্ষয় হয় তা কীভাবে বন্ধ করা যায়?

নদীর পাড়ে কলমি, ধনচে ইত্যাদি গাছ লাগানো যায়। নদী অত্যধিক খরস্রোতা হলে নদীর পাড়ে বালুর বস্তা ফেলে বা কংক্রিটের তৈরি ব্লক দিয়ে ভাঙন ঠেকানো হয়।

মাটিতে অবস্থিত সাধারণ খনিজ

আমরা যে নানারকম খনিজ লবণ, পেন্সিলের সিস, ট্যালকম পাউডার, চীনা মাটির থালা–বাসন ইত্যাদি হাজারো রকম জিনিস ব্যবহার করি তার অধিকাংশই মাটি ও শিলা থেকে প্রাপ্ত খনিজ পদার্থ। বেশির ভাগ খনিজ পদার্থই কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংযুক্তি থাকে। এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫০০ রকমের খনিজ পদার্থ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। খনিজ পদার্থ ধাতব ও অধাতব দুটোই হতে পারে। ধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে অন্যতম হলো লোহা (Fe), তামা (Cu) বা কপার, সোনা (Au), ও রূপা (Ag)। অধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে কোয়ার্টজ (Quatrz), মাইকা (Mica), খনিজ লবণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কয়লা, গ্যাস, প্যাট্রোল ইত্যাদি কী খনিজ পদার্থ? হ্যাঁ, এগুলোও খনিজ পদার্থ। এদেরকে জৈব খনিজ পদার্থ বলে। এদের সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী পাঠে বিস্তারিত জানবে।

টেবিল–২: কয়েকটি সাধারণ খনিজ পদার্থের ব্যবহার

ক্রমিক নং	খনিজ পদার্থ	ব্যবহার
০১.	ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4)	লোহা তৈরিতে।
০২.	চুনাপাথর ($CaCO_3$)	ঘরবাড়ি, সিমেন্ট, সোডা, গ্লাস, লোহা ও স্টিল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মাটি এসিডিক হলেও এটি ব্যবহার করে প্রশমন করা হয়।
০৩.	কোয়ার্টজ (SiO_2)	কাচ, সিরিচ কাগজ, রেডিও, ঘড়ি তৈরিতে
০৪.	সিলভার বা রূপা (Ag)	গহনা ও ধাতব মুদ্রা তৈরিতে
০৫.	মাইকা (Mica)	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ নিরোধক হিসেবে
০৬.	জিপসাম ($CaSO_4.2H_2O$)	সিমেন্ট ও প্লাস্টার অব প্যারিস তৈরির কাঁচামাল
০৭.	ধাতব পাইরাইটস (Pyrites)	সালফার ও নানা রকম ধাতু তৈরিতে
০৮.	সোনা ও হীরা	গহনা তৈরিতে
০৯.	গ্যাস, কয়লা, পেট্রোল	জ্বালানি হিসেবে রান্নার কাজে, গাড়ি ও শিল্পকারখানায়

খনিজ পদার্থের ভৌত ধর্ম

খনিজ পদার্থসমূহ সাধারণত দানাদার বা কেলাসাকার হয়। অনেক খনিজ পদার্থ আছে যাদের রাসায়নিক সংযুক্তি একই কিন্তু তাদের কেলাস গঠন ভিন্ন। ফলে তাদের ভৌত ধর্মও ভিন্ন। যেমন– গ্রাফাইট ও ডায়মন্ড। যদিও দুটি পদার্থই কার্বন দিয়ে গঠিত, কিন্তু গঠনের ভিন্নতার কারণে গ্রাফাইট (যা আমরা পেন্সিলে ব্যবহার করি) নরম হয় কিন্তু ডায়মন্ড বা

হীরা এখন পর্যন্ত জানা খনিজের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত খনিজ পদার্থ।

আগেই তোমরা জেনেছ, খনিজ পদার্থসমূহ সাধারণত কঠিন হয় এবং এক একটি খনিজের কঠিনতা একেক রকম। বেশি কঠিনতাসম্পন্ন খনিজ খুব সহজেই কম কঠিনতা সম্পন্ন খনিজে আঁচড় কাটতে পারে; কিন্তু কম কঠিনতাসম্পন্ন খনিজ বেশি কঠিনতাসম্পন্ন খনিজে আঁচড় কাটতে পারে না। কঠিনতা অনুযায়ী সবচেয়ে নরম খনিজ হলো ট্যালক (Talc), যা দিয়ে ট্যালকাম পাউডার তৈরি হয় আর সবচেয়ে বেশি কঠিন খনিজ হলো হীরা বা ডায়মন্ড। খনিজ পদার্থের নির্দিষ্ট দ্যুতি থাকে। ধাতব খনিজ যেমন– পাইরাইটসমূহ ধাতুর মতোই দ্যুতি প্রদর্শন করে অর্থাৎ অনেকটা ধাতুর মতোই চকচক করে। আবার হীরা অধাতু হলেও এর দ্যুতি সম্পর্কে আমরা সবাই জানি।

কিছু কিছু খনিজ পদার্থ আছে, যারা খুব স্বচ্ছ এবং এর মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারে। যেমন– কোয়ার্টজ বা সিলিকা, আবার কিছু কিছু আছে যার মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করলেও এর মধ্য দিয়ে কোনো বস্তু দেখা যায় না। অন্যদিকে এমন খনিজও আছে যার মধ্য দিয়ে মোটেই আলো প্রবেশ করতে পারে না। যেমন– ক্যালসাইট ($CaCO_3$) বা চুনাপাথর। সাধারণত প্রতিটি খনিজ পদার্থেরই নির্দিষ্ট বর্ণ আছে, যা দিয়ে একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করা যায়।

বেশিরভাগ খনিজ পদার্থে বিদারণ বা ফাটল থাকে, যা দেখে বুঝা যায় এটি ভাঙলে কী ধরনের আকার–আকৃতি বিশিষ্ট ছোট ছোট টুকরা পাওয়া যাবে। বেশির ভাগ খনিজ পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৫– ৩.৫ –এর মধ্যে হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

রাসায়নিক ধর্ম : খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে এতে বিদ্যমান উপাদানের উপর।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জ্বালানির উৎস

তোমরা বলতো আমাদের ব্যবহৃত প্রাকৃতিক জ্বালানি কোনগুলো? আমাদের ব্যবহৃত প্রাকৃতিক জ্বালানির অন্যতম হলো প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। এছাড়া রান্নার কাজে ব্যবহৃত কাঠের খড়ি, গাছের পাতা পাটকাঠি, ধানের গুঁড়া ও খড় বা গোবর দিয়ে তৈরি লাকড়ি, এগুলোকেও প্রাকৃতিক জ্বালানি হিসেবে গণ্য করা যায়। এখন আমাদের বহুল ব্যবহৃত গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

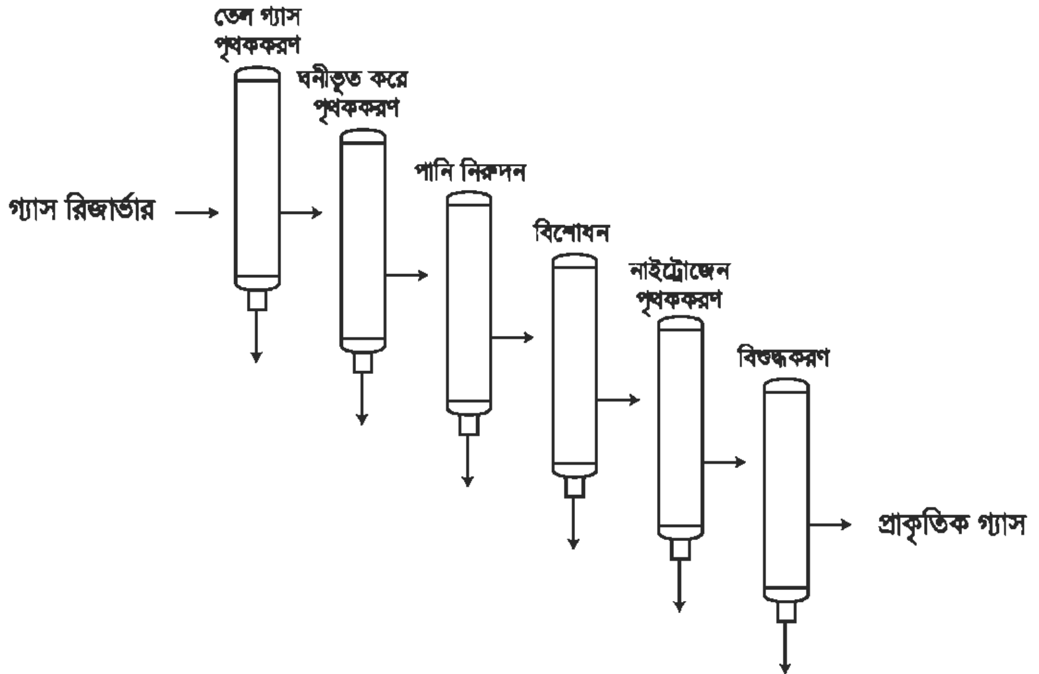
প্রাকৃতিক গ্যাস: তোমরা কি জান আমরা বাসায় গ্যাসের চুলায় বা সিএনজি (CNG) পাম্প স্টেশন থেকে গাড়িতে যে গ্যাস নিই তাতে আসলে কী গ্যাস থাকে? এসব ক্ষেত্রেই থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস যা মূলত মিথেন (CH_4) গ্যাস। তবে সামান্য পরিমাণে অন্যান্য পদার্থ যেমন– ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেন থাকে। এছাড়া এতে অতি সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন, আর্গন ও হিলিয়াম থাকে।

পেট্রোলিয়াম: পেট্রোলিয়াম হলো খনিজ তেল অর্থাৎ খনিতে পাওয়া যায় যেসব তরল জ্বালানি পদার্থ, তারাই হলো পেট্রোলিয়াম। সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে খনিতে পেট্রোলিয়ামও থাকে। প্রোপেন ও বিউটেন স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় (২৫° সেলসিয়াস) গ্যাসীয় হলেও উচ্চ চাপে তরল অবস্থায় থাকে বলে এরাও পেট্রোলিয়ামের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া গ্যাসোলিন, কেরোসিন, ডিজেল এসবই পেট্রোলিয়াম।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম তৈরি হয়? প্রাকৃতিক গ্যাস কীভাবে তৈরি হয় তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরি হয় মৃত গাছপালা ও প্রাণীদেহ থেকে। হাজার হাজার বছর আগে মরে যাওয়া গাছপালা ও প্রাণীর পচা দেহাবশেষ কাদা ও পানির সাথে ভূগর্ভে জমা হয়। সময়ের সাথে

সাথে এরা বিভিন্ন রকম শিলা স্তরে ঢাকা পড়ে। শিলা স্তরের চাপে পচা দেহাবশেষ ঘনীভূত হয় এবং প্রচণ্ড চাপে ও তাপে দেহবশেষে বিদ্যমান জৈব পদার্থ প্রাকৃতিক গ্যাসে ও পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়। প্রকৃতিতে এভাবে উৎপন্ন গ্যাসের খনিকে আমরা গ্যাসকূপ বলি।

প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামের প্রক্রিয়াকরণ: প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রক্রিয়াকরণ একটি জটিল শিল্পপ্রক্রিয়া, যেটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। সাধারণভাবে যেখানে গ্যাসকূপ পাওয়া যায়, সেখানেই প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করা হয়। প্রক্রিয়াকরণ অনেকাংশে নির্ভর করে গ্যাসের গঠন অর্থ্যাৎ এতে বিদ্যমান অন্যান্য পদার্থের উপর। সাধারণত গ্যাসকূপ গ্যাস ও তেল একসাথে থাকে। তাই প্রথমেই তেলকে গ্যাস থেকে আলাদা করা হয়। এরপর প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকা বেনজিন ও বিউটেন ঘনীভূত করে আলাদা করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকা পানি দূর করার জন্য নিরুদকের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। অতঃপর গ্যাসে থাকা দূষক (H_2S, CO_2) পৃথক করা হয়। প্রাপ্ত গ্যাসের মিশ্রণ থেকে নাইট্রোজেন আলাদা করা হয়। এই অবস্থায় প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস বিশুদ্ধ মিথেন গ্যাস, যা পাইপলাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়।



চিত্র : ৮.৩ : প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণ

ব্যবহার: প্রাকৃতিক গ্যাস আমরা নানা কাজে ব্যবহার করি। এর মধ্যে অন্যতম হলো ইউরিয়া সার উৎপাদন। শতকরা প্রায় ২১ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস ইউরিয়া সারের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তোমরা কি জান, আমাদের দেশে বেশির ভাগ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা! শতকরা প্রায় ৫১ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাসই বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। প্রায় শতকরা ২২ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয় শিল্প-কারখানায়, ১১ ভাগ বাসা-বাড়িতে ও ১১ ভাগ জ্বালানি হিসেবে। এছাড়া প্রায় শতকরা ১ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকি শতকরা ৫ ভাগ অপচয় (System loss) হয়।

আমাদের দেশে ২০০৩ সাল থেকে যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে।

সীমাবদ্ধতা ও সংরক্ষণ: তোমাদের কি মনে হয় আমাদের যে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ আছে তা অফুরন্ত? না, তা নয়। মজুদ প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ নির্দিষ্ট ও সীমিত। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে একসময় তা শেষ হয়ে যাবে। তাই এই মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে আমাদের অত্যন্ত সচেতন হতে হবে, কোনোমতেই অপচয় করা যাবে না। তোমরা হয়তো দেখবে অনেকে বাসা–বাড়িতে বিনা প্রয়োজনে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখে এবং এতে অতি মূল্যবান এই সম্পদের অপচয় করে যা কোনোমতেই সমীচীন নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই যার যার নিজের বাসায় ও মহল্লায় সবাইকে সচেতন করতে হবে।

পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার: পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের বড় একটি অংশ ব্যবহৃত হয় যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে। কৃষিজমিতে সেচকাজে, ডিজেল চালিত ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শিল্প–কারখানায় সার, কীটনাশক, মোম, আলকাতরা, লুব্রিকেন্ট, গ্রিজ ইত্যাদি তৈরিতেও পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয়।

পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াকরণ: খনি থেকে প্রাপ্ত তেল মূলত নানারকম হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য পদার্থের (যেমন– সালফার) মিশ্রণ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা সরাসরি ব্যবহারের উপযোগী হয় না। তাই অপরিশোধিত তেল পরিশোধন অত্যাবশ্যক। সেজন্য প্রথমেই প্রায় ৪০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় উপাদানগুলোকে আলাদা করা হয়।

কয়লা: কয়লা হলো কালো বা বাদামি কালো রঙের একধরনের পাললিক শিলা। এতে বিদ্যমান মূল উপাদান হলো কার্বন। তবে স্থানভেদে এতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে হাইড্রোজেন (H_2), সালফার (S), অক্সিজেন (O_2), ও নাইট্রোজেন (N_2) থাকে। কয়লা একটি দাহ্য পদার্থ, তাই জ্বালানি হিসেবে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের মতো কয়লা একটি জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel) হলেও এর গঠনপ্রক্রিয়া আলাদা। প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বছর আগে জলাভূমিতে জন্মানো প্রচুর ফার্ন, শৈবাল, গুল্ম ও অন্যান্য গাছপালা মরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কয়লা তৈরি হয়েছে। গাছপালায় বিদ্যমান জৈব পদার্থে থাকা কার্বন প্রথমে জলাভূমির তলদেশে জমা হয়। এভাবে জমাকৃত কার্বনের স্তর আস্তে আস্তে পলি বা কাদার নিচে চাপা পড়ে যায় এবং বাতাসের সংস্পর্শ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কার্বনের স্তর আবার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পানিযুক্ত, স্পঞ্জের মতো ছিদ্রযুক্ত জৈব পদার্থে পরিণত হয় যাকে বলা হয় পিট (Peat)। পিট অনেকটা হিউমাসের মতো পদার্থ। পরবর্তীতে উচ্চ চাপে ও তাপে এই পিট পরিবর্তিত হয়ে কার্বন সমৃদ্ধ কয়লায় পরিণত হয়। কয়লা তিন রকমের হয়। যথা– অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমিনাস ও লিগনাইট। অ্যানথ্রাসাইট হলো সবচেয়ে পুরানো ও শক্ত কয়লা, যা প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বছর আগে তৈরি এবং এতে শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ কার্বন থাকে। বিটুমিনাস কয়লা প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বছরের পুরানো এবং এতে শতকরা ৫০–৮০ ভাগ কার্বন থাকে। লিগনাইট কয়লা ১৫০ মিলিয়ন বছরের পুরানো আর এতে সর্বোচ্চ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত কার্বন থাকে।

প্রক্রিয়াকরণ: কয়লার খনি থেকে মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভ থেকে কয়লা উত্তোলন করা হয়। কয়লা উত্তোলনের জন্য দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হলো ওপেন পিট মাইনিং (Open Pit Mining) আর অপরটি হলো ভূগর্ভস্থ মাইনিং (Underground Mining)। সাধারণত কয়লার স্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে বলে ওপেন পিট মাইনিং পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়। মেশিন দিয়ে কয়লা ভূগর্ভ থেকে তোলার পর কনভেয়ারবেল্ট দিয়ে প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে নেওয়া হয়। সেখানে কয়লায় থাকা অন্যান্য পদার্থ যেমন– ময়লা, শিলা কণা, ছাই, সালফার ইত্যাদি পৃথক করে ফেলা হয়।

ব্যবহার: তোমরা কি জান কোন কোন কাজে কয়লা ব্যবহার করা হয়? বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কয়লা ব্যবহৃত হয় ইটের ভাটায়, জ্বালানি হিসেবে শিল্প–কারখানায় ও বাসাবাড়িতে জ্বালানি হিসেবে সামান্য পরিমাণ কয়লা ব্যবহৃত হয়। তবে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ব্যবহৃত না হলেও বিশ্বের সব দেশেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার খুবই বেশি। এছাড়া হোটেল–রেস্তোরায় কাবাব জাতীয় খাবার তৈরিতে এবং কর্মকার ও স্বর্ণকারগণ বিভিন্ন সামগ্রী ও

অলংকার তৈরির সময় কয়লা ব্যবহার করে থাকেন।

প্রাকৃতিক জ্বালানির সংরক্ষণে নবায়নযোগ্য শক্তি: আলোচিত প্রাকৃতিক জ্বালানির সব গুলোই এক সময় নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। তাই এগুলোর ব্যবহার কমানো ও সংরক্ষণের জন্য আমরা নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে পারি। সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ, পানির স্রোত ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে আমরা প্রাকৃতিক জ্বালানির উপর চাপ কমাতে পারি এবং ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সবচেয়ে নরম খনিজ কোনটি?

ক. হীরা খ. ট্যালক
গ. সিলিকা ঘ. চুনাপাথর

২. সাবসয়েল স্তরের মাটি-

i. শিলাচূর্ণে ভরপুর
ii. খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ
iii. জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

টোকিও শহরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছাকাছি মাটিতে কোনো উদ্ভিদ জন্মে না কেবল মাশরুম ভালো জন্মে।

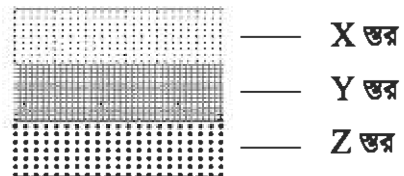
৩. ঐ মাটিতে কোনটির আধিক্য রয়েছে?

ক. শিলা খ. খনিজ পদার্থ
গ. জৈব পদার্থ ঘ. তেজস্ক্রিয় পদার্থ

৪. কোন মাটিতে ভালো ফসল ফলে?

ক. বালু ও খনিজ মিশ্রিত মাটিতে খ. খনিজ ও খনিজ পদার্থ মিশ্রিত মাটিতে
গ. বালি ও পলি মিশ্রিত মাটিতে ঘ. বালি, পলি ও কাঁদা মিশ্রিত মাটিতে

নিচের চিত্রটি থেকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৫. কোন স্তরে শিলাচূর্ণ থাকে?

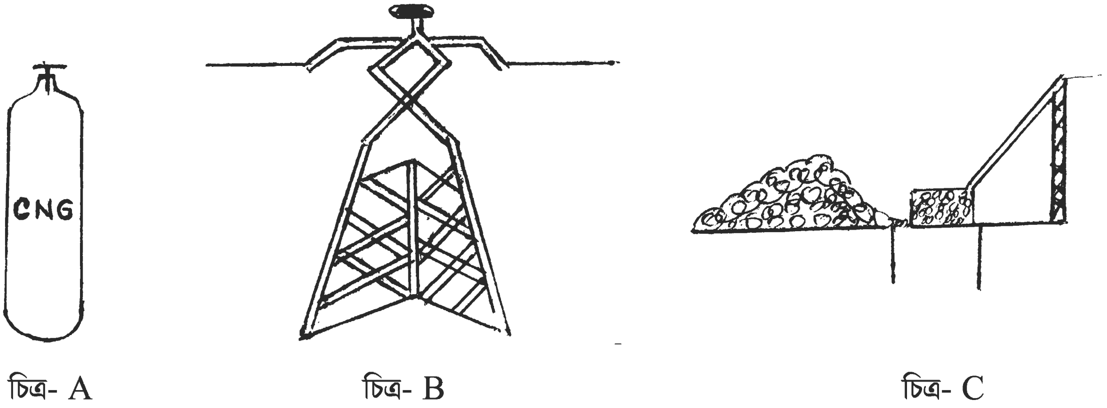
ক. X স্তরে খ. Y স্তরে
গ. Z স্তরে ঘ. Z স্তরের নিচে

৬. সবচেয়ে উপরের স্তরের মাটিতে ভালো ফসল হওয়ার কারণ হলো, এ মাটিতে-

ক. জৈব পদার্থ থাকে
খ. খনিজ উপাদান থাকে
গ. শিলাচূর্ণ বিদ্যমান
ঘ. অনুজীব থাকে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের চিত্র তিনটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



চিত্র- A　　চিত্র- B　　চিত্র- C

ক. পেট্রোলিয়াম কী?
খ. জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে কী বুঝায়?
গ. A চিত্রের জ্বালানিটি খনি থেকে তুলে কীভাবে ব্যবহার উপযোগী করা হয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. চিত্র B এর শক্তি উৎপাদনের জন্য A ও C জ্বালানিটির মধ্যে কোনটি বেশি সাশ্রয়ী? যুক্তিসহ মতামত দাও।

২. বকুলদের এলাকার মাটি শিলা ও খনিজ পদার্থ মিশ্রিত। এ মাটির কণাগুলো আকারে বড়। পানি খুব তাড়াতাড়ি সরে যায়। অপরদিকে শাহীনদের এলাকার মাটির কণাগুলো আকারে ছোট এবং জৈব ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ।

ক. বায়বায়ন কাকে বলে?
খ. হরাইজোন কীভাবে তৈরি হয়?
গ. বকুলদের এলাকার মাটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বকুল ও শাহীনদের এলাকার মধ্যে কোনটিতে বেশি ফসল ফলবে? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।

নবম অধ্যায়

দুর্যোগের সাথে বসবাস

বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা ইত্যাদি নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে লেগেই আছে। এসব দুর্যোগে জানমালের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বড় অন্তরায়। পরিবেশের ওপর আমাদের নানারকম হস্তক্ষেপের ফলে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাম্প্রতিক কালে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবেলার কৌশল এবং তাৎক্ষণিক করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সুস্থ জীবনযাপনে মানসম্মত ও উন্নত পরিবেশের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রকৃতির সংরক্ষণশীলতার বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- নিজ এলাকায় মানসম্মত ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করতে পারব।
- দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং দুর্যোগে করণীয় বিষয়ে সমাজকে সচেতন করা বিষয়ে পোস্টার অংকন করতে পারব।
- প্রকৃতির সংরক্ষণশীলতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ে পোস্টার অংকন করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করব।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

এর আগে তোমরা আবহাওয়া ও জলবায়ু এবং এদের পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জেনেছ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল বা প্রভাব সম্পর্কে এখন আমরা জেনে নিই।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতিমধ্যেই লক্ষণীয় পর্যায়ে চলে এসেছে। নিচে এগুলো তুলে ধরা হলো।

১) ঋতুর পরিবর্তন: বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ এবং প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এ ঋতুচক্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে দেখা যাচ্ছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল হলেও দেখা যাচ্ছে যে আশ্বিন মাসেও ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং তা অসময়ে বন্যার কারণ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে শীতকাল ধীরে

ধীরে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এটিও লক্ষণীয় যে গ্রীষ্মকালে অনেক বেশি গরম পড়ছে এবং মাঝে মাঝে দেশের কোনো কোনো এলাকায় দিনের তাপমাত্রা ৪৫–৪৮° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে শীতের সময় কখনো কখনো তাপমাত্রা অনেক বেশি কমে যাচ্ছে। অস্বাভাবিক এই গরম ও শীতের কারণে প্রাণহানিও ঘটছে।

২) বন্যা: নদীমাতৃক বাংলাদেশে বন্যা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং অনেকাংশেই দরকারি। কেননা বন্যার ফলে জমিতে পলি পড়ে, যা জমির উর্বরতা বাড়ায়। এতে ফসল উৎপাদন ভালো হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন ও অসময়ে প্রলয়ংকারী বন্যা লক্ষ করা যাচ্ছে। আগের দিনে এ ধরনের বন্যা যে হয়নি তা নয়, তবে এত ঘন ঘন হয়নি। ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০৫ সালে বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী বন্যায় জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এ কারণে সামগ্রিক অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চল বন্যাপ্রবণ নয়, যেমন– যশোর, ঢাকা সে সকল অঞ্চলও এখন বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে।

৩) নদীভাঙন: নদী মাতৃক বাংলাদেশে নদীভাঙন একটি স্বাভাবিক ঘটনা হলেও সাম্প্রতিককালে তা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এতে একদিকে যেমন বিপুল জনগোষ্ঠী ঘর–বাড়ি হারাচ্ছে ও দরিদ্র হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে আবাদি জমিও নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে, যা বিশাল জনসংখ্যার আমাদের দেশের জন্য একটি মারাত্মক সমস্যা। নদী ভাঙনের ফলে গৃহহারা লোকজন যাযাবরের মতো বা শহর অঞ্চলের বস্তিতে অমানবিক জীবনযাপন করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বিগত তিন দশকে প্রায় ১৮০,০০০ হেক্টর জমি শুধু পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিন নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে।



চিত্র–৯.১ নদী ভাঙন

৪) খরা: কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় খরা বাংলাদেশের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে, যা বৃষ্টিপাতের উপর প্রচন্ড প্রভাব ফেলবে। কোনো কোনো অঞ্চলে একেবারেই কমে গিয়ে খরার সৃষ্টি করবে। জলবায়ুজনিত কারণে সৃষ্ট খরায় বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

৫) পানির লবণাক্ততা: জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে বাংলাদেশের প্রায় এক–তৃতীয়াংশ পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি মূল ভূখন্ডে ঢুকে নদ–নদী ও ভূগর্ভস্থ পানি এবং আবাদি জমি লবণাক্ত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় একদিকে যেমন খাওয়ার পানির প্রচন্ড অভাব দেখা যাবে, অন্যদিকে তেমনি জমিতে লবণাক্ততার জন্য ফসল উৎপাদনও ব্যাহত হবে। অতি সাম্প্রতিককালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৮৩০,০০০ হেক্টর জমি লবণাক্ততার কারণে কৃষি অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। কাজেই জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ত পানির কারণে বাংলাদেশ ভয়াবহ খাদ্য ঝুঁকিতে পড়বে।

বিশেষজ্ঞগণের মতে, জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে ২১০০ সালের মধ্যে ৩০% খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাবে আর ২০৫০ সাল নাগাদ চাল এবং গমের উৎপাদন যথাক্রমে ৮.৮% ও ৩২% হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় বাগেরহাট খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ১৩% কৃষিজমি ইতিমধ্যেই লবণাক্ততার শিকার হয়ে গেছে। ২০৫০ সাল নাগাদ তা ১৬% এবং ২১০০ সাল নাগাদ ১৮% এ পৌঁছাবে।

৬) সামুদ্রিক প্রবাল ঝুঁকি: সামুদ্রিক প্রবাল তাপমাত্রার প্রতি খুব সংবেদনশীল। সাধারণত ২২–২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রবালের জীবনযাপনের জন্য উপযোগী। এই তাপমাত্রার ১–২° বেড়ে গেলেই তা প্রবালের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে কাজ করে। এক গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৬০ সালে সেন্টমার্টিন দ্বীপে যে পরিমাণ প্রবাল ছিল, ২০১০ সালে তার প্রায় ৭০% বিলীন হয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য এক্ষেত্রে পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি ছাড়াও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা না থাকাও অন্যতম কারণ।

৭) বনাঞ্চল: বাংলাদেশের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন, যা শুধু যে জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এক বন তা নয়, এটি আমাদের মহামূল্যবান সম্পদ। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া ঐ অঞ্চলে সাইক্লোন, হারিকেন প্রতিরোধে এই সুন্দরবন রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিককালের ঝড়ে এর বড় একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে সমুদ্রের পানির উচ্চতা যদি ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়ে, তাহলে আমাদের একমাত্র এই ম্যানগ্রোভ বনের ৭৫% পানির নিচে তলিয়ে যাবে। আর যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বাড়ে তাহলে প্রায় পুরো সুন্দরবন ও এর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

৮) মৎস্য সম্পদ: মাছে–ভাতে বাঙালি এই কথাটির যথার্থতা যেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অনেক নদীতে আর আগের মতো পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাছের বাসস্থান, খাদ্য সংগ্রহ এবং জৈবিক নানা প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে, এমনকি মাছ মারাও যায়। অনেক মাছ ও মাছের পোনা পানির তাপমাত্রা ৩২° সেলসিয়াসের বেশি হলে মরে যায়। যেহেতু উচ্চ তাপমাত্রা (৩৫° সেলসিয়াস) রোগজীবাণু জন্মাতে সাহায্য করে, তাই মাছে রোগ সংক্রমণ বেশি হয় ও মাছের মড়ক লাগে। এছাড়া লবণাক্ত পানি মূল ভূখণ্ডের মিঠা পানিতে ঢুকে পড়লে মিঠা পানির মাছও বাঁচতে পারবে না।

৯) স্বাস্থ্য ঝুঁকি: জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন প্রলয়ংকরী বন্যায় মারাত্মক পানিদূষণ ও পানিবাহিত নানাবিধ রোগ, বিশেষ করে কলেরা, ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে। অসময়ে বন্যা–খরার কারণে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়, যা খাদ্যঘাটতি সৃষ্টি করে, এমনকি দুর্ভিক্ষও হতে পারে, যা স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে এক চরম পর্যায়ে নিয়ে যাবে। পানির মতো বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বাড়লে রোগজীবাণু বেশি জন্মাবে ও নানারকম রোগ সংক্রমণ বেড়ে যাবে। আগে আমরা কখনো অ্যানথ্রাক্স রোগের কথা বাংলাদেশে শুনিনি। বিগত ৩–৪ বছর যাবৎ বর্ষার মৌসুমে বাংলাদেশে, বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ জেলায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। এতে গবাদিপশু ও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এ এলাকার পশু চিকিৎসক ও খামারিদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হলে মানুষের ক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসায় ভালো হলেও গবাদিপশুর জন্য মৃত্যু অবধারিত। জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে অ্যানথ্রাক্সের মতো অনেক প্রাণঘাতী রোগ–জীবাণু সৃষ্টি হতে পারে।

১০) জীববৈচিত্র্য: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ৩০% জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

১১) সাইক্লোন: সাইক্লোনের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘন ঘন ও অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক আকার ধারণ করবে।

এ বিষয়ে এই অধ্যায়েই তোমরা আরো বিস্তারিত জানবে।

জলবায়ু পরিবর্তন: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তন–সংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) তাদের চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্ট (AR4) অনুযায়ী জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের প্রভাব অনেক মারাত্মক এবং তা ধীরে ধীরে বেড়েই চলছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা গত ১০০ বছরে প্রায় ০.৭৪° সেলসিয়াস বেড়েছে। ১৯৬১–২০০৩ সালের মধ্যে গড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছরে ১.৮ সেন্টিমিটার বেড়েছে। পাহাড় পর্বতে জমে থাকা বরফের পরিমাণ অনেক কমে গেছে ইতিমধ্যেই। ১৯৯৫–২০০৬ পর্যন্ত ১২ বছরের মধ্যে ১১ বছরই প্রচন্ড গরম পড়েছে। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী দুই দশকে বায়ুমন্ডলীয় তাপমাত্রা গড়ে প্রতি দশ বছরে ০.২–০.৩° সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। ধারণা করা হচ্ছে, ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.১–৬.৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। সেই সাথে সাথে নাতিশীতোষ্ণ ও বিষুবরেখা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে পানির প্রাপ্যতা বেড়ে যাবে এবং বিষুবরেখার নিকটবর্তী ও মাঝামাঝি স্থানে পানির প্রাপ্যতা কমে যাবে। অর্থাৎ কোনো অঞ্চলে প্রলয়ংকরী বন্যার আশঙ্কা অনেক প্রকট হবে, আর কোনো কোনো অঞ্চল ভয়াবহ খরার কবলে পড়বে। ২০৮০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৩৪ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। এতে বাংলাদেশের মতো অনেক দেশ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। তোমরা কি জান মালদ্বীপ ও ভারতের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই পানিতে ডুবে গেছে? বিগত কয়েক বছরে যেমন সাইক্লোন, টাইফুন, হারিকেন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে, ভবিষ্যতে তা আরো প্রকট হবে। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়, আইলা, সিডর, হারিকেন নার্গিস, ক্যাটরিনার কথা আমরা সবাই জানি। এ ধরনের ভয়াবহ দুর্যোগ আরো ঘন ঘন হবে ও তার মাত্রা আরো ভয়ানক হতে পারে।

পরিবেশগত সমস্যা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি স্থান এখন নানা রকম পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত। তোমরা কি এরকম সমস্যা অনুধাবন করতে পারছ? নানা রকম পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population growth)। এটি একদিকে যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আবার অনেক পরিবেশগত সমস্যার মূল কারণও এটি। তোমরা কি জান বর্তমানে সারা বিশ্বে জনসংখ্যা কত? প্রায় ৬.৬ বিলিয়ন। বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা দাড়াবে প্রায় ১০ বিলিয়ন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৫০ সালের পর থেকে শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বনভূমি উজাড় হয়ে গেছে। সাথে সাথে হাজার হাজার বনজ গাছপালা ও জীবজন্তুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খোদ বাংলাদেশেই হাজার হাজার একর আবাদি জমি নষ্ট হচ্ছে। এটিই স্বাভাবিক, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি সব রকমের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে ও কর্মসংস্থানের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মসংস্থানের চাপ সামলানোর জন্য নতুন নতুন শিল্প–কারখানা তৈরি হচ্ছে যার কারণে আবাদি জমিসহ বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। বিপুল জনসংখ্যার জন্য চাহিদার ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ নদ–নদীতে মাছের যেন রীতিমত আকাল পড়ে গেছে। মাছে–ভাতে বাঙালি এই কথাটি আজ অনেকটাই রূপকথার গল্পের মতো শোনায়।

১৯৯১–৯২ সালে বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৯.৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টন যা ২০০৭–২০০৮ সালে দাঁড়ায় প্রায় ৩০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ২০১০–১১ সালে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। প্রায় ২০ বছর সময়ের ব্যবধানে খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হলেও প্রতিবছরই খাদ্যঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। যে কারণে

বছরে প্রায় ৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। ফলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তোমরা কি জান ১৯৯১–৯২ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত ছিল? বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০ কোটির মতো, যা বর্তমানে প্রায় ১৫ কোটি। আমাদের এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি কম হতো তাহলে আজ বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারত; বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হতো যা অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যেত। এ ব্যাপারে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে এবং জনগণকে সচেতন করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়?

তোমরা জান যে একটি এলাকায় একদিকে যেমন শিশুর জন্ম হয়, অপরদিকে নানা বয়সের লোক মৃত্যুবরণ করে। কোনো একটি এলাকায় বছরে শিশু জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান হলে ঐ এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। কিন্তু একটি এলাকায় যে কয়জন লোক মৃত্যুবরণ করে তার চেয়ে জন্মসংখ্যা যদি বেশি হয়, তা হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া না পাওয়া অবশ্য আরো দুটি অবস্থার ওপর নির্ভর করে আর তাহলো বহির্গমন ও বহিরাগমন। বহির্গমনের ফলে একটি দেশের জনসংখ্যা কমে যায় আর বাইরে থেকে আগমনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হলো জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে অনেক বেশি।

আরেকটি পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো নগরায়ণ (Urbanization)। এটিও মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ জনসংখ্যার বড় একটি অংশ শহরমুখী হয়ে পড়েছে। একই সাথে শহরাঞ্চলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে খুব একটা কম তাও নয়। গ্রামীণ জনপদের শহরমুখিতা ও শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শহর এলাকায় আবাসন, সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং এর ফলে আশেপাশের আবাদি জমি ধ্বংস করে বা জলাভূমি ভরাট করে নগরায়ণ করা হচ্ছে। নতুন নগরায়ণের অনেক ক্ষেত্রেই ভালো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা না থাকায় জীবনযাপনে নানাবিধ সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming)

এর আগের শ্রেণিতে তোমরা বৈশ্বিক উষ্ণতা কী তা জেনেছ। এর মূল কারণ হলো কার্বন ডাই–অক্সাইডসহ ওজোন, মিথেন, সিএফসি, নাইট্রাস অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প, যারা গ্রিন হাউস গ্যাস নামে পরিচিত, তাদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। এগুলো বাড়ার কারণ কী? এই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর মূল উৎস হলো যানবাহন, শিল্প–কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া, রেফ্রিজারেটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ইত্যাদি। এছাড়া কিছু কিছু প্রাকৃতিক কারণ (যেমন– আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, প্রাকৃতিকভাবে গাছপালার ক্ষয়) ইত্যাদি দায়ী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যানবাহন, শিল্প–কারখানা, বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে ফলে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণও বেড়ে যাচ্ছে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এতে করে প্রাকৃতিক উপায়ে গাছপালার দ্বারা কার্বন ডাই–অক্সাইডের শোষণ কমে যাচ্ছে যার ফলে বায়ুমন্ডলে এর পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ এই গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ না কমালে, বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যাবে। ফলে জলবায়ুজনিত পরিবর্তন ঘটবে। জলবায়ুজনিত পরিবর্তন ঘটলে কী কী বিরূপ প্রভাব পড়বে তা তোমরা এই অধ্যায়ের শুরুতে জেনেছে।

কার্বন দূষণ (Carbon Pollution)

কার্বন দূষণ বলতে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াকেই বুঝায়। কার্বন ডাই–অক্সাইডের

পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ তোমরা আগের পাঠে জেনেছ।

বনশূন্য করা (Deforestation)

বনশূন্য করা একটি মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যা। তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছ যে বনশূন্য করা বা বনভূমি উজাড় হওয়ার মূল কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঘর–বাড়ি, রাস্তাঘাট, অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি সব রকম চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আর প্রতিটি চাহিদাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বনশূন্য করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল ও তাৎক্ষণিক করণীয়

বন্যা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জন্য বন্যা একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিবছরই বন্যায় দেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে ফসল, গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়, যা মাঝে মাঝে প্রলয়ংকারী আকার ধারণ করে। ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে প্রলয়ংকরী বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে এই ক্ষতির মাত্রা এত বেশি ছিল যে, তা বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের কারণ ঘটায়। এখন প্রশ্ন হলো এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যার কারণ কী? বন্যা সৃষ্টির পিছনে বেশ কিছু জটিল কারণ আছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো নদ–নদীগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা। নদীভাঙন, বর্জ্য অব্যবস্থাপনাসহ নানা কারণে নদ–নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় এদের পানি ধারণক্ষমতা কমে গেছে। যে কারণে ভারী বর্ষণ বা উজানের অববাহিকা থেকে আসা পানি খুব



চিত্র–৯.২ বন্যা

সহজেই নদী ভরে দুকূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। এছাড়া মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট জোয়ারের কারণে উজানের পানি নদ–নদীর মাধ্যমে সাগরে যেতে পারে না। ফলে নদ–নদীর আশেপাশের এলাকায় বন্যা সৃষ্টি হয়। আবার বাংলাদেশের বেশির ভাগ এলাকা সমতল হওয়ায় বৃষ্টির পানি সহজে নদ–নদীতে গিয়ে পড়তে পারে না। কাজেই ভারী

বন্যা দেখা দেয় বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে। সাম্প্রতিক কালে ঘূর্ণিঝড় আইলা ও সিডর এবং এদের প্রভাবে সৃষ্ট বন্যার কথা আমরা সবাই জানি। এখন আমরা এই বন্যা প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল, করণীয় ও উপায় সম্পর্কে জেনে নেই। যেহেতু বন্যা সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ হলো নদ–নদীসমূহের সীমিত পানি ধারণক্ষমতা, তাই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে নদী খনন করে এদের পানি ধারণক্ষমতা বাড়াতে হবে। এতে ভারী বর্ষণ বা উজানের পানি আসলেও বন্যা হওয়ার প্রবণতা কমে যাবে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ১৯৬০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ৮০০০ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। তবে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ভাঙনের ফলে অনেক জেলায় (বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ জেলায়) বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা দেখা দেয়, যা সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও ব্যক্তিগণের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা বা দুর্নীতির কারণেই ঘটে থাকে।

নদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও বন্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা নেওয়া যেতে পারে। নদী প্রশিক্ষণ হলো, নদীর পাড়ে পাথর, সিমেন্টের ব্লক, বালির বস্তা, কাঠ বা বাঁশের টিবি ইত্যাদির মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ করা। এছাড়াও নদীর পাড়ে গাছ লাগানো, পানিপ্রবাহের জন্য স্লুইস গেট নির্মাণ ইত্যাদিও নদী প্রশিক্ষণেরই অংশ।

বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী

বন্যা সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রচার করে বন্যাজনিত ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমানো যেতে পারে। তবে বাংলাদেশের (৫৮টি) অধিকাংশ নদীর উৎপত্তিস্থল ভারত, নেপাল ও ভুটানে হওয়ায় সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া অনেক বড় ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে উল্লিখিত পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে, যাতে এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেয়া যায়। এছাড়া নিচু ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় যাতে জনবসতি গড়ে না উঠতে পারে সেজন্য ভূমি ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে আইনি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। ফলপ্রসূ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি বন্যা মোকাবেলায় অত্যান্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ভয়াবহ বন্যা হলে সরকারি উঁচু ভবন বা স্থাপনা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ কাজে লাগাতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আবার উঁচু স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র বা মালামাল সংরক্ষণ কেন্দ্র, উঁচু রাস্তাঘাট, বাজার, স্কুল, মসজিদ, কবরস্থান ইত্যাদি তৈরি করে বন্যা মোকাবেলা করা যায়। বন্যার সময় বেশির ভাগ রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে যায়। সেক্ষেত্রে চলাচলের জন্য নৌকার ব্যবস্থা রাখাও বন্যা মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বন্যার আগাম প্রস্তুতিও বন্যা মোকাবিলার একটি কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়। বিপুল জনসংখ্যা ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়লে এবং কোনো রকম আগাম প্রস্তুতি যেমন– পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য, পানি, ঔষধপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা না থাকলে তা ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাতে পারে। কোনো একটি এলাকা বন্যাকবলিত হলে মানুষের কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা থাকে না। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জীবন যাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এদের পুনর্বাসনের জন্য ত্রাণ তহবিলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

খরা (Drought)

খরা একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন মাটিতে পানির পরিমাণ কমতে কমতে মাটি পানি শূন্য হয়ে যায় এবং ফলে মাটিতে গাছপালা বা শস্য জন্মাতে পারে না। ব্রিটিশরা একটানা দুই সপ্তাহ ০.২৫ মিলিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হলে তাকে খরা (Absolute Drought) আর একটানা ৪ সপ্তাহ ০.২৫ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত না হলে তাকে

আংশিক খরা (Partial Drought) বলে। রাশিয়াতে একটানা ১০ দিন মোট ৫ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি না হলে তাকে খরা বলে আর আমেরিকাতে একটানা ৩০ দিন বা তার বেশি সময়ের মধ্যে যেকোনো ২৪ ঘণ্টায় ৬.২৪ মিলিমিটার বৃষ্টি না হলে ঐ অবস্থাকে খরা হিসেবে ধরে।



চিত্র–৯.৩ খরা

খরা একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। খরা হলে ফসল উৎপাদন কমে যায় এবং তা দুর্ভিক্ষের কারণও হতে পারে। খরার ফলে গবাদিপশুর জন্যও খাদ্যসংকট দেখা দেয়, কৃষিনির্ভর শিল্প–কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়, যা কর্মসংস্থানের জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। মাটির উর্বরতা কমে যায়। দীর্ঘস্থায়ী খরার কারণে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা (রাজশাহী, নওয়াবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর, বরিশাল) খরার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশে ১৯৭৮–৭৯ সালে ভয়াবহ খরা হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই খরায় ক্ষতির পরিমাণ ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ বন্যার চেয়েও বেশি।

কেন খরা হয়? খরা হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ও পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হওয়া। বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি হলে এমনটি ঘটে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অপরিকল্পিত উন্নয়ন, বৃক্ষনিধন এবং গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমন্ডল ধীরে ধীরে রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে উঠেছে, ফলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, যা খরা সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত কমে সৃষ্ট খরার জন্য পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মেরু অঞ্চলে সৃষ্ট এলনিনোকে (El-Nino) দায়ী করা হচ্ছে।

খরার জন্য দায়ী একটি অন্যতম কারণ হলো গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ পানির যথেচ্ছ উত্তোলনের ফলে পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে যাওয়া। এছাড়া নদীর গতিপথ পরিবর্তন, উজান থেকে পানি প্রত্যাহার, পানি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অভাব, ওজোন স্তরের ক্ষয় ইত্যাদি কারণও খরা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

এখন প্রশ্ন হলো, খরা প্রতিরোধে বা খরা মোকাবিলার জন্য কী করা যেতে পারে? যেহেতু খরার মূল কারণ হলো পানির অপার্যপ্ততা, তাই পানির সরবরাহ বাড়ানোই খরা মোকাবিলার সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায়। বাংলাদেশের প্রায় ৫৫টি নদীর উৎসস্থল ভারত। ভারত কর্তৃক শুষ্ক মৌসুমে ঐ সকল নদ–নদীর পানির গতিপথ পরিবর্তন ও পানি প্রত্যাহার বাংলাদেশে খরার অন্যতম কারণ। এর আগে গঙ্গা নদীর পানিও ভারত একতরফাভাবে ব্যবহার করত। কিন্তু ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পানি বণ্টন চুক্তির ফলে বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে। গঙ্গার পানি চুক্তির মতো

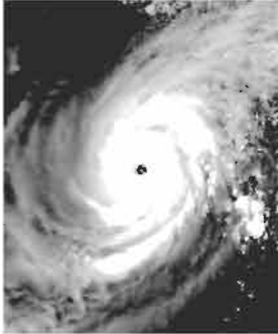
তিস্তাসহ অন্যান্য নদীর পানি বণ্টনের জন্য ভারতের সাথে পানি বণ্টন চুক্তি করা যাতে শুষ্ক মৌসুমে ভারত একতরফাভাবে উজান থেকে পানি প্রত্যাহার না করতে পারে।

কিছু ফসল আছে যেগুলো মাটিতে পানি কম থাকলেও জন্মাতে পারে। যেমন– গম, পিয়াজ, কাউন ইত্যাদি। খরা পীড়িত এলাকার মানুষকে এ জাতীয় ফসল চাষ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। সেই সাথে সাথে যে সমস্ত ফসল উৎপাদনে অনেক বেশি পানির প্রয়োজন হয়, যেমন– ইরি ধান, সেগুলো চাষে অনুৎসাহিত করা যেতে পারে।

খরা মোকাবেলা করার জন্য পুকুর, নদ–নদী, খাল–বিল খনন করে পানি ধরে রেখে তা খরার সময় ব্যবহার করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বৃষ্টির মধ্যে উন্নত দেশে খরা মোকাবেলার চেষ্টা করা হলেও তা খুব একটা প্রসার হয়নি।

সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় (Cyclone)

সাইক্লোন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ "Kyklos" থেকে যার অর্থ হলো Coil of Snakes বা সাপের কুন্ডলী। সাইক্লোনের স্যাটেলাইট ছবি থেকে দেখা যায়, প্রচন্ড গতিবেগ সম্পন্ন বাতাস কুন্ডলীর আকারে ঘুরপাক খাচ্ছে (চিত্র৯.৪)। অর্থাৎ নিম্নচাপজনিত কারণে যখন প্রচন্ড গতিবেগে ঘূর্ণনের আকারে বাতাস বয় তাকেই সাইক্লোন বা ঘূণিঝড় বলে। একে আমেরিকাতে হারিকেন (Hurricane), দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতে টাইফুন (Typhoon) এবং দক্ষিণ এশিয়াতে সাইক্লোন বলে।



চিত্র–৯.৪ ঘূর্নিঝড়



চিত্র–৯.৫ ঘূর্নিঝড়ের ধ্বংস যজ্ঞ

বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আর ফানেল আকৃতির উপকূলীয় এলাকা বিদ্যমান। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ সাইক্লোনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ১৯৬০ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০ বার বাংলাদেশে সাইক্লোন আঘাত এনেছে। এর মধ্যে ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৯১, ২০০৭ ও ২০০৯ সালের সাইক্লোন ছিল প্রলয়ংকরী। তবে ১৯৭০ সালের সাইক্লোনটি স্মরণকালের সবচেয়ে প্রলয়ংকরী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ ঝড়ে প্রায় ৫ লক্ষ প্রাণহানি ঘটেছে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার প্রাণহানি ঘটেছে। ২০০৭ ও ২০০৯ সালের সাইক্লোন যথাক্রমে সিডর ও আইলাতে যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৭ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। এছাড়া লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এ দুটি সাইক্লোনে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১.৭ বিলিয়ন ও ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সাইক্লোন সৃষ্টির কারণ ও করণীয়

যেহেতু সাইক্লোন সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে, তাই এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সহজসাধ্য নয়। তবে যে দুটি কারণ মূলত সাইক্লোন সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে তারা হলো নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা। সাধারণত সাইক্লোন তৈরি হতে সাগরের

তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াসের বেশি হতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত বঙ্গোপসাগরে প্রায় সারা বছরই তা বিদ্যমান থাকে। সাগরে বৃষ্টিপাতের ফলে সুপ্ত তাপ (Latent Heat) ছেড়ে দেয়, যা বাষ্পীভবন বাড়িয়ে দেয়। আবার এই সুপ্ততাপের প্রভাবে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রাও বেড়ে যায় ও ফলে বায়ুমন্ডল অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে আশেপাশের বাতাস সেখানে ধাবিত হয়, যা বাড়তি তাপমাত্রার কারণে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠতে থাকে ও সাইক্লোন সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের বেগ অনেক বেশি হয়। তবে বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ৬৩ কিলোমিটার বা তার বেশি হলে তা সাইক্লোন হিসেবে গণ্য করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে সবচেয়ে শক্তিশালী সাইক্লোন আঘাত হানে ১৯৯১ সালে, যেখানে বাতাসের বেগ ছিল ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার।

এখন প্রশ্ন হলো, সাইক্লোনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কি কোনো উপায় আছে? আর সাইক্লোন হলে করণীয়ই বা কী? সাইক্লোন অত্যন্ত শক্তিশালী। এমনকি একটি দুর্বল সাইক্লোনও শক্তিতে মেগাটন শক্তির কয়েক হাজার পারমাণবিক বোমার সমতুল্য হয়। তাছাড়া যেহেতু এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তাই এটি প্রতিরোধ করা প্রায় অসাধ্য। তবে সম্প্রতি আমেরিকাতে ঝড়ের সময় সিলভার আয়োডাইড (AgI) নামক রাসায়নিক দ্রব্য বাতাসে ছড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ কমানোর উপায় আবিষ্কৃত হলেও নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এছাড়া সাগরে তেল বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ছিটিয়ে বাষ্পীভবন কমিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তবে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের জন্য এই জাতীয় সমাধান বাস্তবভিত্তিক নয়। তাহলে কী করা যেতে পারে?

প্রথমত আমাদের ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের আরেকটি মারাত্মক দিক হলো জলোচ্ছ্বাস। তাই উঁচু করে মজবুত আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। নিচু এলাকায় বসবাসরত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জলোচ্ছ্বাস ঠেকানোর জন্য উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ তৈরি করতে হবে। সাথে সাথে সেখানে প্রচুর গাছপালা লাগিয়েও ক্ষতির পরিমাণ কমানো যাবে।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে। বাংলাদেশে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্টের যৌথ উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সাইক্লোন প্রস্তুতি কার্যক্রম চালু আছে। এর আওতায় প্রায় ৩২০০০ স্বেচ্ছাসেবী উপকূলীয় এলাকায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য কাজ করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রম আরো অনেক বেশি জোরদার করতে হবে।

সুনামি (Tsunami)

Tsunami জাপানি শব্দ। 'সু' অর্থ বন্দর এবং 'নামি' অর্থ ঢেউ। সুতরাং সুনামি অর্থ হলো বন্দরের ঢেউ। এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সমুদ্রতলদেশে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস এবং নভোজাগতিক ঘটনা সুনামি সৃষ্টি করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সুনামিকে পৃথিবীর তৃতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সুনামির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মহাসাগর ও সাগরের তলদেশের প্লেট দুমড়ে দেয়া, যার ফলে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড ভূমিকম্প। সমুদ্রের পানি লক্ষ লক্ষ টনের বিশাল ঢেউ তৈরি করে। আর এই ঢেউ যত বেশি তীরভূমির কাছাকাছি যায় আরও দীর্ঘ হয়ে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে রূপ নেয়। এই ঢেউয়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০০ থেকে ৮০০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। খোলা সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতা তিন ফুট পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু ঢেউ যতই তীরের দিকে যায়, ততই শক্তি সঞ্চয় করে, বাড়ে উচ্চতা। তখন ঢেউয়ের এক মাথা থেকে আরেক মাথার দূরত্ব হতে পারে ১০০ মাইল পর্যন্ত, অগভীর পানিতে সুনামি ধ্বংসাত্মক জলোচ্ছ্বাসে রূপ নেয়। অগ্রসরমাণ জলরাশি ভয়ঙ্কর স্রোত সৃষ্টি করে নেমে যাবার আগে ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু

হতে পারে। উপকূলের ব্যাপক এলাকা প্লাবিত করতে পারে। উপকূলীয় জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। সুনামির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো ভূমিকম্পের মতো সুনামি সম্পর্কেও পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। ফলে সুনামির সৃষ্টি হলেও উপকূলীয় জনপদের লোকজনদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।



চিত্র–৯.৬ সুনামি

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর স্মরণকালের ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কাছাকাছি ভারত মহাসাগরের তলদেশে সৃষ্টি হয়েছিল ট্যাক্টনিক ভূমিকম্প। সুমাত্রার ভূমিকম্পটির কেন্দ্র বা ইউরেশিয়ান প্লেট ও অস্ট্রেলিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় মারাত্মক ভূকম্পন। রিখটার স্কেলের এই ভূকম্পনের ফলে ভারত মহাসাগরের একাংশে সুমাত্রার অন্য একটি অংশকে সজোরে চাপ দেয়। এই প্রবল চাপে সমুদ্রতলের ৬০০ মাইলব্যাপী এলাকায় ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এই ভাঙনের ফলে স্থানচ্যুতি ঘটে লক্ষ লক্ষ টন জলরাশির। বিশাল জলরাশি ভয়ানক বেগে ধেয়ে আসে সমুদ্রপৃষ্ঠের দিকে এবং বিশাল সব ঢেউয়ের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢেউ মহাপ্লাবনে রূপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণ–পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া ছাড়িয়ে কেনিয়া, সোমালিয়াসহ ১২টি আফ্রিকান দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। জলোচ্ছ্বাসে তিন লাখের মতো মানুষ নিহত হয়। একমাত্র ইন্দোনেশিয়ায় সুমাত্রার আচেহ প্রদেশে নিহত হয়েছে এক লাখ দশ হাজার মানুষ। তারপর বেশি লোক নিহত হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। সুনামির জলোচ্ছ্বাসে ভারত মহাসাগরের বহু ছোট ছোট দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এসব দ্বীপে বসবাসকারী বহু আদিবাসী গোষ্ঠী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছে শিশু ও নারী, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। ভূতত্ত্ববিদ ও সমুদ্র বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই সুনামির তীব্রতা এতটাই প্রবল ছিল যে পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে কিছুটা নড়ে যায়। এ ছাড়া ভূকম্পনের ফলে যে বিপুল পরিমাণ বিকিরণ হয় তা সাড়ে নয় হাজার পারমাণবিক বোমার সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। সমুদ্র তলদেশে ব্যাপক ভাঙনের ফলে এতদিনকার ভারত মহাসাগরের সমুদ্রপথের দিকনির্দেশনার মানচিত্র এলোমেলো হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নতুন করে ভারত মহাসাগরে নৌচলাচলের মানচিত্র তৈরি করতে হবে; নইলে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সুনামিতে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হয়নি। কারণ অগভীর পানিতে সুনামি তার শক্তি হারায়। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত অগভীর পানি বিস্তৃত। এই অগভীর পানিতে এসে সুনামি শক্তি হারিয়ে ফেলে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর চেয়ে সুনামিতে বাংলাদেশের ক্ষতি সামান্য। কুয়াকাটার সমুদ্র উপকূলে সে সময় মাছ ধরা ট্রলার ডুবে দুজন জেলে মারা পড়েছিল, এমন খবর শোনা গিয়েছিল। ১৭৬২ সালের ২

এপ্রিল বঙ্গোপসাগরের আরাকান অঞ্চলে সংঘটিত এক ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি বাংলাদেশে আঘাত হেনেছিল। কক্সবাজার ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এর প্রভাবে ঢাকার বুড়িগঙ্গায় হঠাৎ পানি বেড়ে যাওয়ায় যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে শত শত নৌকা ডুবে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

এসিড বৃষ্টি (Acid Rain)

সাধারণত বৃষ্টিপাত এসিডিক হয়। তবে যখন বৃষ্টিতে অনেক বেশি পরিমাণ এসিড বিদ্যমান থাকে, তখন তাকে এসিড বৃষ্টি বলে। তোমরা কি জান এসিড বৃষ্টিতে কী কী এসিড থাকে? এসিড বৃষ্টিতে সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড বেশি থাকে এবং অল্প পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকে। এসিড বৃষ্টি পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এমনকি এসিডের প্রতি সংবেদনশীল অনেক গাছ মরে যায়। এছাড়া কিছু অতি প্রয়োজনীয় উপাদান (যেমন–Ca, Mg) এসিড বৃষ্টিতে দ্রবীভূত হয়ে মাটি থেকে চলে যায় যা ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলে । এসিড বৃষ্টি হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পানিসম্পদ ও জলজ প্রাণীসমূহের। তোমরা জান যে, পানিতে এসিড থাকলে pH ৭–এর কম হয়। pH-এর মান ৫–এর কম হলে বেশির ভাগ মাছের ডিম নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মাছ উৎপাদন ব্যাহত হয়। মাছের রেণু বা পোনা এসিডের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এসিডের মাত্রা বেশি হলে পুরো জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মানুষের শরীরের জন্যও এসিড বৃষ্টি ক্ষতিকর। মানবদেহে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের সমস্যা, অ্যাজমা ও ব্রঙ্কাইটিসের মতো মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে এসিড বৃষ্টি।

এসিড বৃষ্টি কেন হয়?

এসিড বৃষ্টি সৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্য–সৃষ্ট কারণ জড়িত। প্রাকৃতিক কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, বজ্রপাত, গাছপালার পচন ইত্যাদি। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রোজেন অক্সাইড ও সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিঃসৃত হয়, যা পরে বাতাসের অক্সিজেন ও বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে নাইট্রিক এসিড ও সালফিউরিক এসিড তৈরি করে। একইভাবে বিভিন্ন শিল্প–কারখানা বিশেষ করে কয়লা বা গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বা অন্যান্য শিল্প–কারখানা, যানবাহন, গৃহস্থালির চুলা ইত্যাদি উৎস থেকেও সালফার ডাই–অক্সাইড নির্গত হয়, যা এসিডে পরিণত হয় এবং বৃষ্টির পানির সাথে মিশে এসিড বৃষ্টি তৈরি করে।



চিত্র–৯.৭ ইটের ভাটা

এখন দেখা যায় এসিড বৃষ্টি হলে কী কী করণীয় আছে? যেহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত কয়লা থেকে নাইট্রোজেন অক্সাইড ও সালফার ডাই–অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়, সেহেতু কয়লা পরিশোধন করে সালফার ও নাইট্রোজেন মুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে। উন্নত বিশ্বে ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা চালু আছে। পরিশোধন ব্যবস্থা না থাকলে কয়লার পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করা যেতে পারে। এসিড বৃষ্টি হলে মাটির pH কমে যায় এবং

সেক্ষেত্রে লাইমস্টোন বা চুনাপাথর ব্যবহার করে এসিডিটি নষ্ট করা হয়।

এছাড়া শিল্প–কারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত ধোয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। শিল্প কারখানায় দূষণ রোধক পদ্ধতি অবশ্যই বাধ্যতামূলক করতে হবে। তবে আমাদের দেশে এসিড বৃষ্টি খুব একটা হয় না। যেসব দেশ শিল্প–কারখানায় অনেক উন্নত, সেখানে এর আশঙ্কা অনেক বেশি। পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশ, আমেরিকা, কানাডা এবং চীনের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে ও তাইওয়ানে ঘন ঘন এসিড বৃষ্টি হয়।

টর্নেডো (Tornado) বা কালবৈশাখী

আমাদের অতি পরিচিত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো টর্নেডো বা কালবৈশাখী। বাংলাদেশ ছাড়াও আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশেই টর্নেডো আঘাত হানে। টর্নেডোর সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো এটি হঠাৎ করে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচন্ড ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করে। টর্নেডো শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ 'Tornada' থেকে, যার অর্থ হলো Thunder storm বা বজ্রঝড়। সাইক্লোনের মতো টর্নেডোর ক্ষেত্রেও প্রচন্ড বেগে বাতাস ঘূর্ণির আকারে প্রবাহিত হয় এবং পথিমধ্যে যা পড়ে তার সবই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। টর্নেডোর ক্ষেত্রে বাতাসের গতিবেগ সাইক্লোনের চেয়ে বেশি হয় এবং তা সাধারণত ঘণ্টায় ৪৮০–৮০০ কিলোমিটার হতে পারে। টর্নেডোর বিস্তার মাত্র কয়েক মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৫–৩০ কিলোমিটার হতে পারে। সাইক্লোনের সাথে টর্নেডোর মূল পার্থক্য হলো সাইক্লোন সৃষ্টি হয় সাগরে এবং এটি উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে আর টর্নেডো যে কোনো স্থানেই সৃষ্টি হতে পারে ও আঘাত হানতে পারে। সাইক্লোনের মতো টর্নেডোর জন্যও লঘু বা নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়াই প্রধান কারণ। এর ফলে উষ্ণ বাতাস উপরে উঠে যায় এবং ঐ শূন্য জায়গা পূরণের জন্যই শীতল বাতাস প্রচন্ড বেগে ঐ শূন্য জায়গার দিকে ধাবিত হয় বলেই টর্নেডো সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে একটি প্রলয়ংকরী টর্নেডো আঘাত আনে ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়াতে। ঐ আঘাতের ফলে টর্নেডোর গতিপথের মধ্যে প্রায় সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশে সাধারণত বৈশাখ (April-May) মাসে টর্নেডো হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছর ছোট বড় ১০৪টির মতো টর্নেডো বাংলাদেশে আঘাত হানে।

স্মরণকালের ভয়াবহ টর্নেডোর মধ্যে একটি হলো ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার ডেমরা থানায়। ঐ টর্নেডোতে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় প্রায় ৬৪৪ কিলোমিটার। যেহেতু টর্নেডোর বেলায় পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রচার করা সম্ভব হয় না, তাই এক্ষেত্রে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া যায় না। তাই দুর্গত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত ত্রাণ সরবরাহ ও পুনর্বাসন কাজ করাই হলো একমাত্র সমাধান। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সকল সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি।

ভূমিকম্প (Earthquake)

ভূ–অভ্যন্তরে হঠাৎ সৃষ্ট কোনো কম্পন ভূত্বকে আকস্মিক আন্দোলন সৃষ্টি করে, সাধারণত তাকেই ভূমিকম্প বলে। ভূমিকম্প কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয় এবং পর্যায়ক্রমে একাধিকবার ঘটতে পারে। মৃদু ভূমিকম্প আমরা অনেক সময় অনুভব করতে পারি না, কিন্তু শক্তিশালী বা প্রবল ভূমিকম্প সহজেই অনুভব করা যায়।

ভূমিকম্প কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ? হ্যাঁ, এটি একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোনো একটি দেশ বা অঞ্চল পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারে। এমনকি নদীর গতিপথও পরিবর্তন করতে পারে। ভূমিকম্পের

ফলে আমাদের অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ বদলে গিয়েছে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের ভূমিকম্প না হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ বড় ধরনের ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিশ্বের মধ্যে জাপান ও আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত। তোমরা হয়তো অতিসম্প্রতি হাইতিতে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞ ও জাপানের সুনামি পরবর্তী ভূমিকম্প ও তা থেকে সৃষ্ট পারমাণবিক দুর্ঘটনার কথা জান।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে এই ভূমিকম্প হয়? আমাদের ভূগর্ভ (Earths Crust) কতগুলো ভাগে বিভক্ত, যাদেরকে টেকটনিক প্লেট (Tectonic Plate) বলে। এই টেকটনিক প্লেট কিন্তু স্থিতিশীল নয়, চলমান হতে পারে। এই টেকটনিক প্লেট স্থান পরিবর্তনের সময় একে অপরের সাথে সজোরে আঘাত লাগে, আর সেই আঘাতের ফলেই ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপ করা হয় রিখটার স্কেলে। বাংলাদেশে ১৮৮৫ সালের ১৪ জুলাই রিখটার স্কেলে ৭.০ মাত্রার ভূমিকম্প হয় বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে যার উৎপত্তিস্থল ছিল মানিকগঞ্জের কাছাকাছি। এই ভূমিকম্পে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ১৮৯৭ সালের ১২ জুন ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে রিখটার স্কেলে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের শিলং এবং আশেপাশের ৪০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এতে প্রায় ১০,০০০ মানুষ মারা যায়। এছাড়া ১৯১৮ সালের ৮ জুলাই শ্রীমঙ্গলে ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে।

ভূমিকম্প হলে করণীয় কী? এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় আছে কি?

ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই, তবে এতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঘর–বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরি। তোমরা হয়তো জান যে জাপানে বেশির ভাগ ঘর–বাড়ি একসময় তৈরি হতো কাগজ বা হালকা কাঠ দিয়ে। অর্থাৎ ঘর–বাড়ি ভারী জিনিস দিয়ে তৈরি না করে হালকা জিনিস দিয়ে তৈরি করলে ভূমিকম্পের পর ঐ সমস্ত জিনিসের নিচ থেকে উদ্ধার কাজ যেমন সহজে করা যায়, তেমনি প্রাণহানিও কম হয়। আমাদের দেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে যে সকল বড় বড় দালান–কোঠা তৈরি করা হয়, সেখানে অবশ্যই ভূমিকম্প প্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্যথায় বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। এছাড়া ভূমিকম্প হলে জরুরি ভিত্তিতে সরকারি ও অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে যথাসম্ভব দ্রুত ত্রাণ তৎপরতা ও উদ্ধারকাজ নিশ্চিত করতে হবে এবং তার জন্য আগাম প্রস্তুতি থাকতে হবে। বেশ কয়েকটি বিষয় সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে। সেগুলো হলো:

১) আমাদের বাসস্থান সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতে হবে এবং এতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি কতটুকু তা জানতে হবে। ঝুকিপূর্ণ বড় ভবনে থাকা যাবে না।

২) ঘর–বাড়ি বা অফিসে ৩–৪ দিনের পানি, খাবার, আলো না থাকলেও যাতে বাঁচা যায়, সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩) এটাও মাথায় রাখতে হবে যে শুধু নিজে, পরিবার ও প্রতিবেশী ছাড়াও অন্যান্য লোকজনের ব্যাপারেও সুনজর রাখতে হবে।

৪) জরুরি এবং দ্রুত সাড়া দেয়ার প্রস্তুতি থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস, হাসপাতাল, স্কুল বা পুলিশ বাহিনীর কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

৫) বিদ্যুৎ, পানি, রাস্তাঘাট, যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোন ইত্যাদি সব রকমের ব্যবস্থা রাখতে হবে দ্রুত ত্রাণ কাজের জন্য। সরকারিভাবে অগ্রধিকার ভিত্তিতে এ কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে।

৬) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭) ভূমিকম্পের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে এবং তা মোকাবিলার জন্য একটি পরিকল্পনা আগে থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

৮) কিছু শুকনা খাবার, পানি, টর্চলাইট, ছোট রেডিও, ব্যাটারি, প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, কিছু ঔষধপত্র, বাঁশি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র-এগুলো হাতের কাছে রাখতে হবে।

মানসম্মত ও উন্নত পরিবেশের গুরুত্ব

আমাদের জীবনধারণের জন্য যে আবশ্যকীয় উপাদান আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো বাতাস। বাতাস বা অক্সিজেন ছাড়া আমরা কতক্ষণ বাঁচতে পারি বলতো? মাত্র ৪০–৫০ সেকেন্ড। এই বাতাস যদি দূষিত হয়, এতে যদি নানা রকম ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ (যেমন– CO, SO_2, SO_3, NO_2 ইত্যাদি), ধুলাবালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা থাকে, তবে তা অক্সিজেনের সাথে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ও প্রাণঘাতী নানা রকম রোগ (যেমন– ফুসফুসের ক্যান্সার) সৃষ্টি করে। একইভাবে রাসায়নিক পদার্থ গাছপালা, মাটি, অন্যান্য প্রাণী সবকিছুর জন্যই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। বাতাসের মতো পানিও আমাদের জীবনধারণের জন্য অতি জরুরি একটি উপাদান। নদ–নদীর পানি দূষিত হলে সেখানে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। বাতাস ও পানির মতো পরিবেশের প্রতিটি উপাদানই আমাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। এই পরিবেশ যদি মানসম্মত ও উন্নত না হয়, তবে তা সকল জীববৈচিত্র্যের জন্য বড় রকমের হুমকি হয়ে দাঁড়াবে ও আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে পড়বে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের নিজেদের যেমন সচেতন হতে হবে পাশাপাশি জনগণকেও সচেতন করতে হবে।

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতা হলো আমাদের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা। আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ হলো পানি, বাতাস, মাটি, খনিজ সম্পদ, গাছপালা, প্রাণিজ সম্পদ, তেল, গ্যাস ইত্যাদি। আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রতিটি সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ। বাতাস, পানি না থাকলে বা ধ্বংস হলে আমরা যেমন বাঁচতে পারব না, তেমনি তেল, গ্যাস ও গাছপালা ছাড়াও বেঁচে থাকা অসম্ভব। চাঁদে কি কোনো প্রাণী আছে? না, নেই। কারণ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ হয়তো সেখানে ছিল, কিন্তু সংরক্ষণ না করার কারণে তা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরাও যদি আমদের প্রকৃতি সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা না নিই, গাছপালা বনজ সম্পদ নিধন বন্ধ না করি, বাতাস, পানি ইত্যাদির দূষণ বন্ধ না করি, তাহলে আমাদের এই প্রকৃতি আর বাসযোগ্য থাকবে না এবং আমাদের কোনো অস্তিত্বও থাকবে না।

প্রকৃতির সংরক্ষণশীলতার বিভিন্ন কৌশল

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার বেশ কয়েকটি কৌশল আছে। সেগুলো হলো–

১. সম্পদের ব্যবহার কমানো।

২. দূষণ থেকে সম্পদ রক্ষা করা।

৩. একই জিনিস সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বারবার ব্যবহার করা।

৪. ব্যবহৃত জিনিস ফেলে না দিয়ে তা থেকে নতুন জিনিস তৈরি করা।

৫. প্রাকৃতিক সম্পদ পুরোপুরি রক্ষা করা।

এখন এই কৌশলগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাক।

১. সম্পদের ব্যবহার কমানো: আমরা পরিমিত সম্পদ ব্যবহার করে সম্পদ রক্ষা করতে পারি। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। আগের দিনে মানুষ চিঠিপত্র লিখত কাগজ–কলম দিয়ে, ব্যাংকের স্টেটমেন্ট পেত কাগজে। এখন তথ্য প্রযুক্তির সুবাদে কাগজ–কলম ব্যবহার না করে ই–মেইল বা টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে চিঠির কাজ করা যায়। একইভাবে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট কাগজে না লিখে ই–মেইলের মাধ্যমেও পাঠানো যায়। এখানে আমরা কাগজ–কলমের ব্যবহার কমিয়ে দিলাম। আবার আমরা একেক জন ২০–৩০টি শার্ট না পরে যদি ৫টা শার্ট ব্যবহার করি, তাহলেও কিন্তু সম্পদের ব্যবহার কমে গেল। আবার শার্ট বা অন্য জামাকাপড় কেনার সময় তোমরা খেয়াল করবে অনেক সময় ৭–৮টি স্টিকার লাগানো থাকে। এগুলো কি খুব দরকারি? মোটেও না। শার্ট বা জামাকাপড়ে একটি স্টিকার থাকলেই যথেষ্ট। এবার তোমরা নিজেরা বের কর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন কাজে এভাবে সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে প্রকৃতি সংরক্ষণ করতে পারি। কাগজ তৈরি হয় গাছপালা থেকে, কাগজের ব্যবহার কমানোর অর্থই হলো গাছপালা কম কাটতে হবে আর তাতে বনজ সম্পদ রক্ষা পাবে অর্থাৎ প্রকৃতির সংরক্ষণ হবে।

২. দূষণ থেকে সম্পদ রক্ষা করা: আমাদের প্রকৃতি বা সম্পদ দূষিত হলে তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো নদ–নদীর পানি। তোমরা অনেকে হয়তো বুড়িগঙ্গা নদীর কথা জান। দূষণের ফলে নদীর পানি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে আজ আর বুড়িগঙ্গা নদীতে মাছ তো দূরের কথা কোন জলজ প্রাণীই খুঁজে পাওয়া কঠিন। বুড়িগঙ্গা নদীর মতো বাংলাদেশের অনেক নদীই দূষণের শিকার হয়েছে। এসব দূষণ রোধ করা না গেলে এমন এক সময় আসবে যখন নদ–নদীতে মাছই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৩. একই জিনিস বারবার ব্যবহার করা: সম্ভব হলে একই জিনিস বারবার ব্যবহার করে প্রকৃতি সংরক্ষণ করা যায়। যেমন ধর কাপড়–চোপড়। পুরাতন অনেক কাপড় ফেলে না দিয়ে ধুয়ে আবার ব্যবহার করা যায়। একইভাবে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে হাজারো জিনিস আছে, যা একবার ব্যবহার করে ফেলে না দিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। আমাদের ব্যবহার্য অনেক জিনিস শিল্প–কারখানায় তৈরি হলেও তা কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল। কাজেই একই জিনিস বারবার ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কমে এবং এতে প্রকৃতি সংরক্ষণ হয়।

৪. ব্যবহৃত জিনিস ফেলে না দিয়ে তা থেকে নতুন জিনিস তৈরি করা: পুরাতন জিনিস একেবারে ফেলে না দিয়ে তা থেকে নতুন জিনিস তৈরি করেও প্রকৃতি সংরক্ষণ করা যায়। এতেও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ কমে, যেমন– পুরাতন প্লাস্টিক থেকে নতুন প্লাস্টিক সামগ্রী, ফেলে দেয়া কাগজ থেকে টয়লেট পেপার, গৃহস্থালির বর্জ্য থেকে জৈব সার ইত্যাদি নানা রকম জিনিসের কথা বলা যায়।

৫. প্রাকৃতিক সম্পদ পুরোপুরি রক্ষা করা: প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার একটি অনন্য উপায় হলো একে রক্ষা করা বা এতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করা। তোমরা হয়তো জান অনেক দুষ্কৃতকারীরা সুন্দরবনে হরিণ, বাঘ এগুলো শিকার করে বা চুরি করে গাছ কাটে। এসব কার্যক্রম বন্ধ করাই হলো প্রকৃতি সংরক্ষণ। সুন্দরবনের মতো আমাদের অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, যা রোধ করা অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

কাজ: মানসম্মত ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির অন্তরায় ও করণীয়। ৪–৫ জন বন্ধু বা সহপাঠী মিলে একটি গ্রুপ তৈরি কর। নিজ নিজ এলাকায় পরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিত কর। এক্ষেত্রে পানিদূষণ, যত্রতত্র ময়লা ফেলা, খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি বিবেচনায় রাখ। এসব দূষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে পোস্টার বা লিফলেট তৈরি করে সবার মাঝে বিলি কর। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতা কাজে লাগাও। প্রয়োজনবোধে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, পরিবেশবাদী সংগঠন বেসরকারি সংস্থার সাহায্য নাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন দুর্যোগটি শুধুমাত্র সাগরে সংঘটিত হয়?

ক. কালবৈশাখী খ. ভূমিকম্প

গ. সুনামি ঘ. বন্যা

২. গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণ-

i. যানবাহন

ii. শিল্প কারখানা

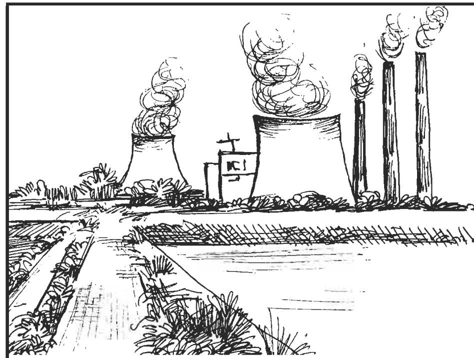
iii. বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র অবলম্বনে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩. চিত্রে প্রদর্শিত কারখানা থেকে কোন গ্যাস নির্গত হয় না?

ক. SO_2 খ. CO_2

গ. NH_3 ঘ. NO_2

৪. উপরের কারখানা হতে নির্গত গ্যাসের মাধ্যমে সৃষ্ট এসিড বৃষ্টি মানুষের কোন রোগটি সৃষ্টি করে?

ক. বহুমূত্র খ. অ্যাজমা

গ. ক্যান্সার ঘ. হার্ট এ্যাটাক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নওশাদ মিয়ার বাড়ি বরগুনা জেলায়। তার বয়স ৭০ বছর। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরে তিনি ছাড়া সবাই মারা যান। ঘরবাড়ি সবকিছু ঝড়ে উড়ে যায়। ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল কয়েক মাইল দূরের আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সা'দ সাহেব আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ায় তার বাড়িঘর ধ্বংস হলেও পরিবারের সকল সদস্য বেঁচে আছে। আত্মীয় পরিজনহীন অসহায় বৃদ্ধ নওশাদ মিয়া শুধুই আফসোস করেন কেন তিনি সা'দ সাহেবের সাথে আশ্রয় কেন্দ্রে গেলেন না?

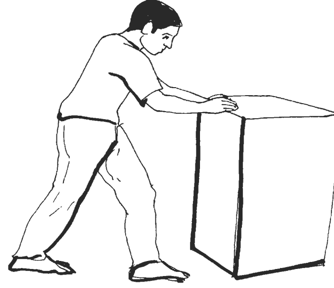
ক. সাইক্লোন কি?
খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘূর্ণিঝড় কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. নওশাদ মিয়া ঘূর্ণিঝড়ের কবল হতে রেহাই পাবার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে পারতেন? বিশ্লেষণ কর।

২. তুলি পড়ালেখা শেষ করে রাত ১২ টায় ঘুমাতে গেল। হঠাৎ লক্ষ করল, তার শোবার খাট ও সিলিং ফ্যান কাঁপছে এবং ঘরের তাকে রাখা হালকা জিনিসপত্র নিচে পড়ে যাচ্ছে। তুলি পরদিন সকালে লক্ষ করল, আশপাশের কিছু পুরাতন বিল্ডিং ফেটে গিয়েছে, আবার কোনটি ভেঙ্গে গিয়েছে এবং হেলে পড়েছে। তুলি বুঝতে পারল রাতে এক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছিল।

ক. খরা কী?
খ. বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় কবলিত দেশ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. তুলির লক্ষ করা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? বিশ্লেষণ কর।

দশম অধ্যায়
এসো বলকে জানি

আমরা প্রায় প্রতি মুহূর্তে কোনো কিছুকে টানছি বা ঠেলছি। কোনো বস্তুর গতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাইলেই আমরা টানি বা ঠেলি অর্থাৎ বল প্রয়োগ করি। বল প্রয়োগ করে স্থির বস্তুকে গতিশীল করা যায় আবার গতিশীল বস্তুর গতি পরিবর্তন করা যায়, এর গতি থামিয়ে দেওয়া যায়। এ অধ্যায়ে আমরা জড়তা, বল, স্থিতি ও গতির উপর বলের প্রভাব, নিউটনের প্রথম সূত্র, বলের প্রকৃতি, বলের পরিমাপ, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র,বলের ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া এবং নিউটনের তৃতীয় সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করব।



বলের ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বস্তুর জড়তা এবং বলের গুণগত ধারণা নিউটনের গতির প্রথম সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জড়তার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার বলের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যবহারিক জীবনে ঘর্ষণের সুবিধা বর্ণনা করতে পারব।
- স্থিতি ও গতির ওপর বলের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে বলের পরিমাপ করতে পারব।
- সহজ পরীক্ষণের সাহায্যে বল পরিমাপ করতে পারব।
- নিউটনের তৃতীয় সূত্রের সাহায্যে সংগঠিত কয়েকটি জনপ্রিয় ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে বলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারব।

ধাক্কা ও টানা : বল

তোমার কোনো বন্ধু যদি তোমার গায়ে হাত দিয়ে দূরে সরাতে চায় তুমি বলবে সে তোমাকে ঠেলছে বা ধাক্কা দিচ্ছে। কোনো কিছুকে দূরে সরাতে চাইলে আমরা ঠেলি বা ধাক্কা দিই। কোনো কিছুকে কাছে আনতে চাইলে আমরা তাকে টানি। কোন বস্তুর উপর অন্য বস্তুর ধাক্কা বা টানাই হচ্ছে বল। যখনই আমরা কোনো কিছুকে ঠেলি বা টানি, উঠাই বা বাঁকাই, মোচড়াই বা ছিঁড়ি, প্রসারিত বা সংকুচিত করি, আমরা আসলে বল প্রয়োগ করি। বিজ্ঞানী নিউটন বল, ভর, জড়তা ও গতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনটি সূত্র প্রকাশ করেন। এই তিনটি সূত্র নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্র নামে পরিচিত। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে বস্তুর জড়তা ও বল সম্পর্কে ধারণা পাই। এই প্রসঙ্গে নিউটনের প্রথম সূত্র হলো: **বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থিরই থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সুষম দ্রুতিতে সরলপথে চলতে থাকবে।**

জড়তা

হাঁটতে গেলে অনেক সময় আমরা দরজার চৌকাঠে, উঁচু–নিচু রাস্তায় বা রাস্তার ওপর পড়ে থাকা কোনো কিছুতে হোঁচট খাই। ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে অনেক সময় ফাউল করলে খেলোয়াড়কে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়। এ সবই ঘটে জড়তার কারণে। জড়তা কী?

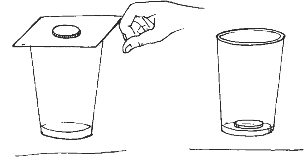
আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখি প্রত্যেক বস্তু যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় থাকতে চায়। বস্তু স্থির থাকলে স্থির থাকতে চায় আর গতিশীল থাকলে গতিশীল থাকতে চায়। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানি, বস্তুর স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে বল প্রয়োগ করতে হবে। **বস্তু যে অবস্থায় আছে চিরকাল সেই অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা সেই অবস্থা বজায় রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম, তাই জড়তা।**

সকল বস্তুর জড়তা থাকে। স্থিতিশীল বস্তুর চিরকাল স্থির থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা স্থিতি বজায় রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম, তাকে স্থিতি জড়তা এবং গতিশীল বস্তুর চিরকাল সমবেগে গতিশীল থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা ধর্ম তাকে গতি জড়তা বলা হয়।

জড়তার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা

থেমে থাকা বাস হঠাৎ চলতে শুরু করলে বাসযাত্রী পিছনের দিকে হেলে পড়েন জড়তার কারণে। বাস যখন থেমে থাকে তখন যাত্রীর শরীরও স্থির থাকে। কিন্তু হঠাৎ বাস চলতে শুরু করলে যাত্রীদের শরীরের বাসসংলগ্ন অংশ গতিশীল হয় কিন্তু শরীরের উপরের অংশ জড়তার জন্য স্থির থাকে এবং পিছনে হেলে পড়ে। একই কারণে চলন্ত বাস থেকে হঠাৎ নামতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে।

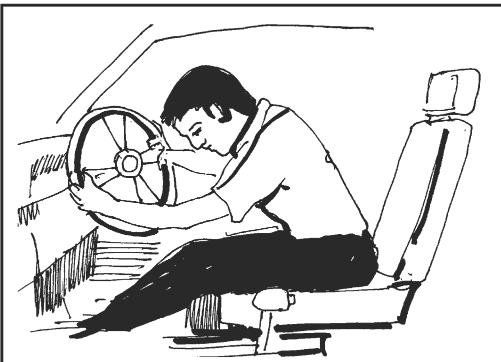
> **কাজ–১০.১ :** একটি গ্লাসের উপর একটি কার্ড বা শক্ত কাগজ রেখে তার উপর একটা পাঁচ টাকার কয়েন রাখ। (চিত্র ১০.১)। হঠাৎ কার্ডটিকে জোরে টোকা দাও। কী দেখলে?



চিত্র–১০.১

কয়েনটি গ্লাসের মধ্যে পড়ে গেল কেন? হঠাৎ জোরে টোকা দেওয়ার জন্য কার্ডটি সরে গেল, কিন্তু জড়তার কারণে কয়েনটি তার নিজস্ব স্থির অবস্থান বজায় রাখতে চাওয়ার জন্য গ্লাসের মধ্যে পড়ে গেল।

গাড়ি চালানোর সময় চালককে জড়তার কারণে সিটবেল্ট পরিধান করতে হয়। সিটবেল্ট ছাড়া চলমান গাড়ির চালক যদি হঠাৎ ব্রেক প্রয়োগ করেন, তবে জড়তার কারণে তিনি সামনে ঝুঁকে পড়বেন এবং স্টিয়ারিং ও উইন্ড স্ক্রিনে আঘাত পাবেন (চিত্র : ১০.২)। চিত্র ১০.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে সিট বেল্ট চালককে উইন্ড স্ক্রিনে আঘাত পাওয়া থেকে রক্ষা করছে।



চিত্র–১০.২



চিত্র–১০.৩

আমরা বড় বড় শহরের ট্রাফিক সিগন্যালবাতির ক্ষেত্রে জানি সবুজ বাতি সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি নির্দেশ করে আর লাল বাতি থামা নির্দেশ করে। আমরা দেখতে পাই সবুজ বাতির পর সরাসরি লাল বাতি না জ্বলে হলুদ বাতি জ্বলে। এর কারণ সবুজ বাতির পর লাল বাতি জ্বলে উঠলে দ্রুতগামী গাড়িকে থামার জন্য হার্ড ব্রেক ধরতে হতো এবং এতে জড়তার কারণে চালক এবং আরোহীদের আহত হওয়ার আশঙ্কা থাকত। হলুদ বাতি দেখে চালক ধীরে ধীরে থামার প্রস্তুতি নিতে পারেন।

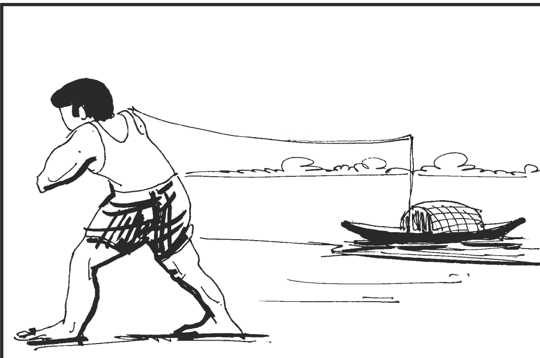
কোনো বস্তুর গতির দিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও আমরা জড়তার প্রভাব অনুভব করি। যদি কোনো বাস বা গাড়ি হঠাৎ বাঁক নেয় তাহলে মনে হয় আরোহীদের কেউ একপাশে ধাক্কা দিচ্ছে। এর কারণ বাস বা গাড়ির গতির দিকে আরোহীও গতিশীল ছিলেন, বাস বা গাড়ি হঠাৎ দিক পরিবর্তন করলেও জড়তার কারণে আরোহীর মূল দিক বজায় রাখতে চাওয়ার ফলে এক পাশে সরে যান।

নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে বলের গুণগত ধারণা

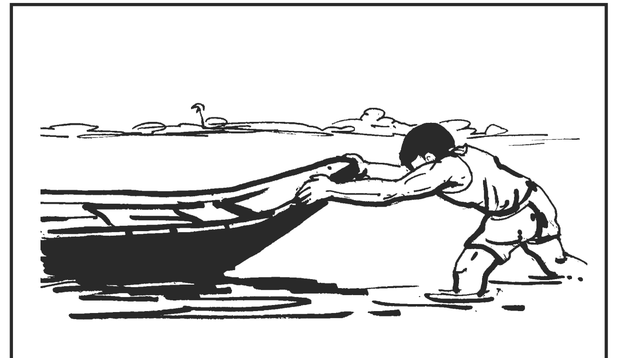
নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানি যে, কোনো বস্তুই নিজের থেকে এর অবস্থান পরিবর্তন করতে চায় না। বস্তু স্থির থাকলে স্থির থাকতে চায়, গতিশীল থাকলে গতিশীল থাকতে চায়। বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের জন্য বাইরে থেকে কিছু একটা প্রয়োগ করতে হয়। যা বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন করে বা করতে চায়, তাকেই বল বলা হয়। তাই নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা বলের গুণগত সংজ্ঞা পাই। নিউটনের প্রথম সূত্র অনুসারে– **যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় বা যা গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায়, তাকে বল বলে।**

নিচের ঘটনাটি থেকে বলের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হবে।

চিত্র ১০.৪ এবং ১০.৫–এ একটি ছেলেকে একটি নৌকা টানতে এবং ঠেলতে দেখা যাচ্ছে। তুমি কি মনে কর উভয় ক্ষেত্রেই নৌকাটি গতিশীল হবে? আসলে এটা নির্ভর করবে ছেলেটি কতটা সবল তার উপর। যদি ছেলেটি যথেষ্ট সবল হয়, তবে নৌকাটি গতিশীল হবে। আর যদি ছেলেটি যথেষ্ট সবল না হয়, তাহলে নৌকাটি কেবল গতিশীল হতে চেষ্টা করবে, সেটি স্থিরই থাকবে। একইভাবে কোনো গতিশীল বস্তুকে তুমি কেবল থামাতে পারবে যদি তুমি থামাবার মতো যথেষ্ট বল প্রয়োগ করতে পার। যদি তুমি না পার, তবে কেবল থামাতে সচেষ্ট হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি : যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকে বল বলে।



চিত্র–১০.৪



চিত্র–১০.৫

কাজ–১০.২ : বিভিন্ন বস্তুর ওপর যেমন একটি ফুটবল বা টেনিস বল, একটি স্প্রিং, প্লাস্টিকের কৌটা, রাবার ব্যান্ড ইত্যাদি নিয়ে ঠেলা বা টানা বল প্রয়োগ কর। কী লক্ষ করলে? বল কী কী করতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বলের প্রভাব

বল নিচের ঘটনাগুলো ঘটাতে পারে :

১. বল একটি স্থির বস্তুকে গতিশীল এবং গতিশীল বস্তুকে স্থির করতে পারে।

২. বল একটি বস্তুর গতির দিক পরিবর্তন করতে পারে।

৩. বল একটি গতিশীল বস্তুর বেগ হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারে।

৪. বল একটি বস্তুর আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে।

বলের প্রকৃতি

স্পর্শ বল : কোনো কোনো বল বস্তুর সরাসরি বা ভৌত সংস্পর্শে এসে বস্তুর উপর ক্রিয়া করে। মনে কর, তুমি যদি এক বালতি পানি বহন করতে চাও তাহলে তোমাকে বালতির হাতল ধরে বল প্রয়োগ করতে হবে। তুমি যদি তোমার স্কুল ব্যাগ উঠাতে চাও তাহলে তোমাকে এর হাতলে ধরতে হবে এবং বল প্রয়োগ করতে হবে। এগুলো পেশিজ বল। **যে বল কেবল দুটি বস্তুর ভৌত সংস্পর্শে এসে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে তাকে স্পর্শ বল বলে।** এ ধরনের বল হলো পেশিজ বল ও ঘর্ষণ বল। এখানে আমরা ঘর্ষণ বল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ঘর্ষণ বল : দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থেকে যদি একে অপরের ওপর দিয়ে চলতে চেষ্টা করে অথবা চলতে থাকে তাহলে বস্তুদ্বয়ের স্পর্শতলে এ গতির বিরুদ্ধে একটা বাধার উৎপত্তি হয়, এ বাধাকে ঘর্ষণ বলে। আর এ বাধার ফলে যে বল উৎপন্ন হয় তাকে ঘর্ষণ বল বলে। ঘর্ষণ হচ্ছে অতি সাধারণ একটি বল। যখন কোনো বস্তু অন্য বস্তুর ওপর দিয়ে চলতে চেষ্টা করে, তখন ঘর্ষণ বস্তুটিকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ঘর্ষণ সর্বদা গতিকে বাধা দেয়।

কাজ ১০.৩: একই পরিমাণ বল দিয়ে একটি মার্বেলকে পাকা ঘরের মেঝেতে গড়িয়ে দাও। দেখ কতটুকু দূরত্ব পর্যন্ত গেল। এবার মার্বেলটি সমপরিমাণ বল দিয়ে রাস্তায় গড়িয়ে দাও, দেখ কী পরিমাণ দূরত্ব গেল। কোন ক্ষেত্রে মার্বেলটি বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে?

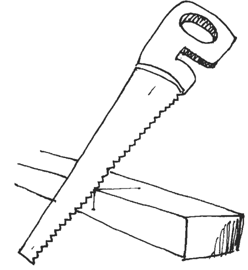
এই কাজটি থেকে দেখা যায় যে পৃষ্ঠ যত বেশি মসৃণ, ঘর্ষণ তত কম। তাই মসৃণ তলে মার্বেলটি অমসৃণ তলের চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত গিয়েছে। ঘর্ষণ বল শুধু চলমান বস্তুকেই থামিয়ে দেয় না, স্থির বস্তুকেও গতিশীল হতে বাধা দেয়। কোনো অমসৃণ বা খসখসে পৃষ্ঠে কোনো পাথরকে গতিশীল করা তাই কষ্টকর। ঘর্ষণ বল দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এরা হলো–

১. বস্তুর ভর : বস্তুর ভর বেশি হলে ঘর্ষণ বল বেশি উৎপন্ন হবে।

২. পৃষ্ঠের প্রকৃতি: পৃষ্ঠ অমসৃণ, খসখসে বা এবড়ো থেবড়ো হলে ঘর্ষণ বল বেশি উৎপন্ন হবে।

প্রত্যেক তলে কিছু উঁচু–নিচু খাঁজ থাকে যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। কোনো বস্তু যখন অপর বস্তুর ওপর দিয়ে টেনে বা ঠেলে নেয়া হয়, তখন এদের তলের এ উঁচু–নিচু খাঁজ করাতের দাঁতের মতো একে অপরের সাথে আটকে যায়, ফলে একটি তলের ওপর দিয়ে অপর তলের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ উঁচু–নিচু খাঁজ যত বেশি হবে অর্থাৎ তল যত বেশি অমসৃণ হবে, এক তলের ওপর দিয়ে অপর তলের গতি তত বেশি বাধা পাবে, সুতরাং ঘর্ষণ বল তত বেশি হবে।

ঘর্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘর্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ঘর্ষণ না থাকলে আমরা হাঁটতে পারতাম না, পিছলে যেতাম। কাঠে পেরেক বা স্ক্রু আটকে থাকত না, সম্ভব হতো না দড়িতে কোনো গিরো দেওয়া। ঘর্ষণ আছে বলেই আমরা হাত দিয়ে খাতা, কলম, বইসহ যাবতীয় জিনিস ধরতে পারি। গাড়ি বা সাইকেলের টায়ার ও ব্রেকের ঘর্ষণের ওপর আমাদের জীবন নির্ভরশীল। বাতাসের ঘর্ষণ আছে বলেই প্যারাসুট ব্যবহার করে কেউ বিমান থেকে নিরাপদে নামতে পারে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশকালে উল্কা বায়ুর সাথে ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।



চিত্র–১০.৬ করাত ও কাঠ

ঘর্ষণের জন্য আমাদের অসুবিধাও কম পোহাতে হয় না। যন্ত্রপাতির যে সকল অংশ পরস্পরের সাথে ঘষা খায় সেগুলো ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সময়ের সাথে সাইকেল, রিক্সা ও গাড়ির টায়ার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পেন্সিল দিয়ে লিখতে থাকলে এর মাথা ভোঁতা হয়ে যায়। তুমি কি নতুন জুতো ও পুরাতন জুতোর সোলের পার্থক্য লক্ষ করেছ? ঘর্ষণের ফলে জুতোর সোল ক্ষয়ে যায়। যন্ত্রের দক্ষতা হ্রাস পায় আবার ঘর্ষণের ফলে অনাবশ্যক তাপ উৎপন্ন হয়, এতেও যন্ত্রের ক্ষতি হয়।

ঘর্ষণকে সীমিতকরণ: আমাদের কাজ–কর্ম ও জীবনযাপন সহজ করার জন্য কখনো ঘর্ষণকে কমাতে হয় আবার কখনো ঘর্ষণকে বাড়াতে হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে তাই ঘর্ষণকে সীমিত করার দরকার হয়। কোনো তলকে খুব মসৃণ করে ঘর্ষণকে কমানো যেতে পারে। অনেক স্কুলে বা পার্কে শিশুদের খেলার জন্য স্লাইড থাকে। এটাকে খুব মসৃণ করে তৈরি করা হয়, যাতে শিশুরা সহজে পিছলে নামতে পারে। তেল বা গ্রিজ তলগুলোকে মসৃণ করে এবং ঘর্ষণকে কমিয়ে দেয়। এ কারণে যন্ত্রপাতির গতিশীল অংশগুলো তেল বা গ্রিজ দ্বারা আবৃত থাকে যা ঘর্ষণকে কমায় এবং যন্ত্রপাতিকে ক্ষয়–ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। তেল এবং গ্রিজের মতো পদার্থ যা ঘর্ষণ কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তাদেরকে লুব্রিকেন্ট বলে। ঘর্ষণ কমানোর আর একটি উপায় হচ্ছে কোনো তলের ওপর দিয়ে একটি বস্তুকে পিছলিয়ে নেওয়ার চেয়ে গড়িয়ে নেওয়া।

তুমি নিশ্চয় লক্ষ করেছ, কোনো কোনো স্যুটকেসে চাকা লাগানো থাকে। এই স্যুটকেসকে যদি তুমি চাকা না লাগানো অবস্থায় কোনো মেঝের উপর দিয়ে টেনে নাও আর চাকা লাগানো অবস্থায় টেনে নাও তাহলে কোনো পার্থক্য অনুভব করবে কি? তুমি নিশ্চয়ই বলবে চাকা লাগানো অবস্থায় টানা অনেক সহজ। কোনো ভারী বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর সহজ করার জন্য রোলার ব্যবহার করা হয়। অনুরূপভাবে যন্ত্রপাতির গতিশীল অংশগুলোর মাঝে অনেক সময় বল বিয়ারিং বসিয়ে ঘর্ষণ কমানো হয় এবং গতি সহজ করা হয়। বল বিয়ারিং হচ্ছে স্টিলের ক্ষুদ্র বল।

তলকে অমসৃণ করে ঘর্ষণ বাড়ানো হয়। যখন কোনো দেয়াশলাইয়ের কাঠিকে দেয়াশলাইয়ের বাক্সের পাশে টানা হয়, তখন দেয়াশলাইয়ের কাঠির মাথা এবং অমসৃণ তলের মধ্যকার ঘর্ষণের ফলে দেয়াশলাইয়ের কাঠির মাথার রাসায়নিক দ্রব্যাদি জ্বলে ওঠে এবং আমরা আগুন পাই।

হাঁটার জন্য ঘর্ষণ খুবই প্রয়োজনীয়। তুমি যদি তোমার জুতোর সোল পরীক্ষা করে দেখ, তাহলে দেখতে পাবে তা ঢেউ খেলানো। জুতো ও রাস্তার মধ্যবর্তী ঘর্ষণ বাড়ানোর জন্য এরূপ করা হয়। এতে জুতো ভালোভাবে রাস্তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে। অনুরূপভাবে, গাড়ির টায়ারে সুতো থাকে যাতে টায়ার সড়ককে ভালোভাবে আকড়ে ধরে রাখতে পারে এবং যাতে ভিজা রাস্তা থেকে গাড়ি স্কিড করে পড়ে না যায়।

যদিও ঘর্ষণ আমাদের অনেক ভোগান্তির কারণ, তবুও আমরা ঘর্ষণ ছাড়া জীবন কল্পনা করতে পারি না। তাই ঘর্ষণকে বলা হয় প্রয়োজনীয় উপদ্রব বা অপশক্তি।

অস্পর্শ বল : কিছু বল আছে যা বস্তুর ভৌত সংস্পর্শে না এসেও বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে। এ ধরনের বলকে অস্পর্শ বল বলে। এ ধরনের বল হলো: মাধ্যাকর্ষণ বল, চৌম্বক বল, তাড়িতচৌম্বক বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল ও শক্তিশালী নিউক্লিয় বল।

ক. মাধ্যাকর্ষণ বল : কোনো ঢিলকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে কী ঘটে? আম গাছ থেকে পাকা আম মাটিতে পড়ে কেন? এর কারণ, এ মহাবিশ্বের সকল বস্তু এদের ভরের দরুণ পরস্পরের ওপর বল প্রয়োগ করে বা একে অপরকে নিজের দিকে টানে। এই বলকে বলা হয় **মাধ্যাকর্ষণ বল**। এই বলের কারণেই পৃথিবী সকল বস্তুকে এর নিজের দিকে টানে। পৃথিবীর এই টানকে আমরা বলি অভিকর্ষ বল। মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে এবং চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। এই বলের মান বস্তু দুটির ভর ও এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর নির্ভর করে। বস্তুর ভর যত বাড়ে, এই বলের মান তত বাড়ে, কিন্তু বস্তু দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব যত বাড়ে, এই বলের মান দূরত্বের বর্গের অনুপাতে কমে। মাধ্যাকর্ষণ বল সবসময়ই আকর্ষণধর্মী।

খ. চৌম্বক বল: চুম্বক পেরেক, আলপিন ও লোহা বা স্টিলের তৈরি অন্যান্য বস্তুকে আকর্ষণ করে। দুটি দন্ড চুম্বককে কাছাকাছি আনলে এরা পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে। সুতরাং চুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে। **দুটি চুম্বককে কাছাকাছি আনলে এরা পরস্পরের প্রতি যে বল প্রয়োগ করে এবং কোনো চুম্বক অন্য কোনো চৌম্বক পদার্থে (লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, স্টিল ইত্যাদি) যে বল প্রয়োগ করে, তাকে চৌম্বক বল বলে।** এই বল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয়ধর্মী হতে পারে।

গ. তাড়িতচৌম্বক বল: দুটি আহিত (চার্জযুক্ত) কণিকার মধ্যে যে বল ক্রিয়াশীল তাকে তাড়িতচৌম্বক বল বলে।

তাড়িতচৌম্বক বল কণিকা দুটির আধানের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক। এই বল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয়ধর্মী হতে পারে। তাড়িত চৌম্বক বল পরমাণুর গড়ন, রাসায়নিক বিক্রিয়া ও অন্যান্য তাড়িতচৌম্বক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ. দুর্বল নিউক্লিয় বল: এই বল তাড়িতচৌম্বক বলের চেয়ে $১০^{১০}$ গুণ **দুর্বল**। মৌলকণিকা লেপটন ও হার্ডনের ক্ষয়প্রাপ্তিতে এই বল কাজ করে। কোনো কণিকা ও নিউক্লিয়াসের বিটাক্ষয়ের জন্য এই বল দায়ী।

ঙ. শক্তিশালী নিউক্লিয় বল: আমরা জানি, সকল পদার্থ পরমাণু দিয়ে গড়া। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস এবং একে কেন্দ্র করে ঘোরে ইলেকট্রন। নিউক্লিযাসে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন। এদের বলা হয় নিউক্লিয়ন। যে শক্তিশালী আকর্ষণ বল নিউক্লিয়নগুলোর মধ্যে কাজ করে এবং নিউক্লিয়াসকে আটকে বা ধরে রাখে তাকে শক্তিশালী নিউক্লিয় বল বলে। এই বলের পাল্লা অতি ক্ষুদ্র, নিউক্লিয়াসের বাইরে কাজ করে না। তবে এই বল তড়িত চৌম্বক বলের চেয়ে ১০০ গুণ শক্তিশালী। এই বল আকর্ষণধর্মী।

বলের পরিমাপ ও নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র

আমরা জেনেছি, বস্তুর গতির অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে অর্থাৎ স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে হলে বা গতিশীল বস্তুর গতির পরবর্তন করতে হলে তথা তার দ্রুতি বাড়াতে বা কমাতে হলে কিংবা গতির দিক পরিবর্তন করতে হলে বল প্রয়োগ করতে হবে। বস্তুর জড়তা থাকার কারণে এ বল প্রয়োগ করতে হয়। যে বস্তুর জড়তা যত বেশি, তার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তত বেশি বল দিতে হবে। আর যেহেতু জড়তার পরিমাপ হচ্ছে ভর, সুতরাং যে বস্তুর ভর যত বেশি হবে তার ওপর প্রযুক্ত বলও তত বেশি হবে। আবার একই ভরের দুটি বস্তুর বেগের পরিবর্তন ঘটাতে তথা ত্বরণ সৃষ্টি করতে কী সমান বল লাগবে? যে বস্তুর ত্বরণ যত বেশি হবে তার ক্ষেত্রে তত বেশি বলের প্রয়োজন হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বল বস্তুর ভর ও ত্বরণ উভয়ের ওপর নির্ভর করে।

বস্তুর ভর ও ত্বরণের গুণফল দ্বারা বল পরিমাপ করা হয়। সুতরাং,

বল = ভর × ত্বরণ

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি হলো, **বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক**। এই সূত্র থেকে আমরা বলের পরিমাপ করতে পারি।

বস্তুর ভরবেগ হলো, ভর ×বেগ। ভরবেগের পরিবর্তনের হার = ভর×বেগের পরিবর্তনের হার = ভর ×ত্বরণ কারণ, বেগের পরিবর্তনের হার হলো ত্বরণ। সুতরাং নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা পাই,

বল = ভর × ত্বরণ

পদার্থবিজ্ঞানে বলকে F, ভরকে m এবং ত্বরণকে a দিয়ে নির্দেশ করা হয়।

সুতরাং, $F=ma$

যেহেতু বলের মান ও দিক উভয়ই আছে, তাই বল একটি ভেক্টর রাশি।

বলের একক নিউটন। **যে পরিমাণ বল এক কিলোগ্রাম ভরের কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত হয়ে এক মিটার/সেকেন্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি করে তাকে এক নিউটন বলে।**

সমস্যা : ১০.১ একটি বস্তুর ভর ২০ কেজি। এর ওপর একটি বল প্রযুক্ত হওয়ায় এর ত্বরণ হলো ২ মি/সে$^{-২}$। প্রযুক্ত বলের মান কত ছিল ?

সমাধান ঃ

আমরা জানি,

$F = ma$	এখানে,
= ২০ কেজি × ২ মি/সে$^{-২}$	বস্তুর ভর, m = ২০ কেজি
= ৪০ নিউটন	ত্বরণ, a = ২ মি/সে$^{-২}$
উত্তর : ৪০ নিউটন	বল, F = ?

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল

অনেককে আমরা রাগ করে টেবিলে জোরে ঘুষি বা থাপ্পড় মারতে দেখি। তাতে টেবিলের যাই হোক না কেন তিনি কিন্তু হাতে ব্যথ্যা পান। কেন? আসলে তিনি যখন টেবিলে বল প্রয়োগ করেন, টেবিলও তাকে একটি বল প্রয়োগ করে। প্রকৃতিতে বল জোড়ায় জোড়ায় ক্রিয়া করে। যদি A বস্তু B বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে তা হলে B বস্তুও A বস্তুর ওপর একটি বল প্রয়োগ করে।

কাজ–১০.৪ : একটি ভারী টেবিলের সামনে একটি চেয়ারে বস। তোমার দিকে টেবিলটিকে টানতে চেষ্টা কর। টেবিলটি খুব বেশি ভারী বলে তুমি হয়তো এটাকে তোমার দিকে গতিশীল করতে পারবে না, কিন্তু তোমার চেয়ারের কী হলো? চেয়ারটি টেবিলের দিকে চলে যাচ্ছে। এটি কেন ঘটে? টেবিলের ওপর তোমার প্রযুক্ত টানা বলের ফলে চেয়ারের ওপর একটি বিপরীতমুখী বলের সৃষ্টি হয়, যা চেয়ারটিকে টেবিলের দিকে গতিশীল করে।

কাজ–১০.৫ : একটি শক্ত রাবার ব্যান্ড নাও। দুই হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে একে যথাসম্ভব প্রসারিত করে রাখ। কিছুক্ষণ পর দেখবে তোমার আঙ্গুলগুলোতে ব্যথা করছে। আঙ্গুলের যে স্থানগুলোতে রাবার ব্যান্ড স্পর্শ করেছে, সেখানে চামড়া কিছুটা বিকৃত (কুচকে গেছে) হয়ে গেছে। কেন ? তুমি রাবার ব্যান্ডকে টান টান করার অর্থ এর আকৃতি পরিবর্তন করার জন্য বল প্রয়োগ করেছ। এর ফলে রাবার ব্যান্ডও তোমার আঙ্গুলকে বিকৃত করার অর্থাৎ এর আকৃতি পরিবর্তন করার জন্য কিছু একটা করছে।

উপযুক্ত কাজ থেকে আমরা দেখতে পাই, যখনই আমরা কোনো বল প্রয়োগ করি, তখনই তার ফলে একটি বিপরীতমুখী বলের উদ্ভব হয়। বল দুটির একটিকে আমরা ক্রিয়া বলি, অপরটিকে বলি প্রতিক্রিয়া। স্যার আইজ্যাক নিউটন বলেছেন যে, এ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সর্বদা সমান ও বিপরীতমুখী। তিনি তার গতিবিষয়ক তৃতীয় সূত্রে বলেছেন **'প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে'।**

ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া বল সবসময়ই দুটি ভিন্ন বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে–কখনোই একই বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে না। প্রতিক্রিয়া বলটি ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়া বলটি থাকবে। ক্রিয়া থেমে গেলে প্রতিক্রিয়াও থেমে যাবে। এ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলদ্বয় বস্তুগুলোর স্থিরাবস্থায় বা গতিশীল অবস্থায় বা সাম্যাবস্থায় থাকা বা একে অপরের সংস্পর্শে থাকা বা না থাকার ওপর নির্ভরশীল নয়–সর্বত্রই বর্তমান থাকে।

ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার কয়েকটি উদাহরণ

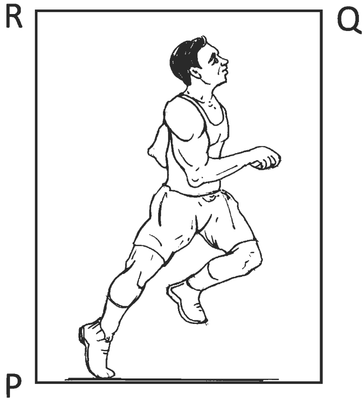
ক্রিকেটার যখন ব্যাট দিয়ে বলকে আঘাত করেন, তখন ব্যাটটি ক্রিকেট বলের ওপর একটি বল প্রয়োগ করে। এটি ক্রিয়া। ক্রিকেট বলটিও ব্যাটের ওপর একটি বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে। এটি প্রতিক্রিয়া।

টেবিল এবং টেবিলের ওপর বইয়ের অবস্থান : কোন বইকে টেবিলের ওপর রাখা হলে, বইয়ের ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল তথা বইটির ওজন খাড়া নিচের দিকে ক্রিয়া করে। বইটির ওপর যদি কেবলমাত্র তার ওজন কাজ করত অন্য কোনো বল ক্রিয়া না করত, তাহলে বইটি সাম্যাবস্থায় থাকত না বরং টেবিলের মধ্য দিয়ে নিচে চলে যেত। কিন্তু তা হচ্ছে না। কারণ পথিমধ্যে টেবিল আছে এবং বইটি টেবিলের ওপর তার ওজনের সমান বল প্রয়োগ করছে। ফলে টেবিলটিও একটি প্রতিক্রিয়া বলে বইকে উপরের দিকে ঠেলছে।

ভূমির ওপর দাঁড়ানো ঃ তুমি যখন ভূমির ওপর দাঁড়াও, তখন তোমার পা ভূমির ওপর তোমার ওজনের সমান বল প্রয়োগ করে। এ বল ভূমির ওপর তোমার ওজনের ক্রিয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভূমিও সমান বলে তোমার পা–কে খাড়া উপরের দিকে ঠেলবে। ভূমির এ বল হলো প্রতিক্রিয়া। এ অবস্থায় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল পরস্পরের সমান ও বিপরীত হবে।

হাঁটা : হাঁটার সময় আমরা সামনের পা দ্বারা মাটিতে খাড়াভাবে বল দেই আর পেছনের পা দ্বারা তির্যকভাবে PQ বরাবর মাটিতে বল দেই। এ বলের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভূমি PR বরাবর বল প্রদান করে (চিত্র : ১০.৭)। এ প্রতিক্রিয়া বলের আনুভূমিক উপাংশ আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয় আর উল্লম্ব উপাংশ শরীরের ওজন বহনে সহায়তা করে।

নৌকা চালানো : একজন মাঝি যখন নৌকা চালানোর সময় বাঁশের লগি দিয়ে ভূমিতে ধাক্কা দেন তখন ভূমিও লগির ওপর সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে। এ প্রতিক্রিয়া বলের অনুভূমিক উপাংশই নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যায় (চিত্র : ১০.৮)।



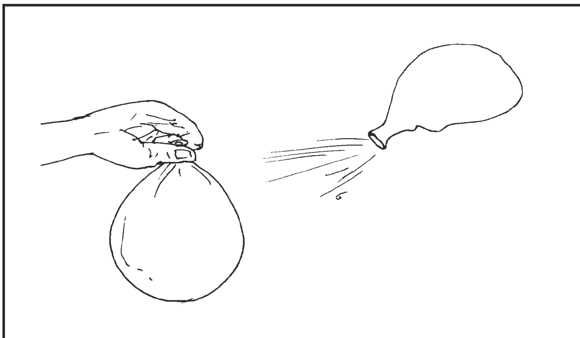
চিত্র–১০.৭



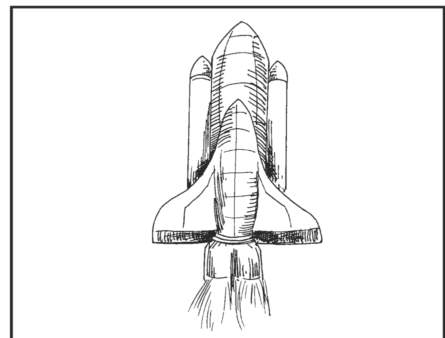
চিত্র–১০.৮

কাজ–১০.৬ : একটি বেলুন নিয়ে একে ভালোভাবে ফোলাও। হাত দিয়ে শক্ত করে মুখ বন্ধ করে ধরে রাখ। এর পর হঠাৎ হাত ছেড়ে দাও। (চিত্র : ১০.৯)। কী দেখলে?

ফোলানো বেলুনের মধ্যস্থিত বাতাস এর ওপর বল প্রয়োগ করে। এ বল হল ক্রিয়া। এ বলের ফলে খোলা মুখ দিয়ে বাতাস বের হয়ে যায়। বাতাসও বেলুনের ওপর সমান প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে। ফলে বাতাস যে দিকে বেরিয়ে যায় বেলুন তার বিপরীত দিকে গতিশীল হয়।



চিত্র–১০.৯



চিত্র–১০.১০

আধুনিক জেট বিমান, রকেট ইত্যাদিও চালানো হয় নিউটনের তৃতীয় সূত্র তথা ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া বলের ওপর ভিত্তি করে। রকেটে জ্বালানি পুড়িয়ে প্রচুর গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। রকেট সেই গ্যাসের ওপর বল প্রয়োগ করে। এ বল হচ্ছে ক্রিয়া। এ ক্রিয়ার ফলে গ্যাস প্রচন্ড বেগে রকেটের পেছন দিয়ে নির্গত হওয়ার সময় জ্বালানি ও রকেটের ওপর সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে। ফলে রকেটটি জ্বালানির বিপরীত দিকে এগিয়ে চলে। (চিত্রঃ ১০.১০)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গাছ থেকে একটি ফল মাটিতে পড়ল- এটি কোন বলের উদাহরণ?

ক. মহাকর্ষ বল　　খ. চৌম্বক বল

গ. তড়িত চৌম্বক বল　　ঘ. দুর্বল নিউক্লিয় বল

২. বল-

i. বস্তুর দিক অপরিবর্তিত রাখে

ii. বস্তুর আকৃতি পরিবর্তন করে

iii. স্থির বস্তুকে গতিশীল করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ.i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

2 N বলে একটি বস্তুকে 4 মি/সে^{2} ত্বরণে মেঝেতে ছুড়ে দেওয়া হলো । বস্তুটি কিছুদূর যাওয়ার পর থেমে গেল ।

৩. বস্তুর ভর কত?

ক. 200 gm　　খ. 400 gm

গ. 500 gm　　ঘ. 750 gm

৪. কোন বলের কারণে বস্তুটি থেমে গেল?

ক. ঘর্ষণ বল　　খ. মহাকর্ষ বল

গ. চৌম্বক বল　　ঘ. তড়িত চৌম্বক বল

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. স্বপ্না বাসে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকা যাচ্ছিল। বাসটির ভর ছিল 1400 kg এবং এটি 4 মি/সে^{2} ত্বরণে চলছিল। চলন্ত বাসটিতে হঠাৎ ড্রাইভার ব্রেক চাপলে স্বপ্নাসহ যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। আবার বাসটি যখন চলতে শুরু করল তখন তারা পিছনের দিকে হেলে পড়লো।

ক. স্পর্শ বল কাকে বলে?
খ. বল বলতে কী বুঝায়?
গ. বাসটির ওপর ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয় কর।
ঘ. যাত্রীরা প্রথমে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেও পরবর্তীতে পিছনে হেলে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. তূর্য দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। একদিন সে বাসায় একটি ভারী টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে টেবিলকে টানতে শুরু করলো। কিন্তু চেয়ারসহ সে নিজেই টেবিলের দিকে সরে গেল। পরদিন সে একটি মার্বেলকে রুমের মসৃণ মেঝেতে নির্দিষ্ট বলে গড়িয়ে দিল। এরপর বাসার বাইরে পিচের রাস্তায় একই মার্বেলকে একই বলে গড়িয়ে দিল। তখন এটি তার চেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করলো।

ক. নিউটনের গতিবিষয়ক দ্বিতীয় সূত্রটি কী?
খ. জড়তা বলতে কী বুঝায়?
গ. চেয়ারসহ তূর্য টেবিলের দিকে সরে আসলো কেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মার্বেলটির দুইটি স্থানে অতিক্রান্ত দূরত্ব ভিন্ন হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

জীব প্রযুক্তি

আধুনিক বংশগতি বিদ্যার (Genetics) ভিত্তি গড়ে উঠেছে আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে গ্রেগর মেন্ডেল নামক একজন অস্ট্রীয় ধর্মজাজকের গবেষণার মাধ্যমে। মেন্ডেলের আবিষ্কারের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে– জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এক জোড়া ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বেটসন ১৯০৮ সালে মেন্ডেলের ফ্যাক্টরের নাম দিলেন জিন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বংশগতি বিদ্যা নানাভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হতে থাকে এর ভান্ডার। জীববিজ্ঞানীরা জীবকোষের নানা প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, জেনেছেন কোষ বিভাজনের পদ্ধতি, ক্রোমোজোম ও জিনের রাসায়নিক গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে। বংশ গতির একক বা জিনের উপাদানের প্রকৃতি, রাসায়নিক এবং অণুর গঠন ও জৈবনিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার পাশাপাশি জীববিজ্ঞানীরা আর একটা বিষয় নিয়ে ভাবা শুরু করলেন। তাঁরা দেখলেন, একটা জীবের সকল জিনই তার জন্য মঙ্গলজনক নয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা–নিরীক্ষা শুরু করলেন, নিষেক ছাড়াই একটা জীবকোষ থেকে জিন কীভাবে আরেকটা জীবকোষে প্রতিস্থাপন করা যায়। কীভাবে জীবের জন্য ক্ষতিকর জিনসমূহ ছেঁটে ফেলা যায় এবং তাদের স্থানে ভালো বা সুবিধাজনক জিন সংযোজন করা যায়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হার্বার্ট বয়ার এবং স্ট্যানলি কোহেন ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম নিষেক ছাড়াই কৃত্রিমভাবে জিন সংযোজনে সাফল্য লাভ করেন। জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি ছিল এক অচিন্তনীয় ঘটনা। স্থাপিত হলো জীব প্রযুক্তি (Biotechnology) নামে জীববিজ্ঞানের নতুন এক শাখা।

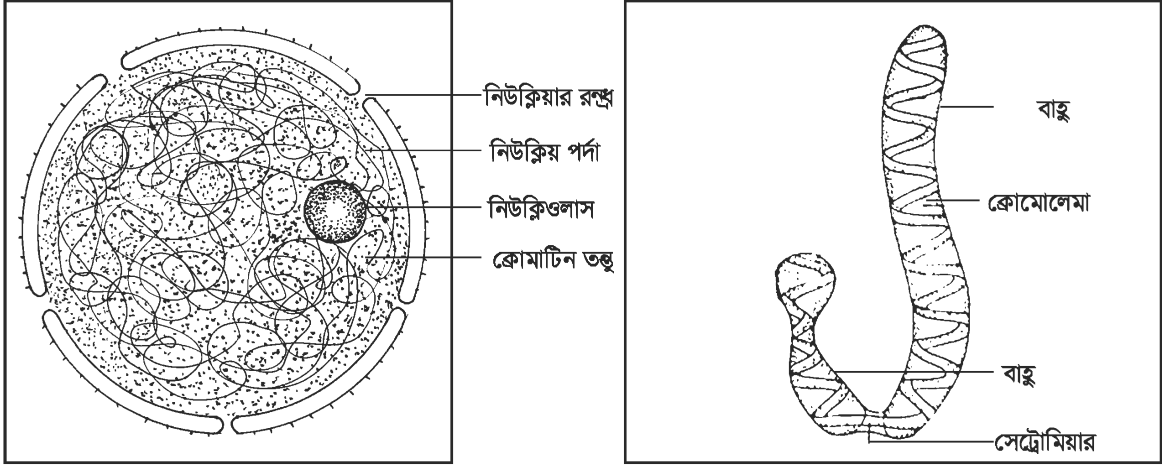
আমরা এ অধ্যায়ে জীব প্রযুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে ক্রোমোজোম, জিন, ডিএনএ ও আরএনএ সম্বন্ধে আলোচনা করব। ক্রোমোজোম, জিন, ডিএনএ ও আরএনএ সম্বন্ধে আমরা অষ্টম শ্রেণিতে সম্যক ধারণা পেয়েছি। এ অধ্যায়ে বিস্তারিত জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় স্থানান্তরের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ডিএনএ টেস্টের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জেনেটিক বিন্নতার (Genetic Disorder) কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।
- জীব প্রযুক্তি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণী ও উদ্ভিদে ক্লোনিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্লোনিং–এর সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজির ব্যবহার এবং এদের সুফল বিশ্লেষণ করতে পারব।

ক্রোমোজোম

প্রতিটি প্রকৃত কোষবিশিষ্ট জীবের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওপ্লাজমে অনেক ক্রোমাটিন ফাইবার বা তন্তু থাকে। এগুলো কোষের স্বাভাবিক অবস্থায় নিউক্লিয়াসের ভিতরে বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে। কোষ বিভাজনের সময় পানি বিয়োজনের ফলে এগুলো স্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং আকারে এগুলো সুতার মতো হয়। এগুলোকে ক্রোমোজোম বলে।



চিত্র–১১.১ : নিউক্লিয়াস

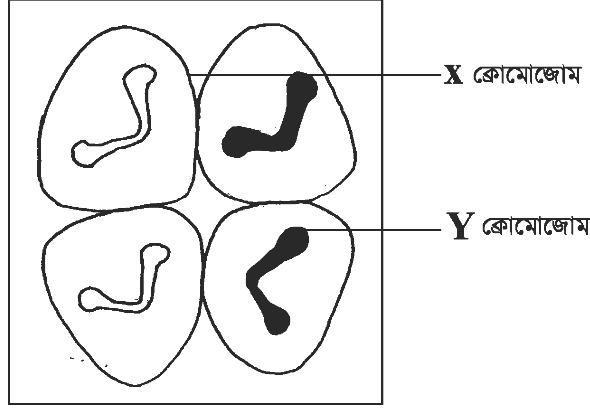
চিত্র–১১.২ : ক্রোমোজোম

কোষ বিভাজনের প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলো স্পষ্ট হয়। প্রতিটি প্রজাতির কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা সবসময় নির্দিষ্ট। অর্থাৎ একটি প্রজাতির প্রাণী অথবা উদ্ভিদ কোষে যদি ১২টি ক্রোমোজোম থাকে, তাহলে সেই প্রজাতির সকল সদস্যের কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা ১২টি থাকবে।

আকৃতি ও গঠন : ক্রোমোজোমের আকার সাধারণত লম্বা। প্রতিটি ক্রোমোজোমের দেহ দুই গুচ্ছ সুতার মতো অংশ নিয়ে গঠিত। প্রতিগুচ্ছ সুতার মতো অংশকে ক্রোমোনেমা, বহুবচনে ক্রোমোনেমাটা বলে। কোষ বিভাজনের সময় প্রতিটি ক্রোমোজোম সমান দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের প্রতিটিকে ক্রোমাটিড বলে। প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি ক্রোমোনেমা নিয়ে গঠিত।

বর্তমানে কোষতত্ত্ববিদরা বলেন ক্রোমাটিড ও ক্রোমোনেমা ক্লোমোজোমের একই অংশের দুটি নাম। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমে যে গোলাকৃতি ও সংকুচিত স্থান দেখা যায়, তার নাম সেন্ট্রোমিয়ার। অনেকে আবার একে কাইনেটোকোরও বলে। ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের উভয় পার্শ্বের অংশকে বাহু বলা হয়। পূর্বে ধারণা করা হতো ক্রোমোজোম একটা মাতৃকা বা ধাত্র দ্বারা আবৃত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি কিছু প্রোটিন ও অজৈব পদার্থের সমাবেশ যা ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না।

ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ : উচ্চ শ্রেণির প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে প্রকারভেদ দেখা যায়। এদের দেহকোষে যতগুলো ক্রোমোজোম থাকে, তাদের মধ্যে এক জোড়া ক্রোমোজোম অন্যান্য ক্রোমোজোম থেকে ভিন্নধর্মী। এই ভিন্নধর্মী ক্রোমোজোমকে সেক্স ক্রোমোজোম বলা হয়। বাকি ক্রোমোজোমগুলোকে অটোজোম (Autosome) বলা হয়। সেক্স ক্রোমোজোমগুলোকে সাধারণত X ও Y নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। মানুষের প্রতিটি দেহকোষে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি ক্রোমোজোম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২২ জোড়া নারী ও পুরুষে একই রকম এবং এগুলো অটোজোম। কিন্তু ২৩তম জোড়ার ক্রোমোজোম নারী ও পুরুষ সদস্যে ভিন্নতর এবং এগুলো সেক্স ক্রোমোজোম। যার দেহে ২৩তম ক্রোমোজোম জোড়া XX সে ব্যক্তি নারী, অপরদিকে যার দেহে ২৩তম ক্রোমোজোম জোড়ার একটি X ও অন্যটি Y ক্রোমোজোম অর্থাৎ XY সে ব্যক্তি পুরুষ। যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অটোজোমে অবস্থিত জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও লিঙ্গ নির্ধারিত হয় সেক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে।



চিত্র–১১.৩ : সেক্স ক্রোমোজোম

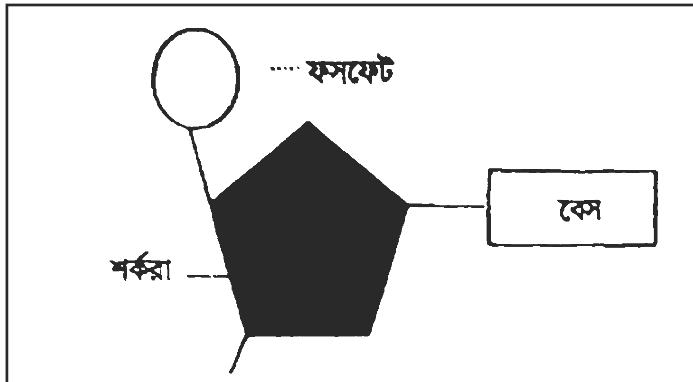
ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠনে দেখা যায় এর মধ্যে রয়েছে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন ও অন্যান্য উপাদান।

নিউক্লিক এসিড: নিউক্লিক এসিড দুধরনের হয়। যথা– (১) ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) এবং (২) রাইবোনিউক্লিক এসিড (আরএনএ)।

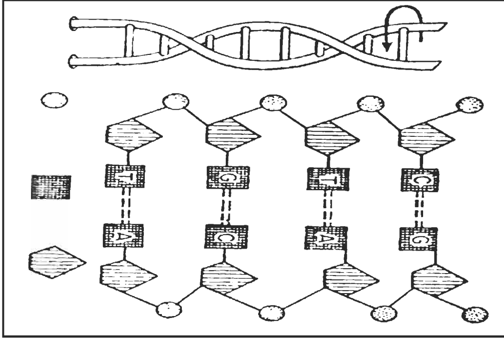
ডিএনএ (DNA)

ডিএনএ এর পূর্ণ নাম ডি অক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড। ডিএনএ সকল জীবের আদি বস্তু যার অবস্থান সর্বপ্রকার জীবকোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমে। এ তথ্যটি উদঘাটিত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হলেন ডিএনএর গাঠনিক উপাদান জানার কাজে। ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন ও ফ্রানসিস ক্রিক বিজ্ঞানীদ্বয় আবিষ্কার করলেন ডিএনএ অণুর গঠন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য এঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৬২ সালে। একটি ডিএনএ অণু দ্বিসূত্র বিশিষ্ট লম্বা শৃংখলের পলিনিউক্লিওটাইড। অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত; তাই একে পলিনিউক্লিওটাইড বলে। প্রতিটি একককে নিউক্লিওটাইড বলে।

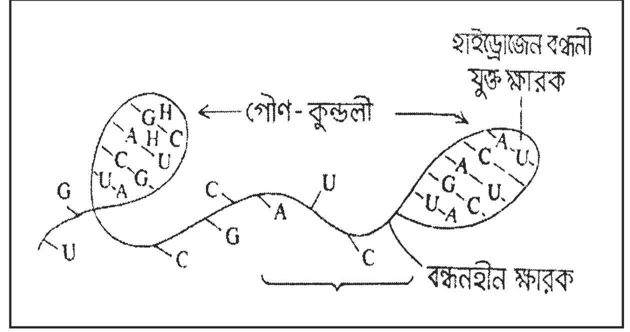


চিত্র–১১.৪ : নিউক্লিওটাইড

ডিএনএ অণুর আকৃতি অনেকটা প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো। প্যাঁচানো সিঁড়ির দুপার্শ্বের মূল কাঠামো গঠিত হয় পাঁচ কার্বন যুক্ত শর্করা ও ফসফেট দ্বারা। দুপাশের শর্করার সাথে চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারকের মধ্যে দুটি করে ক্ষারক জোড় বেঁধে তৈরি করে সিঁড়ির ধাপ গুলো। ডিএনএ অনুর চার ধরনের ক্ষারক এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিনের মধ্যে এডিনিন থাইমিনের সাথে সাইটোসিন গুয়ানিনের সাথে জোড় বাঁধে।



চিত্র–১১.৫ : DNA অণুর গঠন



চিত্র–১১.৬ : RNA অণু

আরএনএ (RNA)

আরএনএ হলো রাইবোনিউক্লিক এসিড। এটি একটিমাত্র পলিনিউক্লিওটাইড শেকলে ভাঁজ হয়ে থাকে। আরএনএ পাঁচ কার্বন যুক্ত রাইবোজ শর্করা ও ফসফেট নির্মিত একটি মাত্র পার্শ্ব কাঠামো দ্বারা গঠিত, যার চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারক ডিএনএর মতোই। শুধু পার্থক্য হচ্ছে ডিএনএতে পাইরিমিডিন ক্ষারক থাইমিন আছে; কিন্তু আরএনএ–তে থাইমিনের পরিবর্তে থাকে ইউরাসিল (U)। জীবকোষে আরএনএ তিন রকমের যথা– (১) বার্তা বাহক আরএনএ (Messenger RNA বা m RNA), (২) রাইবোজোমাল আরএনএ (Ribosomal RNA বা r RNA) এবং (৩) ট্রান্সফার আরএনএ (Transfer RNA বা t RNA)

প্রোটিন : ক্রোমোজোমে দু ধরনের প্রোটিন থাকে। যথা– হিস্টোন ও নন–হিস্টোন প্রোটিন।

ওপরে বর্ণিত রাসায়নিক পদার্থগুলো ছাড়া ক্রোমোজোমে লিপিড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

জিন : অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যায় ২ এ আমরা জেনেছি বংশগতি বলতে কী বুঝায়। আমরা আরও জেনেছি বংশগতিতে ক্রোমোজোমের ভূমিকা। মেন্ডেল বংশগতির ধারক এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের নির্ধারকের একককে ফ্যাক্টর নামে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন ফ্যাক্টরসমূহের মাধ্যমে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরম্পরায় বাহিত হয়। বর্তমানে বংশগতি বিদ্যার অগ্রগতির ফলে বংশগতির কৌশল সম্পন্ধে আরও জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। বেটসন ১৯০৮ সালে মেন্ডেলের ফ্যাক্টর এর নাম দিলেন জিন। মটরশুঁটি ছাড়াও অন্যান্য জীবের বংশানুগতির পদ্ধতি নিয়ে এর পর ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। ১৯০৯ সালে জোহানসেন বংশপরম্পরায় কোনো বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক একককে জিন আখ্যা দেন। ক্রোমোজোমের গায়েই সন্নিবেশিত থাকে অসংখ্য জিন বা বংশগতির একক। জীবজগতের বৈচিত্র্যের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে জিন। এককোষী ব্যাকটেরিয়া, আমাশয়ে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশাল আকৃতির বটবৃক্ষ, বিশাল আকৃতির হাতি, তিমি ইত্যাদি, বুদ্ধিমান জীব মানুষ পর্যন্ত সবারই আকৃতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয় তার জিনের সংকেত দ্বারা।

তাছাড়া বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রতিটা জীব তার অনুরূপ জীবের জন্ম দেয়। এ সবই জিনের দ্বারা হয়। এভেরি, ম্যাকলিওড এবং ম্যাককারটি (১৯৪৪) মানুষের নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী নিউমোকক্কাস ব্যাক্টেরিয়ার রাসায়নিক গঠন যেমন–প্রোটিন, শর্করা, ফ্যাট এবং নিউক্লিক এসিডসমূহ পৃথক করলেন। প্রত্যেকটি উপাদান নিয়ে পৃথকভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত হলেন শুধু ডিএনএ বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিএনএ কীভাবে বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরবর্তী বংশে সঞ্চালিত করে। ডিএনএ শেকল লম্বালম্বিভাবে স্ববিভাজনের (Self duplication) দ্বারা ভাগ হয়ে পরিপূরক দুটি পার্শ্ব কাঠামো গঠিত হয়। এভাবে একটা ডিএনএ অণু ভেঙ্গে তৈরি হয় দুটি নতুন অণু। নতুনভাবে সৃষ্ট প্রতিটা অণুতে থাকে একটা পুরাতন ও একটা নতুন ডিএনএ পার্শ্ব কাঠামো, যার ফলে প্রতিটি নতুন ডিএনএ অণু হয় মূলটির হুবহু অণুলিপি। এভাবে ডিএনএ অণুতে রক্ষিত জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের সাংকেতিক নীলনকশা পরিবর্তন ছাড়াই সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।

এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করলাম তা থেকে জানতে পারলাম বংশগত ধারা পরিবহনে ক্রোমোজোম, ডিএনএ ও আরএনএ এর গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান ডিএনএ। ডিএনএ এর অংশ বিশেষ জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক, যাকে জিন বলা হয়। আরএনএ জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করতে ডিএনএ কে সাহায্যে করে। ক্রোমোজোম ডিএনএ ও আরএনকে ধারণ করে বাহক হিসাবে। ক্রোমোজোম ডিএনএ ও আরএনএ কে সরাসরি বহন করে পিতা–মাতা থেকে তাদের পরবর্তী বংশধরে নিয়ে যায়। কোষ বিভাজনের মায়োটিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশগতির এ ধারা অব্যাহত থাকে। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ডিএনএ টেস্ট

যখন কোনো সন্তানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। অথবা কেউ যদি কোনো সন্তানকে তার সন্তান হিসেবে দাবি করে, তখন ডিএনএ টেস্ট দ্বারা এ ধরনের বিবাদ বর্তমানে নিষ্পত্তি করা যায়। ডিএনএ টেস্ট করার সময় পিতা, মাতা ও সন্তানের মুখগহ্বর থেকে কটন 'বাড' এর মতো বিশেষ এক ধরনের ব্যবস্থার দ্বারা মুখের ঝিল্লির (মিউকাস) পর্দা নেওয়া হয়। গবেষণাগারে ঝিল্লির থেকে পিতা, মাতা ও সন্তানের ডিএনএ–র একটি চিত্র (প্রোফাইল) প্রস্তুত করা হয় নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা। এরপর সন্তানের ডিএনএ এর চিত্রের সাথে পিতামাতার ডিএনএ চিত্রের সাথে মিলানো হয় এবং যদি প্রত্যেকের সাথে প্রায় ৫০% মিল পাওয়া যায়, তাহলে সে সেই সন্তানের জৈব পিতামাতা (Biological Parents) অর্থাৎ প্রকৃত পিতা মাতা হিসাবে গণ্য করা হয়।

মানুষের জেনেটিক বিশৃংখলা

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানুষের জেনেটিক বিশৃংখলার কারণে সৃষ্ট রোগগুলো একটি উদ্বেগের বিষয়। তবে বর্তমানে জানা গিয়েছে এ রোগগুলো কীভাবে মাতাপিতা থেকে সন্তানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং কী ধরনের জেনেটিক বিশৃংখলার কারণে রোগগুলো ঘটে। এ রোগগুলো ঘটতে পারে নিম্নলিখিত কারণে–

১. পয়েন্ট মিউটেশন বা জিনের ভিতর পরিবর্তনের জন্য

২. ক্রোমোজোম সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য

৩. ক্রোমোজোমের কোনো অংশের হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য

৪. মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের বিচ্ছিন্নকরণ (Non-disjuntion) না ঘটার জন্য

উপরোক্ত কারণের জন্য মানুষের যে বংশগত রোগগুলো সৃষ্টি হয় তার কয়েকটা নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. সিকিল সেল (Sickle cell) রোগ : মানুষের রক্ত কণিকার এ রোগটি হয় পয়েন্ট মিউটেশনের ফলে। স্বাভাবিক লোহিত রক্ত কণিকাগুলোর আকৃতি চ্যাপটা। কিন্তু সিকিল সেলের ক্ষেত্রে লোহিত কণিকাগুলোর আকৃতি কিছুটা কাস্তের মতো হয়। সিকিল সেলগুলো সূক্ষ্ম রক্তনালিগুলোতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং দেহের সেস্থানে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। এছাড়া দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। কারণ, এই রক্তকণিকাগুলো যত দ্রুত ভেঙে যায় তত দ্রুত লোহিত রক্ত

কণিকা উৎপন্ন হয় না।

২. হানটিংটন'স রোগ (Huntington's Disease) : এ রোগটি হয় পয়েন্ট মিউটেশনের কারণে। এই রোগে মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করে না। শরীরের পেশিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার ক্ষমতা লোপ পায় এবং পরবর্তীতে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটে। এ রোগটির লক্ষণ আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স চল্লিশ হওয়ার পূর্বে প্রকাশ পায় না।

মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় অ্যানাফেজ ধাপে হোমোলগাস ক্রোমোজোমগুলোর যে কোনো একটি জোড়ার ক্রোমোজোম দুটির একটি অপরটি থেকে পৃথক না হয়ে দুটিই যে কোনো মেরুতে চলে যায়। এ অবস্থাকে নন–ডিসজাংশন বলে। যে কোনো একটি বিশেষ ক্রোমোজোমের নন–ডিসজাংশন ঘটলে একসাথে কতগুলি লক্ষণ দেখা দেয়, তাকে সিনড্রোম বলে।

৩. ডাউন'স সিনড্রোম (Down's Syndrome) : মানুষের ২১তম ক্রোমোজোমের নন–ডিসজাংশনের ফলে এ রোগ হয়। এদের চোখের পাতা ফুলা, নাক চ্যাপ্টা, জিহ্বা লম্বা, হাতগুলো ছোট হয়। এরা খর্বাকৃতির এবং মানসিক ভারসাম্যহীন হয়।

৪. ক্লিনিফেল্টার'স সিনড্রোম (Klinefelter's Syndrome): এ রোগটি পুরুষ মানুষে সেক্স ক্রোমোজোমের ডিসজাংশনের কারণে সৃষ্টি হয়। ফলে পুরুষটির কোষে XY ক্রোমোজোম ছাড়াও অতিরিক্ত আর একটি X ক্রোমোজোম সংযুক্ত হয় এবং পুরুষটি হয় XXY ক্রোমোজোম বিশিষ্ট। ক্লিনিফেলটারস সিনড্রম বিশিষ্ট বালকদের মধ্যে একজন স্বাভাবিক পুরুষের যে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার তা থাকে না। এদের কণ্ঠস্বর খুব কর্কশ হয় এবং স্তনগুলো বড় আকারের হয়। এদের বৃদ্ধি কম এবং বন্ধ্যা হয়।

৫. টার্নার'স সিনড্রোম (Turner's Syndrome) : এ রোগটি নারীদের সেক্স ক্রোমোজোমের নন–ডিসজাংশনের কারণে হয় এবং স্ত্রীলোকটি হয় XX- এর পরিবর্তে X ক্রোমোজোম বিশিষ্ট। এ ধরনের স্ত্রীলোক খর্বাকৃতি হয় এবং এদের ঘাড় দীর্ঘ হয়। পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় এদের স্তন ও জনন অঙ্গের বিকাশ ঘটে না। ফলে এরা বন্ধ্যা হয়।

ওপরে বর্ণিত রোগগুলো ছাড়াও মানুষের সেক্স–লিংকড জিনের কারণে কতগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে যাকে রোগও বলা যেতে পারে। এসব জিনের কোনোটির X–লিংকড, কোনোটি Y–লিংকড। X–লিংকড জিন শুধু X ক্রোমোজোমে থাকে, Y ক্রোমোজোমে থাকে না। এ জীন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির। তাই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে শুধু মহিলাদের হোমোজাইগাস অবস্থায়। পক্ষান্তরে Y–লিংকড বৈশিষ্ট্য শুধু পুরুষে প্রকাশিত হয়। কারণ, মহিলাদের Y ক্রোমোজোম থাকে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেক্স–লিংকড বৈশিষ্ট্যধারী নারীর সকল পুত্রসন্তানে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে, কিন্তু কন্যারা বাহক হয়।

জিন তত্ত্বের কয়েকটি ধারণা নিম্নরূপ–

প্রচ্ছন্ন জিন– যে জিনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে না।

প্রকট জিন– যে জিনের বৈশিষ্ট্যর প্রকাশ ঘটে।

হোমোজাইগাস– যখন দুটি প্রচ্ছন্ন জিন অথবা দুটি প্রকট জিন একসাথে থাকে।

হেটারোজাইগাস– যখন দুটি জিনের একটি প্রচ্ছন্ন অপরটি প্রকট হয়।

সেক্স– লিংকড জীনের কারণে মানুষে যেসব সমস্যা দেখা দেয় নিচের ছকে সেগুলো দেখান হলো–

বৈশিষ্ট্যের নাম বা সমস্যা	লক্ষণ
বর্ণান্ধতা	বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য বুঝতে না পারা
হিমোফিলিয়া	রক্ততঞ্চনে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ ঘটে। এতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে
এক্টোডার্মাল ডিসপ্লেসিয়া	ঘামগ্রন্থি ও দাঁতের অনুপস্থিতি
রাতকানা	রাতে কোনো জিনিস স্পষ্ট দখতে না পাওয়া
অপটিক অ্যাট্রফি	অপটিক স্নায়ুর ক্ষয়িষ্ণুতা
জুভেনাইল গ্লুকোমা	অক্ষিগোলকের কাঠিন্য
হোয়াইট ফোরলক	মাথায় সম্মুখভাগে এক গোছা সাদা চুল
মায়োপিয়া	দৃষ্টিক্ষীণতা
মাসকুল্যার ডিসট্রফি	পেশি জটিলতা, দশ বছর বয়সেই শিশুর চলনশক্তি লোপ পাওয়া।

ওপরে বর্ণিত জেনেটিক বিঘ্নতা ছাড়াও তেজষ্ক্রিয় রশ্মির কারণে মানুষের ভ্রূণে জেনেটিক বিঘ্নতা ঘটতে পারে। এতে সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে। হাঁপানি, বহুমুত্র, ক্যান্সার, হৃদরোগ ইত্যাদি রোগও হয়ে থাকে।

জীব প্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

প্রচারের কারণে জীব প্রযুক্তি বিষয়টা বর্তমানে আমাদের কাছে খুব পরিচিত। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ শুরু হয় অনেক আগে থেকে। সভ্যতার বিকাশের ধারাবাহিতকায় মানুষ যখন যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী জীবনযাপন শুরু করে, তখন থেকেই জীব প্রযুক্তির উৎপত্তি। কারণ তখন মানুষের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে অধিক ফলনশীল ও পুষ্টিকর গাছপালা এবং শক্ত সমর্থ প্রাণিকূল। এভাবে পছন্দসই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় জীব প্রযুক্তির যাত্রা। অনেক আগে থেকে মানুষ মদ, বিয়ার, সিরকা, পাউরুটি প্রভৃতি উৎপাদন করেছে অণুজীব বা ব্যাক্টেরিয়াকে কাজে লাগিয়ে। এর পর থেকে বিভিন্ন অণুজীবের জৈবিক কর্মকান্ডকে কাজে লাগিয়ে শিল্প ক্ষেত্রে এবং মানবকল্যাণে নতুন নতুন উৎপাদন জীব প্রযুক্তির ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। জীব প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত গবেষণা জীববিজ্ঞানে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করছে। জীব প্রযুক্তিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন মানবকল্যাণে প্রয়োগের জন্য জীবকে ব্যবহার করে বিভিন্ন উপাদান তৈরির প্রযুক্তিকে জীব প্রযুক্তি বলা হয়। জীব প্রযুক্তির সর্বসম্মত সংজ্ঞা আজও দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে আমেরিকার National Science Foundation প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী জীবপ্রযুক্তি বলতে বুঝায় মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে জীব প্রতিনিধিদের, যেমন– অনুজীব বা জীবকোষের কোষীয় উপাদানের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। দই, সিরকা, পাউরুটি, মদ, পনির ইত্যাদি উৎপাদন জীব প্রযুক্তির ফসল। এসব জীবপ্রযুক্তিকে পুরনো জীব প্রযুক্তি বলে অখ্যায়িত করা হয়। সম্প্রতি আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারা জীব প্রযুক্তির যে প্রসার ঘটেছে, তাকে বলা হয় নতুন জীব প্রযুক্তি।

বাস্তবিক অর্থে আধুনিক জীব প্রযুক্তি তিনটি বিষয়ের সমন্বয়। যথা–

১. অণুজীব বিজ্ঞান

২. টিস্যু কালচার

৩. জিন প্রকৌশল

তাই জীব প্রযুক্তি একটি সমন্বিত বিজ্ঞান। বর্ণিত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠা জীববিজ্ঞানের অত্যাধুনিক এই শাখাটি মানবসভ্যতার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

বংশানুগতির উপাদানের প্রকৃতি, রাসায়নিক গঠন এবং জৈবনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা আর একটা বিষয় নিয়ে ভাবা শুরু করলেন। তাঁরা দেখলেন, একটা জীবের সকল জিনই তার জন্য মঙ্গলজনক নয়। এ ভাবনার ফলে স্থাপিত হলো জিন প্রকৌশল নামে জীববিজ্ঞানের এক নতুন শাখা। একটি জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ডিএনএ খন্ড পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তরের কৌশলকে জিন প্রকৌশল (Genetic engineering) বলে। আমরা আরও সহজভাবে বলতে পারি কাঙ্ক্ষিত নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের ডিএনএ এর পরিবর্তন ঘটানোকে জিন প্রকৌশল বলে। এই জিন যে কৌশলগুলোর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয় তাদের একত্রে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল বলে। বিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল অবলম্বন করে একটি ডিএনএ অণুর কাঙ্খিত অংশ কেটে আলাদা করে অন্য একটি ডিএনএ অণুতে প্রতিস্থাপনের ফলে যে নতুন ডিএনএ অণুর সৃষ্টি হয়, তাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির প্রক্রিয়াকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা জিন ক্লোনিং বলা হয়।

মানুষের অন্ত্রে বসবাস করে একধরনের ব্যাক্টেরিয়া যার নাম *Escheretia coli*। এই ব্যাক্টেরিয়ার ওপর গবেষণা করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধিকাংশ কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অবলম্বন করে সম্পন্ন করা হয়–

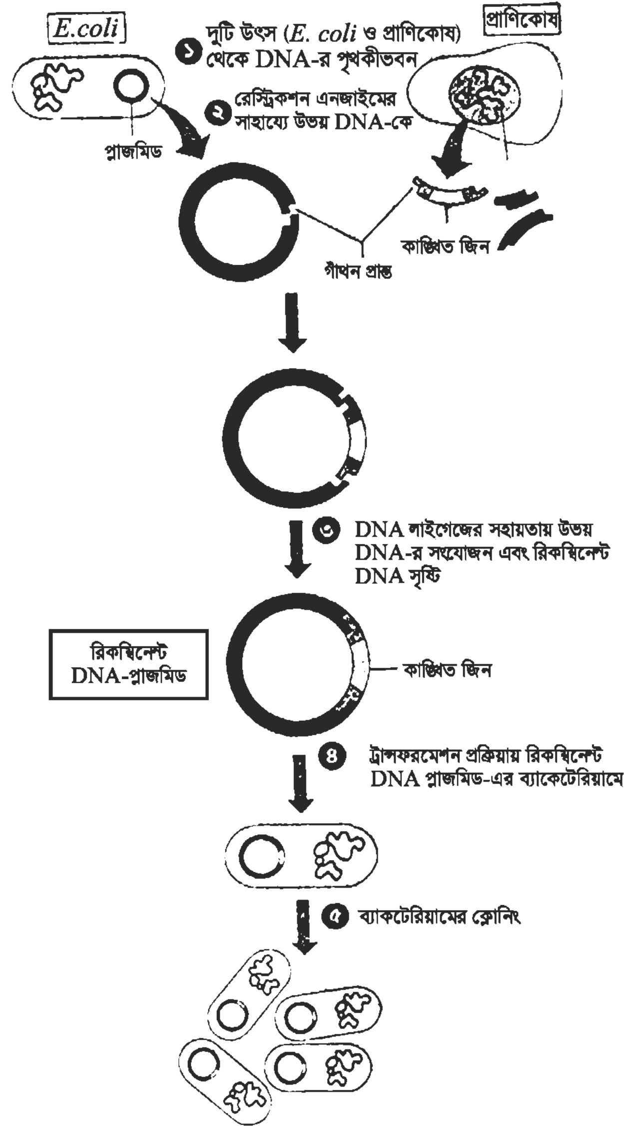
১. প্রথমে দাতা জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত জিনসহ ডিএনএ অণু পৃথক করা হয়। এরপর এই জীনের বাহক বা ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যাক্টেরিয়ার প্লাজমিড ডিএনএ পৃথক করা হয়। প্লাজমিড হচ্ছে ব্যাক্টেরিয়া কোষের ক্রোমোজোমের বাইরে আরেকটি স্বতন্ত্র ডিএনএ অণু এবং এটি স্ববিভাজনে সক্ষম।

২. এ ধাপে প্লাজমিড ডিএনএ এবং দাতা ডিএনএ এক বিশেষ ধরনের উৎসেচক (এনজাইম) দ্বারা খন্ডিত করা হয়। দাতা ডিএনএর এসব খন্ডের কোনো একটিতে কাঙ্ক্ষিত জিনটি থাকে।

৩. এ ধাপে লাইগেজ নামক একধরনের এনজাইম দ্বারা দাতা ডিএনএ কে প্লাজমিড ডিএনএ এর কর্তিত প্রান্তে স্থাপন করা হয়। লাইগেজ এখানে আঠার মতো কাজ করে। ফলে নির্দিষ্ট জিনসহ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্লাজমিড সৃষ্টি হয়। এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডগুলো এখন দাতা ডিএনএ এর বিভিন্ন খন্ডিত অংশ বহন করে।

৪. এখন এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডকে ট্রান্সফরমেশন পদ্ধতিতে ব্যাক্টেরিয়ায় প্রবেশ করান হয়। খন্ডিত ডিএনএ গ্রাহক কোষে প্রবেশ করানোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফরমেশন বলে। ট্রান্সফরমেশনের ফলে নতুন জিন নিয়ে যে ব্যাকটেরিয়া বা জীবের উদ্ভব ঘটে তাকে ট্রান্সজেনিক জীব বলে।

৫. এরপর রিকম্বিনেনন্ট প্লাজমিড বাহিত ব্যাক্টেরিয়াকে পৃথক করা এবং নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ব্যাক্টেরিয়াকে শনাক্ত করা হয়। নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলোর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটানো হয়, এটি হচ্ছে জিন ক্লোনিং, যার ফলে জিনের বহু কপি তৈরি হয়। এভাবে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য বা গুণ বহনকারী জিনের বহুগুণন ঘটানো হয়।



চিত্র–১১.৭: কাঙ্ক্ষিত জিন বহনকারী ব্যাকটেরিয়া ক্লোন

ক্লোনিং কী?

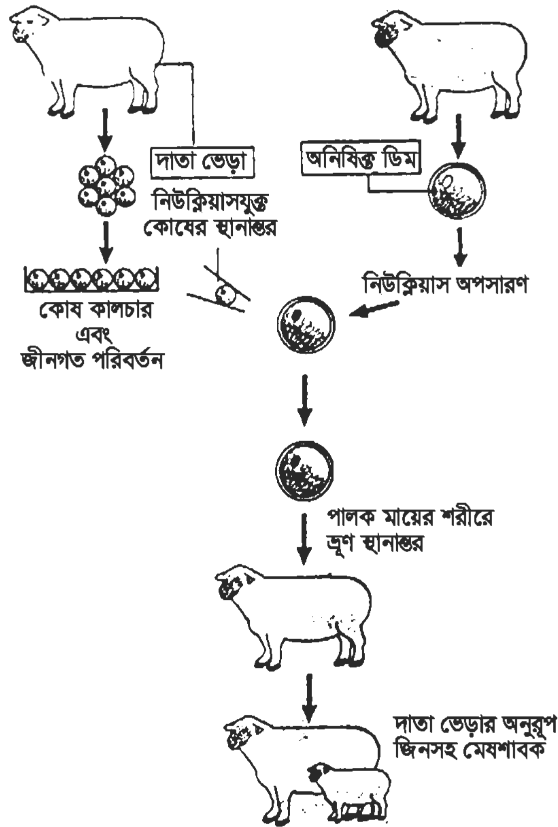
প্রাকৃতিক ক্লোন বলতে বুঝায় একটি জীব অথবা এক দল জীব, যাদের উদ্ভব ঘটে অযৌন অঙ্গজ প্রজননের দ্বারা। এগুলোর প্রকৃতি হয় একদম মাতৃজীবের মতো। একটি কোষ বা একগুচ্ছ কোষ যখন একটিমাত্র কোষ থেকে উৎপত্তি হয় এবং সেগুলোর প্রকৃতি মাতৃকোষের মতো হয় তখন তাকেও ক্লোন বলে। প্রকৃতিতে ব্যাক্টেরিয়া, অনেক শৈবাল বেশির ভাগ প্রোটাজোয়া এবং ইস্ট ছত্রাক বংশবৃদ্ধি করে ক্লোনিং পদ্ধতি দ্বারা। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে কোনো বিশেষ জিনের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে তার প্রতিলিপি তৈরি করা হয়। কখনো বা কোনো কোষকে বিশেষভাবে পালনের মাধ্যমে রেখে বিভাজন ঘটিয়ে এতে উৎপন্ন করা হয় এক গোষ্ঠী একই ধরনের কোষ, আবার কোনো অণুজীব উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর অনুরূপ অনেক জীব উৎপাদন করাও ক্লোনিং নামে পরিচিত। ক্লোনিং তিন ধরনের হয়। যথা–

১. **জিন ক্লোনিং–** একই জিনের অসংখ্য নকল তৈরি করাকে জিন ক্লোনিং বলে। জিন ক্লোনিং রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজির সাহায্যে ঘটানো হয়।

২. **সেল ক্লোনিং–** একই কোষের অসংখ্য হুবহ একই রকমের কোষ সৃষ্টি করাকে সেল ক্লোনিং বলে।

৩. **জীব ক্লোনিং–** একটি মাত্র জীব থেকে জিনগত হুবহু এক বা একাধিক জীব তৈরির পদ্ধতিকে জীব ক্লোনিং বলে। প্রকৃতিতে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অঙ্গজ জননের ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদ একটি ক্লোন। মনোজাইগোটিক যমজ একে অপরের ক্লোন।

সম্প্রতি জিন প্রযুক্তির দ্বারা সম্ভব হয়েছে একই প্রাণীর দেহকোষ থেকে সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসকে বের করে সেই প্রাণীর নিষেককৃত ডিম্বাণুতে ইনজেকট্ করে নিউক্লিয়াস স্থাপন করা। ডিম্বাণুতে দেহকোষের নিউক্লিয়াস স্থাপন করার পূর্বে নিষেককৃত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসকে অপসারণ করা হয়। এই ডিম্বাণু থেকে যে প্রাণী সৃষ্টি হয় তা হুবহু তার মাতার মতো হয়। ডলি নামক ভেড়া হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী, যা একটি পূর্ণবয়স্ক দেহকোষ থেকে ক্লোন করা হয়েছে। এই ক্লোনিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্লোন ইঁদুর, খরগোস, গরু ও শূকর এমন কি বানর পর্যন্ত ক্লোন করা হয়েছে। ইঁদুর, ডলি নামক ভেড়া, বানর প্রভৃতি ক্লোনিংয়ের পর বিজ্ঞানীদের ইচ্ছা দৃষ্টি এখন মানুষের ওপর। এ প্রক্রিয়াটি কিন্তু মোটেই দুরূহ নয়, তাই ইতোমধ্যে বিভিন্ন উন্নত দেশ মানুষের ক্লোন করার প্রক্রিয়া আইন করে নিষিদ্ধ করে রেখেছে।



চিত্র–১১.৮: ডলির সৃষ্টি

ক্লোনিংয়ের এর সামাজিক প্রভাব : সম্পূর্ণ প্রাণীর ক্লোনিংকে বলে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং। যেমন, 'ডলি' নামক ভেড়ার

ক্ষেত্রে ঘটেছে। পশুদের ক্লোনিং নিয়ে তেমন কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি তবে এর মধ্যে মানুষের ক্লোনিংয়ের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। এখন এর নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। নৈতিকতা প্রশ্নগুলোর মধ্যে–

প্রথমত হচ্ছে ক্লোনিং হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুটি যখন বড় হবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব ওই ক্লোন হতে চাওয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মতো হবে, নাকি অন্যরকম হবে। দ্বিতীয়ত এইভাবে ক্লোন হয়ে সৃষ্টি হওয়ায় শিশুটির উপর সামাজিক চাপ প্রবল হবে। তবে স্বস্তির বিষয়, এখন পর্যন্ত মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর সফল ক্লোনিংয়ের খবর পাওয়া যায়নি। ক্লোনিং জাত শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে, এমনতো বলা যাচ্ছেই না বরং উল্টো প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। মানব ক্লোনিং হবে প্রকৃতির ওপর এক বড় ধরনের হস্তক্ষেপ। সাধারণ মানুষের একাংশের মতে, ধর্ম আর বিজ্ঞান এক নয়। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা উচিত।

মানুষের ক্লোনিং হবে ধর্মীয় অনুশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ। এটা সত্য যে, আরব্য উপন্যাসের সেই দৈত্য যাকে বোতল থেকে বের করার পর পুনরায় বোতলে ঢোকানো যায়নি। পরমাণু শক্তির মতো জীব প্রযুক্তি ঠিক তেমন এক বাধাহীন শক্তি। তাই আমাদের কাজ হচ্ছে, সত্য এবং ন্যায়ের দিকে লক্ষ রেখে মানবজাতির কল্যাণে জীব প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।

উন্নত প্রাণী ও উদ্ভিদ উদ্ভাবনে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার

জিন প্রকৌশল প্রয়োগ করে উন্নত প্রাণী উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানীরা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বিজ্ঞানীরা সফলও হয়েছেন। তারই ফসল হচ্ছে ট্রান্সজেনিক জীব (প্রাণী অথবা উদ্ভিদ)। ট্রান্সজেনিক জীব উৎপাদনের পদ্ধতিকে ট্রান্সজেনেসিস বলে।

ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে উদ্ভিদ ও অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে ট্রান্সজেনিক জীব উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বারা উদ্ভাবিত ট্রান্সজেনিক জীব নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। কৃষিক্ষেত্রে এবং গৃহপালিত পশুদের উন্নতি সাধনে ট্রান্সজেনেসিস সহজভাবে আমাদের কাছে সাফল্য বয়ে এনেছে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ও মাইক্রোইনজেকশন কৌশল প্রয়োগ করে ট্রানজেনিক জীব উদ্ভাবন করা হয়।

ট্রান্সজেনিক প্রাণী : মানুষের জিন বিশেষ পদ্ধতিতে ইঁদুরে প্রবেশ করিয়ে এমন ট্রান্সজেনিক ইঁদুর উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, যা মানুষের অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি করতে সক্ষম। একই পদ্ধতিতে ট্রান্সজেনিক গবাদিপশু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, পাখি ও মাছ উৎপাদন করা হয়েছে।

ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ : জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যেসব উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়, সেগুলোকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল প্রয়োগ করে একটি কাঙ্ক্ষিত জীন উদ্ভিদদেহের কোষের প্রোটোপ্লাজমে প্রবেশ করানো হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী ফসলকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে পরিণত করে পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী করে উৎপাদন করা হচ্ছে। শৈত্য, লবণাক্ততা, খরা, নাইট্রোজেন ও ফাইটোহরমোন স্বল্পতা মোকাবিলা করা সক্ষম হয়েছে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উদ্ভাবন করে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টির মতো উদ্ভিদ প্রজাতিতে এ প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে– টমেটো, তামাক, আলু, লেটুস, বাঁধাকপি, সয়াবিন, সূর্যমুখী, শসা, তুলা, মটর, গাজর,

আপেল, মুলা, পেঁপে, ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি। ট্রান্সজেনিক টমেটো উদ্ভাবন করে পাকা টমেটোর ত্বক নরম হওয়া প্রতিরোধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ গুলোকে বিলম্বে পাকানো এবং সুক্রোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কৃষি উন্নয়নে জীব প্রযুক্তির ব্যবহার

মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্য। কিন্তু সীমিত ভূখন্ডে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে কীভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায় কিংবা কীভাবে উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করে ব্যবসায়িক ফায়দা ওঠানো যায় তা নিয়ে সারা পৃথিবীতে চলছে এক অঘোষিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জয়ের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সফল জীব প্রযুক্তির প্রয়োগ।

কৃষি উন্নয়নে যেসব জীব প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. **টিস্যু কালচার :** এ পদ্ধতিতে উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ; যেমন মূল, কান্ড, পাতা অঙ্কুরিত চারার বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি নির্ধারিত আবাদ মাধ্যমে এবং জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ করা হয়। এই কালচারের ফলে এসব বর্ধনশীল অঙ্গসমূহ থেকে অসংখ্য অণুচারা উৎপন্ন হয়। এসব অণুচারার প্রত্যেকেটি পরে উপযুক্ত পরিবেশে পৃথক পৃথক পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়। অল্প জায়গায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাণিজ্যিকভাবে লাখ লাখ কাঙ্ক্ষিত চারা করা সম্ভব হচ্ছে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

২. **অধিক ফলনশীল উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি :** কোনো বন্য উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট জিন ফসলি উদ্ভিদে প্রতিস্থাপন করে কিংবা জীনের গঠন বা বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে ধান, গম, তেলবীজসহ অনেক শস্যের অধিক ফলনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩. **গুণগত মান উন্নয়নে :** জীব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রাণী ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির গঠন, বর্ণ, পুষ্টিগুণ, স্বাদ ইত্যাদির উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন– অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়ার লোমকে উন্নতমানের করতে তাদের খাদ্য ক্লোভার ঘাসে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যম সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে এই ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে, পৃথকভাবে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দেওয়া প্রয়োজন হচ্ছে না।

৪. **সুপার রাইস সৃষ্টি :** জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে সুইডেনের বিজ্ঞানী সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস নামক এক ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। এটি ভিটামিন A সমৃদ্ধ।

৫. **ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টার জাত সৃষ্টি :** সম্প্রতি স্পেনের একদল গবেষক জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভুট্টার বীজ উদ্ভাবন করেছেন যাতে ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন ও ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যাবে। এই ভুট্টা ব্যালেন্স ডায়েটের পাশাপাশি গরিব দেশগুলোর মানুষের অপুষ্টি দূর করবে।

৬. **স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক :** জীব প্রযুক্তির দ্বারা শাক–সবজি, ফল ও শুঁটকির ক্ষতিকর পতঙ্গ, মশা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (SIT) উদ্ভাবন করে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জাপান, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, গুয়াতেমালা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে এই প্রযুক্তি ব্যাপক প্রচলিত। বাংলাদেশের সাভারে অবস্থিত পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একদল বিজ্ঞানী সবজির পোকাকে এই প্রযুক্তিতে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক গবেষণা করছেন।

৭. **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ :** রিকম্বিনেন্ট ডি এনএ কৌশল সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি উদ্ভিদ প্রজাতিতে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু, লেটুস, সূর্যমুখী, বাঁধাকপি, তুলা, সয়াবিন, মটর, শসা, গাজর, মূলা, পেঁপে, আঙ্গুর, কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ, আপেল, নাশপাতি, নিম ধান, গম, রাই ভুট্টা প্রভৃতি। এগুলো পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী এবং এগুলো যে কোনো পরিবেশকে মোকাবিলা করতে সক্ষম।

ঔষধ শিল্পে জীব প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রতি বছর জনসংখ্যা ও রোগের জটিলতা বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসা সুবিধা পৌঁছে দিতে বিজ্ঞানীরা জীব প্রযুক্তির দ্বারা ঔষধ শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছে। মারাত্মক রোগ–ব্যাধি শনাক্তকরণের পাশাপাশি জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে ঔষধ উৎপাদনের প্রক্রিয়া জোরালো হয়েছে। নিচে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. **ভ্যাকসিন উৎপাদন :** বর্তমানে জীন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভ্যাক্সিন বা টিকা উৎপাদন করা হয়েছে যেগুলো পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, বসন্তসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের রোগ প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২. **ইন্টারফেরন উৎপাদন :** ইন্টারফেরন আধুনিক ঔষধ শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুর সমন্বয়ে গঠিত এ উপাদানটি দেহের রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অত্যন্ত সহায়ক। জীন প্রকৌশল প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিক ইন্টারফেরন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এটি হেপাটাইটিস এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং ক্যান্সার রোগীদেরকে প্রাথমিকভাবে ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

৩. **হরমোন উৎপাদন :** বিভিন্ন হরমোন যথা– ডায়াবেটিস রোগের ইনসুলিন, মানুষের দেহ বৃদ্ধির হরমোন ইত্যাদি উৎপাদন জীব প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত হরমোন সহজ সাধ্য এবং দামেও কম পড়ে।

৪. **অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন :** কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য জীব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পেনিসিলিন ও সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক।

৫. **এনজাইম উৎপাদন :** পরিপাক সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের উপাদান হিসেবে কিছু এনজাইম, যেমন– অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ ও লাইপেজ, পেঁপে থেকে প্যাপেইন, বট গাছ থেকে ফাইসিন যা কৃমিরোগে ব্যবহৃত হয়; গবাদি পশুর প্লাজমা থেকে থ্রম্বিন রক্তপাত বন্ধে ব্যবহৃত হয়; এবং ক্ষত নিরাময়ে ট্রিপসিন ব্যবহৃত হয়। জৈব প্রযুক্তির কল্যাণে এসব এনজাইম উৎপাদিত ও বাজারজাত হচ্ছে।

৬. **ট্রান্সজেনিক প্রাণী থেকে ওষুধ আহরণ :** ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাণীগুলোর দুধ, রক্ত ও মুত্র থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ আহরণ করা হয়। একে মলিকুলার ফার্মিং বলে।

গৃহপালিত পশু উন্নয়নে জীব প্রযুক্তির ব্যবহার

উন্নত জাতের পশু উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে (১) চর্বিমুক্ত মাংস উৎপাদন, (২) দ্রুত বিক্রয়যোগ্য করা এবং (৩) রোগ প্রতিরোধী করা। ইতিমধ্যে ট্রান্সজেনিক ভেড়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর প্রতি লিটার দুধে ৩৫ গ্রাম পর্যন্ত হিউম্যান

আলফা এন্টিট্রিপসিন প্রোটিন পাওয়া যায়। এ প্রোটিনের অভাবে এমফাইসেমা নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেড়াদেহের মাংস বৃদ্ধি এবং শরীরের পশম–বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। চর্বিহীন মাংস ও মানুষের হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রান্সজেনিক শুকর উদ্ভাবন সফল হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে ট্রান্সজেনিক ছাগল। এসব ছাগলের দুধে পাওয়া যায় এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা জমাট রক্তকে গলিয়ে করোনারি থ্রম্বোসিস থেকে মানুষকে রক্ষা করে। ট্রান্সজেনিক গরু উদ্ভাবনের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মাতৃদুগ্ধের অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ল্যাকটোফেরিনও পাওয়া যাচ্ছে।

দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের জীব প্রযুক্তির ব্যবহার : বিশ্বে দুধের প্রধান উৎস গাভী। এর পরেই রয়েছে মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। দুধের সরাসরি নানাবিধ ব্যবহার থাকলেও দুধ থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। যেমন– দুধ থেকে মাখন, পনির, দই ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী তৈরির জন্য জীব প্রযুক্তির দ্বারা নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে। নিম্নে কয়েকটি দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. **মাখন :** মাখনে বিশেষ সুগন্ধ ও স্বাদ সৃষ্টি করা হয় বিশেষ ব্যাক্টেরিয়া থেকে উৎপন্ন এনজাইমের দ্বারা।

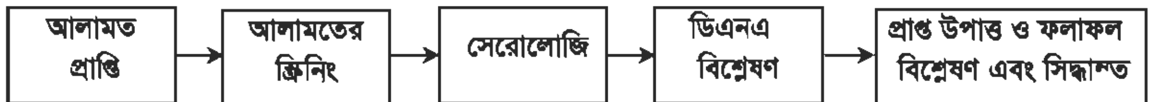
২. **পনির :** আমাদের দেশে গরুর দুধ কিংবা মহিষের দুধ থেকে পনির তৈরি করা হয়। পনির তৈরিতে ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাক প্রয়োগ করা হয়। এতে পনিরের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের তারতম্য ঘটে। পৃথিবীর সুস্বাদু পনির উৎপাদনের জন্য ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য বিখ্যাত। এই উৎকৃষ্ট মানের পনির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে জীব প্রযুক্তির দ্বারা।

৩. **দই :** দুধে ল্যাক্‌টোজ নামক শর্করা থাকায় তা থেকে দই বা দইজাতীয় খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়া প্রয়োগ করে উৎপাদন করা যায়। ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া দুধের জমাট ঘন অবস্থা সৃষ্টি করে দই এ রূপান্তরিত করে। এক্ষেত্রে ল্যাক্টিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়া নামক একপ্রকার ব্যাকরেটিয়ার বীজ ব্যবহার করা হয়। মূলত এর গুণাগুণের ওপরেই দই এর গুণাগুণ নির্ভর করে।

ফরেনসিক টেস্ট

রক্ত, বীর্যরস, মূত্র, অশ্রু, লালা ইত্যাদির ডিএনএ অথবা অ্যান্টিবডি থেকে অপরাধীকে শনাক্ত করা হয় ফরেনসিক টেস্টের দ্বারা।

জীব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফরেনসিক টেস্ট করার পদ্ধতি নিম্নরূপ–



সেরোলজি (Serology) টেস্ট দ্বারা মানুষের রক্ত, বীর্য এবং লালাকে চিহ্নিত করে তার ডিএনএ বিশ্লেষণ দ্বারা অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়।

আমরা এ পর্যন্ত জিন প্রকৌশল এর প্রয়োগ ও অবদান সমন্ধে যা আলোচনা করলাম এগুলো ছাড়াও জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ‘‘হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট’’ এর মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর অবস্থান

ও কাজ সমন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে মানবদেহে ক্ষতিকর জিনকে অপসারণ করে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপন করা যায়। একে জিন থেরাপি বলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সেক্স ক্রোমোজোমের সংখ্যা কতটি?

ক. ১ টি খ. ২ টি

গ. ২২ টি ঘ. ৪৪ টি

২. ক্রোমোজোমে যে মৌলিক পদার্থ থাকে তা হলো-

i. ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম

ii. লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম

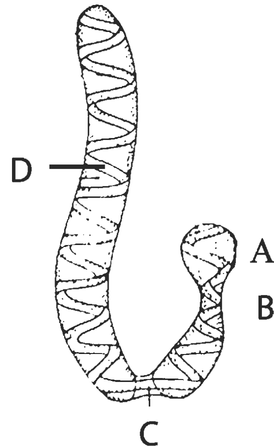
iii. ক্যালসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩. ওপরের চিত্রটি কিসের?

ক. DNA খ. RNA

গ. ক্রোমোজোম ঘ. নিউক্লিওলাস

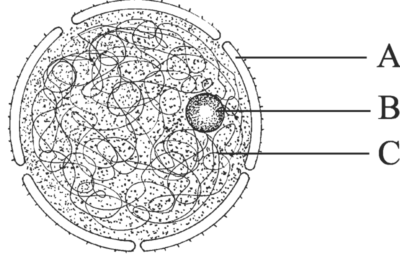
৪. চিত্রের কোন অংশটি সেন্ট্রোমিয়ার?

ক. A খ. B

গ. C ঘ. D

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



ক. RNA এর পুরো নাম লিখ।

খ. DNA টেস্ট কী? বুঝিয়ে লিখ।

গ. আদি কোষের ক্ষেত্রে ওপরের চিত্ররূপটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. A এবং C এর মধ্যে কোনটি লিঙ্গ নির্ধারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ কর।

২. ফারিহা তার আব্বুর সাথে কৃষি খামারে বেড়াতে যায়। সেখানে সে টমেটো, তামাক, ভূট্টা, পেঁপেসহ অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ দেখতে পায় যা বেশ সতেজ ও রোগজীবাণুমুক্ত। কিন্তু বাড়িতে লাগানো উদ্ভিদগুলো রোগাক্রান্ত। সে তার আব্বুর নিকট এর কারণ জানতে চাইল- আব্বু বললেন, "খামারের উদ্ভিদে জিন বিনিময় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে"।

ক. নিউক্লিয়াস কাকে বলে?

খ. সিকিলসেল রোগ বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তি কৃষির উন্নতি সাধনে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তড়িতের ব্যবহার অপরিসীম। তড়িৎ পাখা চালায়, আলো জ্বালায়, রেডিও, ফ্রিজ, টিভি চালায়। তড়িতের সাহায্যে রান্না করা যায়। সুতরাং এর ব্যবহারকে ভালো করে বুঝতে হলে আমাদেরকে এর কিছু সাধারণ কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। এই সাধারণ ধারণার মাধ্যমেই আমাদেরকে তড়িতের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে এর অপচয় রোধে নিজে যত্নবান এবং অন্যদের সচেতন হতে সাহায্য করবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- তড়িৎ উপাংশ ও যন্ত্র প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারব।
- ব্যাটারির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাসা–বাড়িতে ব্যবহার উপযোগী বর্তনীর নকশা প্রণয়ন করতে পারব।
- তড়িৎ বিশ্লেষণ এবং তড়িৎ প্রলেপন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ বিশ্লেষণের এবং তড়িৎ প্রলেপনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- কিলোওয়াট ও কিলোওয়াট–ঘণ্টা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৈদ্যুতিক ক্ষমতার হিসাব করতে পারবো।
- এনার্জি সেভিং বাল্বের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আইপিএস ও ইউপিএসের কার্যক্রম ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সিস্টেম লস এবং লোড শেডিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উন্নয়ন কার্যক্রমে বিদ্যুতের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাসা বাড়িতে ব্যবহার উপযোগী বর্তনীর ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।
- পরীক্ষার সাহায্যে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রদর্শন করতে পারব।
- তড়িৎ উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহারে সক্ষম হব।
- তড়িতের অপচয় রোধে যত্নবান হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

তড়িৎ বর্তনীর প্রতীক

তড়িৎ বর্তনীর চিত্র বা নকশা আঁকার সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেকটি যন্ত্রের বা সংযোগের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি। নিচের ছকে এ রকম কিছু যন্ত্রের বা সংযোগের প্রতীক চিহ্ন দেওয়া হলো।

কোষ	
ব্যাটারি	
পরিবাহী তার	
সংযুক্ত তার	
সংযোগহীন তার	
চাবি বা সুইচ	বা

রোধ বা রোধক বা রোধ বাক্স

পরিবর্তনশীল রোধ বা রিওস্টেট

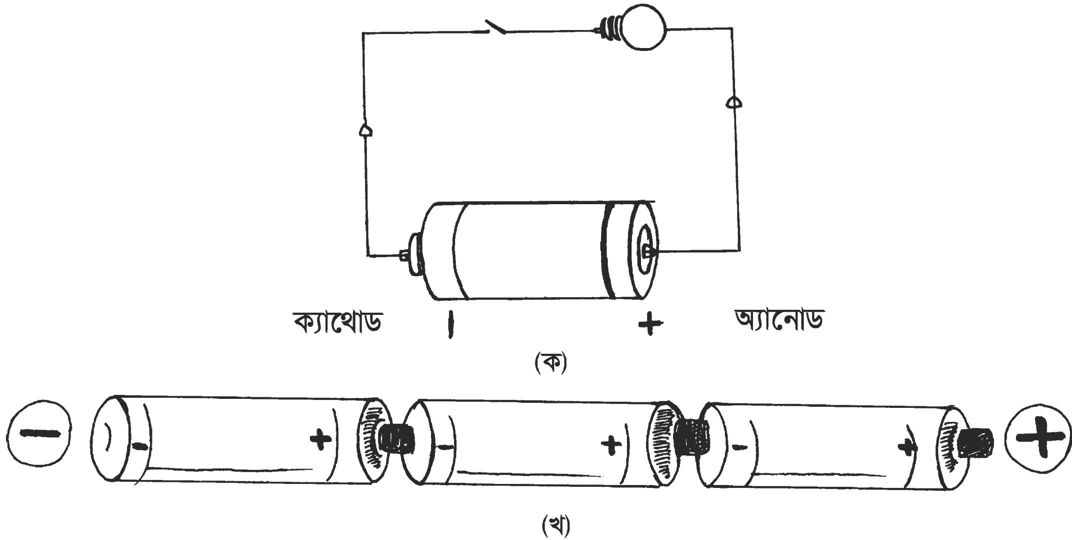
গ্যালভানোমিটার — G — বা — G

অ্যামিটার — A — বা — A

ভোল্টমিটার — V — বা — V

ব্যাটারির কার্যক্রম

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি তড়িৎ কোষকে ব্যাটারি বলে উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাটারি হলো একাধিক তড়িৎ কোষের সমন্বয়। চিত্র ১২.১ (ক) এ একটি ব্যাটারির গঠন দেখানো হলো। একটি ব্যাটারিতে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য তড়িৎ শক্তি জমা থাকে। ব্যাটারিতে সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। একটি অ্যানোড, একটি ক্যাথোড ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য (ইলেক্ট্রোলাইট)। এই অ্যানোড ও ক্যাথোডকেই তড়িৎ বর্তনীতে সংযুক্ত করা হয়। অ্যানোড হলো ধনাত্মক এবং ক্যাথোড হলো ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার। ব্যাটারিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ক্যাথোডে ইলেকট্রন জমা হয়, অ্যানোডে ইলেকট্রন কম হয়। এর ফলে অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে তড়িৎ বিভব পার্থক্য তৈরি হয় [চিত্র–১২.১ (খ)]। এ অবস্থায় অ্যানোড এবং ক্যাথোডকে পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করলে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হয়।

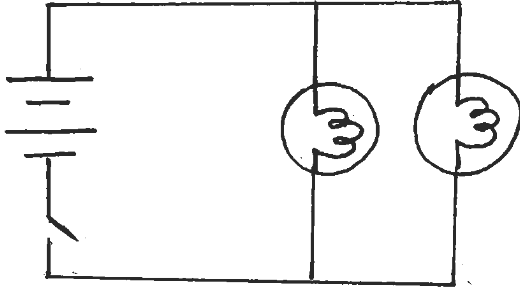


চিত্র–১২.১ ব্যাটারি

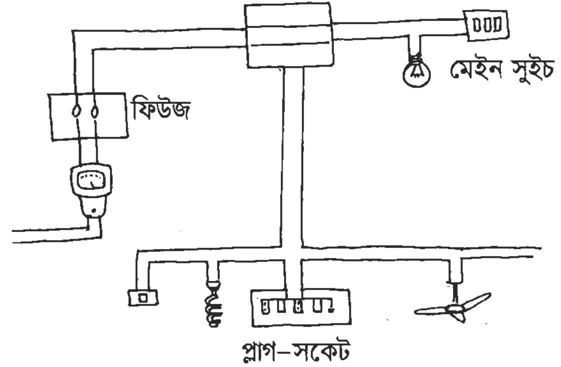
বাড়িতে তড়িৎ বর্তনীর নকশা বা হাউজ ওয়ারিং

আমাদের অনেকের বাড়িতেই তড়িৎ সংযোগ আছে। তোমরা কী জান এই সংযোগ দেওয়ার পূর্বে একটা নকশা আঁকতে হয়? ছোট ধরনের সংযোগের ক্ষেত্রে নকশা আঁকা না হলেও একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশ্যই এই সংযোগ দেওয়া হয়। সাধারণত বাড়িতে তড়িৎ সংযোগের জন্য সিরিজ বর্তনী উপযোগী নয়। কারণ, এতে মূল সমস্যা হল সুইচ অন করলে একই সাথে সংযুক্ত সব বাল্ব বা ফ্যান জ্বলে উঠবে, ফ্যান চলতে থাকবে। আবার অফ করলে সবগুলো একই সাথে অফ হয়ে যাবে। মূলত বাড়িতে তড়িৎ সংযোগ সমান্তরাল সংযোগ ব্যবস্থা মেনে করা হয়। চিত্র ১২.২ ক–এ একটি সুইচ ও দুটি বাতি সমান্তরালে সংযোগ করা হয়েছে। এতে দুটি বাতিই ব্যাটারির পুরোপুরি ভোল্টেজ পাবে।

এবার নিচে একটি হাউজ ওয়ারিং এর বিশদ চিত্র দেওয়া হলো [চিত্র ১২.২ (খ)] । এতে মেইন লাইনকে কীভাবে সংযোগ করে অন্যান্য উপাদান যেমন ফিউজ, মেইন সুইচ, প্লাগ–সকেট, ডিস্ট্রিবিউশন বক্স এবং প্রয়োজনীয় বাতি বা পাখার সংযোগ দেওয়া হয় তা দেখানো হলো।



(ক)



(খ)

চিত্র–১২.২ তড়িৎ বর্তনী

মেইন তার দুটির একটি হলো জীবন্ত (সাধারণত লাল রঙের) তার এবং অপরটি নিরপেক্ষ তার (সাধারণত কালো রঙের)। জীবন্ত তারে তড়িৎ ভোল্টেজ থাকে। কেউ যদি খালি পায়ে অর্থাৎ মাটিতে সংস্পর্শ রেখে এই তারকে স্পর্শ করে তবে তার শরীরের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলবে এবং ঐ ব্যক্তির ওপর বৈদ্যুতিক শক (shock) লাগে। এতে তার মৃত্যুও হয়। সাধারণত যারা এই সংযোগের কাজ করে তারা প্লাস্টিকের শুষ্ক জুতা ব্যবহার করে থাকে। নিরপেক্ষ তারে তড়িৎ ভোল্টেজ কম থাকে যেহেতু এটিকে মাটির সাথে সংযোগ করে দেওয়া হয়।

মেইন তারটি ফিউজ হয়ে মিটারে যায়। এর মাধ্যমে বাড়িতে কি পরিমান বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হচ্ছে তা মিটারে লিপিবদ্ধ হয়। মিটার হতে তার দুটি মেইন সুইচে যায়। এই সুইচের সাহায্যে বাড়ির ভিতরের প্রবাহ বন্ধ বা চালনা করা যায়। মেইন সুইচের সাথে একটা ফিউজও থাকে। এতে মেইন লাইনে অতিরিক্ত চাপ প্রতিহত হয়।

সুইচ হতে তার দুটি মেইন বক্সে যায়। সেখান থেকে তার দুটি বিভিন্ন শাখা লাইনে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক শাখা লাইনের জন্য পৃথক পৃথক ফিউজ থাকে। উপরের চিত্রে দুটি বাতি, একটি পাখা ও একটি প্লাগ–সকেটের সংযোগ দেখানো হয়েছে। এদের প্রত্যেকটিতেই জীবন্ত তারের সংযোগ আছে এবং প্রত্যেকটি বাতি বা পাখার জন্য আলাদা আলাদা সুইচ বা সংযোগ দেওয়া আছে।

বাড়িতে তড়িতের ওয়ারিং দেওয়ার সময় বাতি বা পাওয়ার সুইচের যাবতীয় ফিউজ যেন জীবন্ত তারের সাথে সংযোগ হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। ভুলক্রমে নিরপেক্ষ তারের সাথে কোনো সংযোগ দেওয়া হলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলবে না। এছাড়া এতে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। তাছাড়া ওয়ারিং পিভিসি (পলিভিনাইন ক্লোরাইড) বা যে কোনো অন্তরক দ্বারা মোড়ানো হতে হবে। অনেক সময় অন্তরক হিসেবে রাবারও ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই ওয়ারিং কেবলকে দেয়ালের প্লাস্টারের ভিতর দিয়ে টানা হয়। এতে তার যেন ছিদ্রযুক্ত না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে। তাছাড়া সব ধরনের যন্ত্রপাতির জন্য ফিউজ সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি যেমন ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদির জন্য উপযোগী ফিউজ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় লোড নিতে পারে এমন কেবল ব্যবহার করতে হবে।

তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis)

কোনো দ্রবণের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করে এর অণুগুলোকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অংশে বিভক্ত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলে।

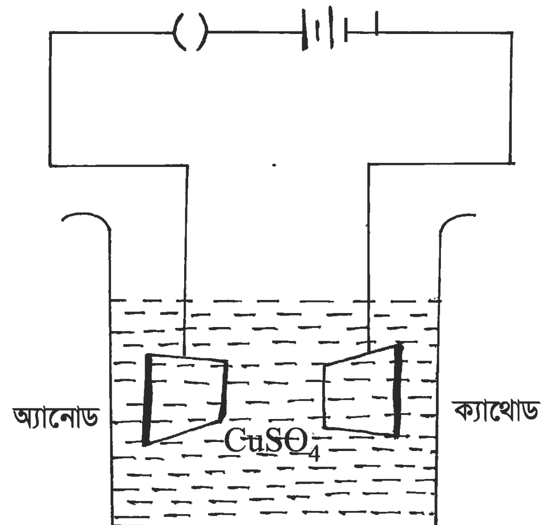
তড়িৎ প্রবাহের দ্বারা দ্রবণের যে দ্রবটিকে দুই ভাগে বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা হয় তাকে তড়িৎ দ্রব বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে। তড়িৎ দ্রবের মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহ চলে। সকল এসিড, ক্ষার, কয়েকটি নিরপেক্ষ লবণ, এসিড মেশানো পানি ইত্যাদি তড়িৎ দ্রব বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ। যেমন– H_2SO_4, HNO_3, $CuSO_4$, $AgNO_3$, NaOH ইত্যাদি।

আমরা জানি, কোনো অণু, পরমাণু বা যৌগমূলকে যদি স্বাভাবিক সংখ্যার ইলেকট্রনের চেয়ে কম বা বেশি ইলেকট্রন থাকে তাহলে তাকে আয়ন বলে। ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে তাকে ধনাত্মক আয়ন বলে। আর যদি ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয় তাহলে তাকে ঋণাত্মক আয়ন বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণু বা অণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যার সমান থাকে। তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে তড়িৎ দ্রবকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নে বিভক্ত করা হয়।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস (Arrhenius) সর্বপ্রথম ১৮৮১ সালে তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, সকল এসিড ক্ষার বা লবণ জাতীয় যৌগিক পদার্থকে তরলে দ্রবীভূত করলে তা আয়নায়িত হয়ে সম–পরিমাণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়নে বিভক্ত হয়। আধানযুক্ত অবস্থায় আয়নগুলোর রাসায়নিক ধর্ম প্রকাশ পায় না। তবে নিস্তড়িত হলে এরা আবার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। আয়নগুলো তরলের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। এখন এই তরলের মধ্যে দুটি পরিবাহী দন্ড বা তড়িৎদ্বার রেখে তরলের তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হলে ঋণাত্মক আয়নগুলো অ্যানোড ও ধনাত্মক আয়নগুলো ক্যাথোডের দিকে আকৃষ্ট হয়। দুটি তড়িৎদ্বারের মধ্যে আয়নগুলোর এই বিপরীতমুখী গতির জন্যে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়।

তুঁতের দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা

একটি কাচপাত্রে কিছু তুঁত বা $CuSO_4$ ও পানি নেওয়া হলো। $CuSO_4$ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে Cu^{++} ও SO_4^{--} আয়নে বিশ্লিষ্ট হয় [চিত্র ১২.৩]। এখন দ্রবণের মধ্যে দুটি তামার পাত ডুবিয়ে যদি পাত দুটির সাথে একটি তড়িৎ কোষ সংযুক্ত করা হয় তাহলে Cu^{++} আয়নগুলো ক্যাথোডে গিয়ে ক্যাথোড থেকে দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং নিস্তড়িত তামায় পরিণত হয়ে ক্যাথোডে জমা হয়। অন্যদিকে SO_4^{--} আয়নগুলো অ্যানোড দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সেখানে যায় এবং সেখানে যেয়ে দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিস্তড়িত হয়। নিস্তড়িত SO_4 অ্যানোড থেকে Cu গ্রহণ করে $CuSO_4$ উৎপন্ন করে। এই $CuSO_4$ আবার দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে দ্রবণের ঘনত্ব অপরিবর্তিত রাখে।

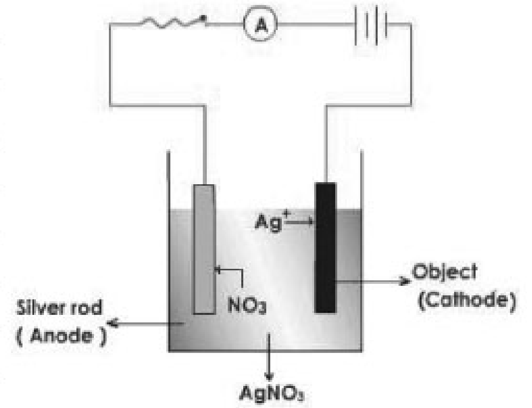


চিত্র–১২.৩ তড়িৎ বিশ্লেষণ

সুতরাং দেখা যায় যে, দ্রবণ থেকে যে পরিমাণ Cu ক্যাথোডে জমা হয় ঠিক সেই পরিমাণ Cu অ্যানোড থেকে দ্রবণে চলে আসে। অর্থাৎ মোট ফল হচ্ছে অ্যানোড থেকে তামা ক্যাথোডে জমা হয়, ফলে অ্যানোডের ভর যতটুকু হ্রাস পায় ক্যাথোডের ভর ঠিক ততটুকুই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তড়িৎদ্বার দুটি তামার বদলে অন্য কোনো নিষ্ক্রিয় ধাতুর তৈরি হলে ক্যাথোডে আগের মত তামার অণু জমা হবে কিন্তু SO_4^{--} পানির সাথে বিক্রিয়া করে H_2SO_4 উৎপন্ন করে এবং O_2 গ্যাস বুদবুদ আকারে বেরিয়ে যাবে। ফলে দ্রবণের ঘনত্ব ক্রমশ হ্রাস পাবে।

প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ বিশ্লেষণের গুরুত্ব

১. তড়িৎ প্রলেপন (Electroplating): তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধাতুর ওপর সুবিধামতো অন্য কোনো ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকে তড়িৎ প্রলেপন বলে। সাধারণত কোনো নিকৃষ্ট ধাতু যেমন তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি জিনিসকে জলবায়ু থেকে রক্ষা করার এবং সুন্দর দেখানোর জন্য এদের ওপর কোনো সোনা, রূপা, নিকেল ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। যে বস্তুতে প্রলেপ দিতে হবে সেটি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে একটি ভোল্টামিটারের ক্যাথোড এবং যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে তাকে অ্যানোড করা হয়। যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে তার কোনো লবণের দ্রবণ তড়িৎ দ্রব হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন ভোল্টামিটারের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে ধাতুর তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে ক্যাথোডে রাখা বস্তুর ওপর ধাতুর প্রলেপ পড়ে।



চিত্র–১২.৪ তড়িৎ প্রলেপন

২. তড়িৎ মুদ্রণ (Electrotyping): তড়িৎ প্রলেপের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে ইলেক্ট্রোটাইপিং বা তড়িৎ মুদ্রণ বলে। তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রণালিতে হরফ, ব্লক, মডেল ইত্যাদি তৈরি করাকে তড়িৎ মুদ্রণ বলে। তড়িৎ মুদ্রণের জন্য প্রথমে লেখাটি সাধারণ টাইপে কম্পোজ করে মোমের ওপর ছাপ নেওয়া হয়। এর উপরে কিছু গ্রাফাইট গুঁড়ো ছড়িয়ে একে তড়িৎ পরিবাহী করা হয়। এরপর কপার সালফেট দ্রবণে এটি ক্যাথোড পাত হিসেবে ডুবানো হয় এবং একটি তামার পাতকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন দ্রবণের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চালালে মোমের ছাঁচের ওপর তামার প্রলেপ পড়বে। প্রলেপ খানিকটা পুরু হলে ছাঁচ হতে ছাড়িয়ে নিয়ে ছাপার কাজে ব্যবহার করা হয়।

৩. ধাতু নিষ্কাশন ও শোধন (Extraction and purification of metals): খনি থেকে সাধারণত কোনো ধাতু বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে নানা ধাতুর মিশ্রণ থাকে যাকে আকরিক বলে। তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে আকরিক থেকে সহজে ধাতু নিষ্কাশন ও তা শোধন করা যায়। যে আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করতে হবে সেটি ভোল্টমিটারের অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে ধাতু নিষ্কাশন করতে হবে তার কোনো লবণের দ্রবণকে তড়িৎ দ্রব এবং তার একটি বিশুদ্ধ পাতকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে আকরিক থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে ক্যাথোডে সঞ্চিত হয়।

৪. কোনো বর্তনীর মেরু নির্ণয় (Testing of polarity of an electric circuit): কোনো ডিসি মেইন লাইনের দুটি তারের কোন্‌টি ধনাত্মক তা তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

একটি পাত্রে কিছু পানি নিয়ে তাতে অল্প লবণ ফেলে দেওয়া হলো। এবার মেইন লাইনের তার দুটি নিয়ে পানির মধ্যে ডুবানো হলো। তড়িৎপ্রবাহ যুক্ত তার দুটি লবণের দ্রবণে ডুবালে দেখা যাবে যে একটি তারের গা বেয়ে খুব বেশি পরিমাণ বুদ্‌বুদ বের হচ্ছে। ঐ গ্যাস হাইড্রোজেন এবং ঐ তারটি ঋণাত্মক তার, আর অপর তারটি ধনাত্মক তার।

৫. তড়িৎ রিপেয়ারিং বা মেরামত (Electric Reparing): এই কৌশল অবলম্বন করে কোনো যন্ত্রাংশ মেরামত করা হয়। এই ক্ষেত্রে ভঙ্গুর বা নষ্ট যন্ত্রাংশের সমস্ত ওপর অংশকে ওয়েব দ্বারা আবৃত করা হয়। এর জন্য একে তড়িৎ বিশ্লেষ্যে ডুবানো হয় এবং একে ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনে একে অন্য আকৃতিতেও পরিণত করা যায়।

তড়িৎ ক্ষমতা

কাজ করার হার অর্থাৎ একক সময়ে সম্পন্নকৃত কাজকে ক্ষমতা বলে। কোনো তড়িৎ যন্ত্র প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তি ব্যয় করে বা অন্য শক্তিতে (তাপ, আলো, যান্ত্রিক ইত্যাদি) রূপান্তরিত করে তাকে তড়িৎ ক্ষমতা বলে।

কিলোওয়াট কী?

কোনো পরিবাহক বা তড়িৎ যন্ত্রের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হলে যদি এর মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হয় তবে ঐ যন্ত্রের ক্ষমতা এক ওয়াট।

এক ওয়াট = ১ ভোল্ট × ১ অ্যাম্পিয়ার

তড়িৎ ক্ষমতাকে কিলোওয়াট বা মেগাওয়াটে প্রকাশ করা যায়।

১ কিলোওয়াট = ১০০০ ওয়াট বা $১০^{৩}$ ওয়াট এবং
১ মেগা ওয়াট = $১০^{৬}$ ওয়াট

কিলোওয়াট–ঘণ্টা

আবার এক ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো তড়িৎ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে তড়িৎ প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় (যেমন বাতি জ্বললে আলোক শক্তি বা পাখা ঘুরলে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়) তাই হলো এক ওয়াট–ঘণ্টা বলে।

১ ওয়াট–ঘণ্টা = ১ ওয়াট × ১ ঘণ্টা

বা, ১ কিলোওয়াট– ঘণ্টা = ১ ০০০ ওয়াট × ৩৬০০ সেকেন্ড

= ৩৬০০০০০ ওয়াট– সেকেন্ড

= ৩৬০০০০০ জুল

আন্তর্জাতিকভাবে, তড়িৎ সরবরাহকে কিলোওয়াট–ঘণ্টা এককে পরিমাপ করা হয়। এই একককে বোর্ড অব ট্রেড (BOT) ইউনিট বা সংক্ষেপে ইউনিট বলে। আমরা যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করি তা এই এককেই হিসাব করা হয়।

তড়িৎ ক্ষমতার হিসাব

আমরা জানি, তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসেই আমাদের বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের তড়িৎ খরচের একটি বিল পাঠায়। এই প্রতিষ্ঠান প্রতি ইউনিটের মূল্য ধার্য করে। সেই অনুযায়ী আমরা তড়িৎ বিল পরিশোধ করে থাকি। সাধারণত ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির খরচ = ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির একক × প্রতি এককে খরচ

এখানে ক্ষমতাকে ওয়াট এবং সময়কে ঘণ্টায় প্রকাশ করলে ব্যয়িত শক্তি হবে নিম্নরূপ:

$$\text{ব্যয়িত শক্তি} = (\text{ক্ষমতা} \times \text{সময়}) \text{ ওয়াট ঘণ্টা}$$

$$= \frac{\text{ক্ষমতা} \times \text{সময় কিলোওয়াট ঘণ্টা}}{১০০০}$$

$$= \frac{\text{ক্ষমতা} \times \text{সময় ইউনিট}}{১০০০}$$

সুতরাং কোনো যন্ত্রের ক্ষমতা জানলে সহজেই আমরা তড়িৎ শক্তি ব্যয়ের খরচ বের করতে পারি। যেমন ৬০ ওয়াটের একটি বাল্ব প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে ৩০ দিন জ্বললে কত তড়িৎ শক্তি ব্যয় হবে?

আমরা জানি,

$$\text{ব্যয়িত শক্তি} = \frac{(\text{ক্ষমতা} \times \text{সময়}) \text{ কিলোওয়াট ঘণ্টা}}{১০০০}$$

$$= \frac{৬০ \times ৫ \times ৩০ \text{ কিলোওয়াট ঘণ্টা}}{১০০০}$$

$$= ৯ \text{ কিলোওয়াট ঘণ্টা}$$

এখন যদি প্রতি ইউনিটের মূল্য ৮ টাকা হয়, তবে উক্ত পরিমান বিদ্যুতের জন্য মোট ব্যয় হবে

$$\text{মোট তড়িৎ ব্যয়} = ৯ \times ৮ \text{ টাকা}$$

$$= ৭২ \text{ টাকা}$$

২২০ V– ৬০W-এর অর্থ

তড়িত আলো পাওয়ার জন্য আমরা যে বাল্ব ব্যবহার করি তার গায়ে দুটি সংখ্যার পাশে V এবং W লেখা থাকে। কোনো বাল্বের গায়ে ২২০ V বা ৬০ W লেখা থাকলে বোঝা যায় ২২০ বিভব পার্থক্য বাল্বটিতে সংযুক্ত করলে বাল্বটি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল ভাবে জ্বলবে এবং প্রতি সেকেন্ড ৬০ জুল বৈদ্যুতিক শক্তি আলো ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

এনার্জি সেভিং বাল্বের সুবিধা

বর্তমানে বাজারে সাধারণ বালবের পাশাপাশি এনার্জি সেভিং বাল্বও পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ বাল্ব ব্যবহারে অনেক তড়িৎ শক্তি খরচ হয়। এই জন্য বর্তমানে এনার্জি সেভিং বালবের ব্যবহার বাড়ছে। এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহারের ফলে নিজস্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের বিভিন্ন দিক থেকে সুবিধা হয়। নিম্নে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহারের সুবিধাসমুহ উল্লেখ করা হলো।

খরচ সাশ্রয়

একটি এনার্জি সেভিং বাল্ব প্রথমে কিনতে খরচ বেশি পড়লেও এটি সাধারণ বাল্বের চেয়ে অনেক বেশি দিন টিকে। পাশাপাশি এই বাল্ব ব্যবহারে অনেক কম তড়িৎ বিল আসবে। ফলে খরচ সাশ্রয় হবে।

শক্তির ব্যবহার

এনার্জি সেভিং বাল্ব চালনা করতে কম শক্তির দরকার হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রতি পরিবারে যদি একটি করে

সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করে তবে যে পরিমাণ শক্তি বাঁচে তা দিয়ে প্রতি বছরে ৩০ লক্ষ পরিবারে তড়িৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব।

জীবাশ্ম জ্বালানি

আমরা যদি এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করে শক্তির অপচয় কমাতে পারি তবে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর আমাদের নির্ভরতা কমাতে পারি। কারণ, জীবাশ্ম জ্বালানি দিয়ে তড়িৎ উৎপাদনের ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে।

পরিত্যক্ততার চাপ

এনার্জি সেভিং বাল্ব সাধারণ বাল্বের চেয়ে বেশি দিন টিকে। ফলে কম সংখ্যক বাল্ব পরিত্যক্ত হয়। এদের ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থানায়ও সুবিধা হয়।

আইপিএস (IPS)

আইপিএস হলো ইনস্ট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই। তড়িৎপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটার পরও তাৎক্ষণিকভাবে নিরবচ্ছিন্ন তড়িৎপ্রবাহ পাওয়ার একটি আদর্শ সমাধান। এই আইপিএসে আমাদের সাধারণ জেনারেটর থেকে কিছু ভিন্ন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়। আইপিএসের নকশা সাধারণত পাওয়ার লাইনের অবস্থাভেদে করা হয়।

এটা মূলত ডিসি প্রবাহ। এটার নিম্ন ভোল্টেজেও চার্জিত হবার ক্ষমতা থাকে ফলে স্বাভাবিক বিদ্যুৎপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটলে আমরা সহজেই এর ব্যাকআপ পেয়ে থাকি। আইপিএসকে সাধারণত আমাদের গৃহে ব্যবহৃত তড়িতের ইনপুটের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

এই ইনস্ট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই সম্পূর্ণ অটোমেটিক অর্থাৎ তড়িৎপ্রবাহ চলে যাবার পর সাথে সাথেই এর কার্যক্রম চলে এবং চলতে থাকে যতক্ষণ এর ব্যাটারির চার্জ থাকে। এটি একসাথে অনেকগুলো আউটপুটকে চালাতে সক্ষম। বাজারে প্রাপ্ত আইপিএসসমূহ কোনোটি দুটি বাল্ব ও দুটি পাখা, আবার কোনোটি চারটি বাল্ব ও চারটি পাখা একাধারে দুই ঘণ্টাও চালাতে পারে। আবার কোনো আইপিএস দিয়ে এসিও চালানো যায়।

ইউপিএস বা আনইন্টারাপটিবল পাওয়ার সাপ্লাই (UPS)

আনইন্টারাপটিবল পাওয়ার সাপ্লাই (UPS) হলো একটি ব্যবস্থা, যা তড়িৎ উৎস ও একটি কম্পিউটারের মধ্যে লাগানো থাকে। এর ফলে তড়িৎপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটলে এটি দ্বারা কম্পিউটার চলে এবং কম্পিউটারের তড়িৎপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে না। এটির কাজ জেনারেটরের কার্যক্রম থেকে একটু ভিন্ন। এটি ব্যবহারের ফলে কম্পিউটারের তথ্যের কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ, এতে ফাইল সেইভ করে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায়। একটি ইউপিএস এ মূলত তিনটি অংশ থাকে। যথা– রেকটিফায়ার, ব্যাটারি ও ইনভারটার। বাজারে সাধারণত তিন ধরনের ইউপিএস দেখা যায়। যথা– অফলাইন, লাইন ইন্টারেকটিভ ও অনলাইন ইউপিএস। ইউপিএস এর ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে সাধারণত ১/২ ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা পর্যন্ত কম্পিউটার চালানায় সহায়তা করে।

সিস্টেম লস ও লোডশেডিং

বাংলাদেশে বিভিন্ন উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। কোথায় কীভাবে তড়িৎ উৎপন্ন করা হয় তা নির্ভর করে উৎসের ওপর। বাংলাদেশে তড়িৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে সাধারণত পানিপ্রবাহ, গ্যাস প্রভৃতি থেকে। পূর্বে তড়িৎ উৎপাদনের জন্য তেল ব্যবহৃত হতো। ভবিষ্যতে কয়লা থেকে ব্যাপকভাবে তড়িৎ উৎপাদনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। তুমি কি জান তোমার এলাকাতে যে তড়িৎ পাচ্ছ তার উৎপত্তিস্থল কোনটি এবং ওখানে কীভাবে তড়িৎ উৎপন্ন করা হয়? বাংলাদেশে বর্তমানে

যে তড়িৎ প্রতিদিন উৎপাদিত হচ্ছে এর কোনোটির উৎস হলো গ্যাস, কোনোটির বা পানি প্রবাহ। আবার ভবিষ্যতে দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লা খনি ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণে তড়িৎ উৎপাদনের প্রস্তুতি চলছে। বিদ্যুৎ উপাদন বিতরণ ও ব্যবহারের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত দুইটা বিষয় হচ্ছে সিস্টেম লস ও লোডশেডিং।

সিস্টেম লস

সাধারণভাবে তড়িৎ উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যপথে বিদ্যুতের অপচয়কেই সিস্টেম লস বলা হয়। যে পরিমাণ তড়িৎ উৎপাদনকেন্দ্রে তৈরি করা হয় তার পুরোটা গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছে না। সাধারণত দেখা যায় তড়িৎ সরবরাহ পয়েন্ট থেকে গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর জন্য তড়িৎ লাইন টানা হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের বাড়ির ভিতর মিটার থাকে। কিন্তু দেখা যায় মিটারে পৌঁছার পূর্বেই ঐ লাইনে থেকে অবৈধভাবে অন্য লাইন টেনে তড়িৎ নিয়ে অন্য কেউ ব্যবহার করছে। যার কোনো হিসাব মিটারে ওঠে না। এখানে উৎপন্ন তড়িৎ ও ব্যবহৃত বিদ্যুতের গরমিল দেখা দেয়।

সিস্টেম লসের কারণ

১. সরবরাহ পদ্ধতির ত্রুটি ;

২. তড়িতের অবৈধ সংযোগ ;

৩. তড়িৎ সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই বলে উৎপাদিত বিদুৎ ব্যবহার না হলে তা অপচয় হয় ; এবং

৪. দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা ।

প্রতিকার

১. সরবরাহ পদ্ধতির উন্নয়ন ;

২. অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ;

৩. উপযুক্ত সমন্বয়ের মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী বিদুৎ উৎপাদন ; এবং

৪. দক্ষ ও সফল মনিটর ঠিক করতে হবে ।

লোডশেডিং

চাহিদার তুলনায় তড়িতের উৎপাদন কম হলে সব জায়গায় একই সাথে তড়িৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তখন কোনো কোনো এলাকার তড়িৎ সরবরাহ বন্ধ করে উৎপাদিত তড়িৎ অন্যান্য এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। তড়িতের উৎপাদন যদি বেশ কম হয় তবে সব এলাকাতেই ক্রমাগত তড়িতের সরবরাহ বন্ধ করতে হয়। তড়িৎ বণ্টনের জন্য তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করার এই পদ্ধতিটিকেই লোডশেডিং বলা হয়।

লোডশেডিং –এর কারণ

১. চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের স্বল্প উৎপাদন ;

২. বিদ্যুতের সিস্টেম লস ;

৩. বিদ্যুতের অপচয় ; এবং

৪. বিদ্যুতের যান্ত্রিক ত্রুটি ।

সমাজে সিস্টেম লস ও লোডশেডিং –এর প্রভাব

সমাজে সিস্টেম লস ও লোডশেডিংয়ের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমেই আসা যাক সিস্টেম লসের কথায়। এর ফলে সমাজে মারাত্মকভাবে নৈতিক অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। সমাজের সকলকে ঠকিয়ে নিজের নৈতিক অধপতন ঘটিয়ে এ কাজটি করতে আমাদের সমাজের কেউ কেউ হয়তো খুবই আনন্দ পায়। এবার আসা যাক লোডশেডিং–এর কথায়। সিস্টেম লসের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে লোডশেডিংয়ের ওপর। এর ফলে মানুষ খুবই কষ্ট ভোগ করে থাকে। লোডশেডিংয়ের ফলে তড়িৎ ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল সবকিছুতেই সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক সময় এমনি খরচ হয়ে যায়। ধর রাতে তুমি কোনো কাজ শুরু করবে বলে মনস্থির করলে। তখন লোডশেডিংয়ের জন্য তড়িৎ চলে যাওয়ায় তোমাকে হয়তো কিছু সময় এমনি এমনি বসে থাকতে হবে। এছাড়া কলকারখানায় উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। মূলত লোডশেডিং ও সিস্টেম লসের ফলে আমাদের সমাজে বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে।

বিদ্যুৎ ও উন্নয়ন : আধুনিক সভ্যতার বিকাশে বিদ্যুতের অবদান অনস্বীকার্য। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপকতা ও বিদ্যুৎ নির্ভর যন্ত্রপাতি আমাদের জীবনকে করেছে গতিময় ও আরামদায়ক। শিক্ষা, যোগাযোগ, শিল্প ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বিদ্যুতের অবদান রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যুৎ নির্ভর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি আমাদের অনেক কাজকে সহজ করে দিয়েছে। একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে বিদ্যুতের উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহারের উপর। কাজেই বিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার ছাড়া আমরা উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ও এর বিকাশ ভাবতেই পারিনা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি অ্যামিটারের প্রতীক?

ক. —|ı|ı|—　　খ. —Ⓐ—

গ. —⊙—　　ঘ. —ʌʌʌʌ—

২. তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রলেপ দেওয়া হয়-

i. লোহার ওপর নিকেলের

ii. দস্তার ওপর লোহার

iii. তামার ওপর সোনার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিপন বকশীগঞ্জে বাস করে। এখানে প্রায়ই বিদ্যুতের লোড শেডিং হয়। এ কারণে বিভিন্ন কাজে অসুবিধা হওয়ায় রিপন বাড়িতে আইপিএস লাগিয়েছে।

৩. বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে লাগানো যন্ত্রটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

i. এটি অপর্যাবৃত্ত প্রবাহে চলে

ii. নিম্ন ভোল্টেজেও চার্জিত হয়

iii. তড়িতের আউটপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. **বকশিগঞ্জের সমস্যার কারণ-**
i. বিদ্যুতের সিস্টেম লস
ii. সরবরাহ পদ্ধতির ত্রুটি
iii. চাহিদার তুলনায় তড়িতের স্বল্প উৎপাদন

নিচের কোনটি সঠিক?

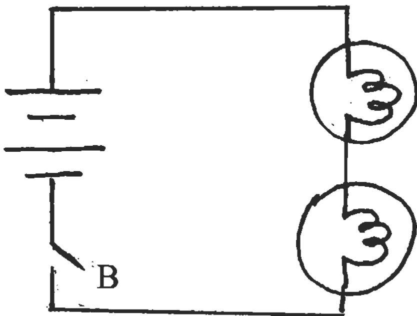
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

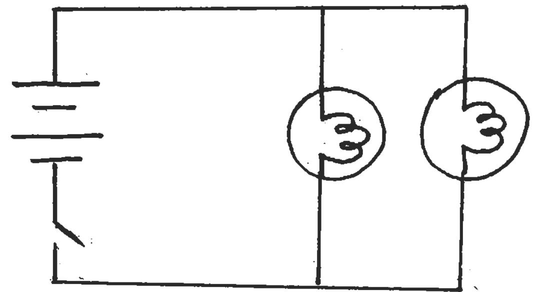
১. মিসেস মনছুরা খানম একজন সচেতন গৃহিনী। বাড়ির বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি হিসেব করে চলেন। প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘণ্টা করে ১০০ ওয়াটের ৫টি বাল্ব জ্বালান। ইদানীং তিনি লক্ষ করছেন বিদ্যুৎ বিল বেশি আসছে। এজন্য তিনি বাল্বগুলো পরিবর্তন করে ৫টি ২০ ওয়াটের এনার্জি সেভিং বাল্ব লাগান।

ক. বৈদ্যুতিক ক্ষমতা কী?
খ. একটি বাল্বের গায়ে ২২০ ভোল্ট- ৬০ ওয়াট লেখা আছে এর অর্থ কী?
গ. প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ৫ টাকা হলে পূর্বে মনছুরা খানমের কত বিল আসতো?
ঘ. পরবর্তীতে বাল্বগুলোর পরিবর্তনে মনছুরা খানমের কী লাভ হলো? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।

২. নিচের চিত্র দুটো দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



চিত্র- P

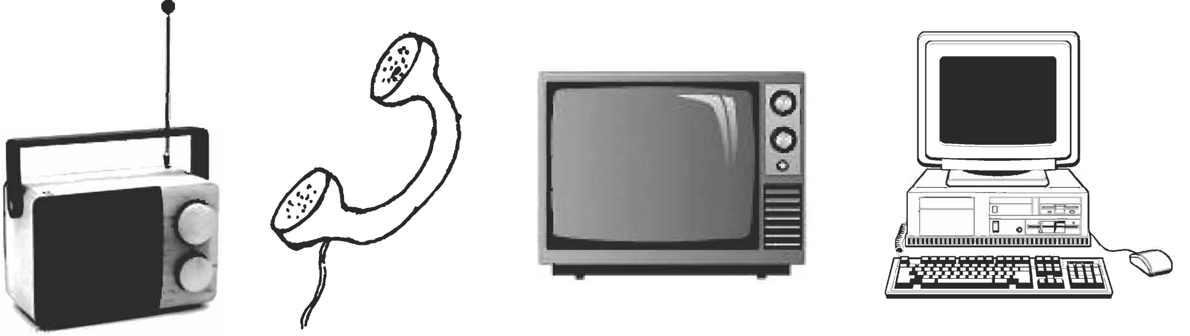

চিত্র- Q

ক. তড়িৎ বিশ্লেষণ কাকে বলে?
খ. অ্যানোড বলতে কী বুঝায়?
গ. 'B' চিহ্নিত অংশে কী অবস্থায় ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. P ও Q এর মধ্যে বাড়িতে সংযোগের ক্ষেত্রে কোনটি বেশি সুবিধাজনক? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সবাই কাছাকাছি

যোগাযোগ মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যোগাযোগ মানুষ, দেশ, সমাজকে নিয়ে এসেছে কাছাকাছি। মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে নানাভাবে মানুষ একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করছে। এখন আমরা মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ করতে পারি রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ও ই–মেইলের মাধ্যমে। যোগাযোগ মানুষের জীবনযাত্রার মান পাল্টে দিয়েছে, তাকে নিয়ে যাচ্ছে উন্নতির চরম শিখরে। সমাজ, দেশ ও বিশ্বে সার্থক ও উন্নত জীবন যাপন করতে হলে বিভিন্ন মানুষ, দেশ ও সমাজের সাথে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতেই হবে।



আমরা এই অধ্যায়ে যোগাযোগ, এর নীতিমালা, যোগাযোগের বিভিন্ন কৌশল ও যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- তথ্য ও যোগাযোগের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্লকচিত্র ব্যবহার করে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করতে পারব।
- মাইক্রোফোন ও স্পিকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এনালগ ও ডিজিটাল সংকেতের ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ডিজিটাল সংকেতের সুবিধা বর্ণনা করতে পারব।
- ব্লকচিত্রের সাহায্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি–সংক্রান্ত প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতির (মেশিন) কার্যক্রম, তাদের সুবিধা এবং জীবনে এগুলোর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।

যোগাযোগ কী?

‘যোগাযোগ’ বিষয়টির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। প্রতিদিন আমরা হাজার রকম যোগাযোগ করছি। যেমন সড়কপথে যোগাযোগ, নৌপথে যোগাযোগ, আকাশ পথে যোগাযোগ। এসব বলতে বোঝায় গাড়ি, ঘোড়া, রেল, নৌকা, স্টিমার ও বিমানকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া বা কোনো বার্তা বা মালামাল পৌঁছে দেয়। আজকে আমরা একটু ভিন্ন ধরনের যোগাযোগের কথা বলব। এর নাম তথ্য যোগাযোগ।

ভোর বেলা যখন তোমার ঘড়ির অ্যালার্ম বাজে, তুমি ঘুম থেকে উঠ। এটা ঘড়ির সাথে তোমার যোগাযোগ। টেলিভিশনে বা রেডিওতে খবর শুনছ বা কোনো অনুষ্ঠান দেখছ বা শুনছ–এটাও এক ধরনের যোগাযোগ। আলাপ শেষে বন্ধুকে বললে 'বিদায়'। টেলিফোনে কোনো ট্যাক্সি ক্যাবকে তোমার বাসায় ডাকলে। এই যে লেখাটা তুমি পড়ছ বা ক্লাসে তোমার শিক্ষকের বক্তৃতা শুনছ, তাঁকে প্রশ্ন করছ, তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ এগুলো সবই যোগাযোগ। সুতরাং যোগাযোগ হলো, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে বা এক যন্ত্র থেকে আরেক যন্ত্রে কথা–বার্তা, চিন্তাভাবনা বা তথ্যের আদান–প্রদান বা বিনিময়।

যোগাযোগের মৌলিক নীতিমালা

১। যোগাযোগের জন্য অবশ্যই প্রেরক এবং গ্রাহক থাকতে হবে। প্রেরক ও গ্রাহক ব্যতীত যোগাযোগ হয় না। যোগাযোগের জন্য প্রেরক ও গ্রাহকের পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকবে, থাকবে আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতা।

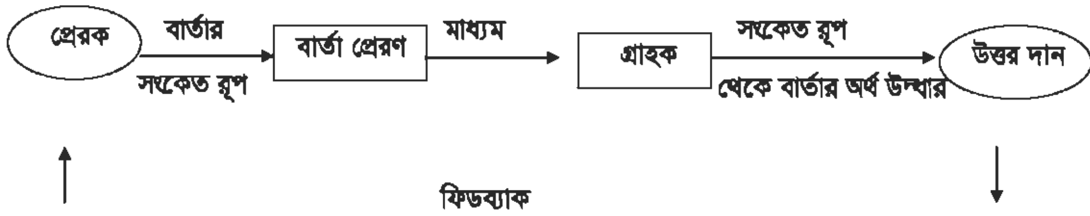
২। যোগাযোগের ভাষা হতে হবে সহজ, সরল, সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ। যোগাযোগ আসলে একটি আর্ট বা কলা। এর তথ্য বা সংকেত বা ভাষা হবে প্রেরক ও গ্রাহকের নিকট বোধগম্য এবং সুস্পষ্ট।

৩। সঠিক তথ্য সঠিক ব্যক্তির কাছে পাঠাতে হবে।

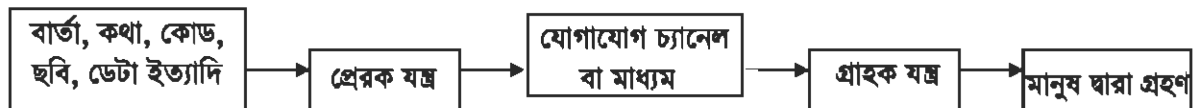
৪। যোগাযোগের ভাষা, কথা বা বার্তার মধ্যে সৌজন্যবোধ অবশ্যই থাকবে।

যোগাযোগের প্রক্রিয়া ও এর ধাপ

যোগাযোগের জন্য প্রেরক বার্তার সংকেত রূপ দিয়ে কোনো মাধ্যম দিয়ে প্রেরণ করে। গ্রাহক সংকেতরূপী বার্তা গ্রহণ করে এর অর্থ উদ্ধার করে সাড়া প্রদান করে বা উত্তর দেয়। এ সাড়া বা উত্তরকে পাঠানো হয় প্রেরকের কাছে, এ কাজটিকে বলা হয় ফিডব্যাক। এভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।



চিত্র ১৩.১ : যোগাযোগ প্রক্রিয়া



চিত্র ১৩.২ : ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবহারের মূল উপাদান বা ধাপ

যেকোন ইলেকট্রনিক যোগাযোগব্যবস্থায় থাকে একটি প্রেরক যন্ত্র, একটি যোগাযোগ মাধ্যম ও একটি গ্রাহকযন্ত্র। অধিকাংশ যোগাযোগব্যবস্থার মেসেজ বা বার্তাটি তৈরি করে কোনো ব্যক্তি। পরে তা প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে যোগাযোগ মাধ্যম দিয়ে প্রেরণ করে। গ্রাহকযন্ত্র এ বার্তা গ্রহণ করে অপর কোনো ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়। এগুলোই হলো যোগাযোগের ধাপ।

যোগাযোগের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

যোগাযোগ হলো তথ্য আদান–প্রদানের মূল প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষ তার চিন্তা, ধারণা, অনুভব একে অন্যের কাছে প্রকাশ করে বা পৌঁছে দেয়। মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করছে নানাভাবে। এখন আমরা মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ করতে পারি টেলিফোন, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ও ই–মেইলের মাধ্যমে।

কোনো সমস্যা সমাধান বা সম্পর্কের উন্নতি নির্ভর করে সার্থক ও কার্যকর যোগাযোগের উপর। পড়ালেখা, গবেষণা, ব্যবসা–বাণিজ্য, শিল্প–কারখানা, রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি, পরিবহন ব্যবস্থাপনা, অপরাধী ধরা, অপরাধ দমন ইত্যাদি কাজ সার্থকভাবে ও দ্রুত সম্পাদন করা যায় উন্নত যোগাযোগের মাধ্যমে। তথ্য বিনিময়, কোনো পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন, কোনো যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ, মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রদান করে মানুষকে প্রভাবিত করা ইত্যাদি যোগাযোগের দ্বারাই সম্ভব। ইলেকট্রনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের দিন দিন পৌঁছে দিচ্ছে উন্নতির শিখরে। প্রতিদিনই এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। তাই এ যুগকে বলা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ।

মাইক্রোফোন ও স্পিকার

মাইক্রোফোন ও স্পিকারের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। কোনো বড় সভা বা অনুষ্ঠানের সময় বক্তা যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন তাকে বলা হয় মাইক্রোফোন (চলতি কথায় মাইক)। শ্রোতা যে যন্ত্র থেকে জোরে শব্দ (বক্তৃতা) শুনতে পান তা হল লাউড স্পিকার বা স্পিকার। তোমাদের স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাইক্রোফোন ও স্পিকারের ব্যবহার তোমরা দেখে থাকবে। টেপরেকর্ডার, ভিসিআর ইত্যাদিতে মাইক্রোফোন ও স্পিকার দুটোই থাকে।

মাইক্রোফোন ও এর কার্যক্রম : মাইক্রোফোন হলো এমন একটি যন্ত্র যা শব্দশক্তিকে তড়িৎ সংকেতে পরিবর্তিত করে। মাইক্রোফোনের মধ্যে ডায়াফ্রাম নামে ধাতুর একটি পাতলা পাত থাকে। শব্দ তরঙ্গ দ্বারা এ পাত কম্পিত হয়। ডায়াফ্রাম হলো মাইক্রোফোনের সে অংশ, যা শব্দের কম্পনকে তড়িতে রূপান্তরের জন্য ডিজাইন করা থাকে। বিভিন্ন রকমের শব্দের কম্পন ডায়াফ্রামকে বিভিন্নভাবে কম্পিত করে। এই কম্পনকে মাইক্রোফোন পরিবর্তনশীল তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। একে বলা হয় অডিও সংকেত।



চিত্র–১৩.৩ : মাইক্রোফোন

এ অডিও সংকেতকে বিবর্ধিত করে টেলিফোন লাইন বা বেতারের মাধ্যমে অনেক দূরে পাঠানো যায়। সুতরাং টিভি এবং রেডিও সম্প্রচার, রেকর্ডিং ও টেলিফোনের ক্ষেত্রে মাইক্রোফোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্পিকার : গ্রামে–গঞ্জে বা সাধারণ মানুষের নিকট এটি লাউড স্পিকার বা মাইক নামে পরিচিত। স্পিকার মাইক্রোফোনের ঠিক বিপরীত কাজটি করে অর্থাৎ স্পিকার তড়িৎ সংকেতকে শব্দে পরিবর্তিত করে। এ শব্দ হলো মাইক্রোফোনের সাহায্যে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত শব্দের অনুরূপ শব্দ।

স্পিকারের কার্যক্রম : স্পিকারে থাকে একটি স্থায়ী চুম্বক। স্পিকারের বায়ু ফাঁকে (Air gap) একটি ছোট ভয়েস কয়েল (Voice coil) ঝুলানো থাকে। যখন শব্দ থেকে তৈরি প্রতিবর্তী তড়িৎপ্রবাহ এ কয়েলের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তখন স্থির ক্ষেত্র (চৌম্বক ক্ষেত্র) ও চলক্ষেত্রের (Moving field) মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটে, ফলে কয়েলটি অগ্র–পশ্চাৎ যাওয়া আসা করে। এতে বায়ুতে সংকোচন–প্রসারণ ঘটে, ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়।



চিত্র–১৩.৪ : স্পিকারের বাহ্যিক রূপ

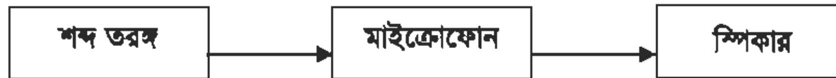
সংকেত ও এর প্রকারভেদ

সংকেত কী : সংকেত হলো কোনো চিহ্ন বা কার্য বা শব্দ যা নির্দিষ্ট বার্তা বহন করে। কোনো তড়িৎ বা রেডিওর বেলায় সংকেত হলো কোনো ঘাত বা শব্দ তরঙ্গ, যা প্রেরণ করা হয়। অথবা সংকেত হতে পারে কোনো স্যাটেলাইট (কৃত্রিম উপগ্রহ) থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ। উৎস অনুসারে বিবেচনা করলে সংকেত দুই প্রকার। যথা–

(১) অডিও সংকেত এবং (২) ভিডিও সংকেত।

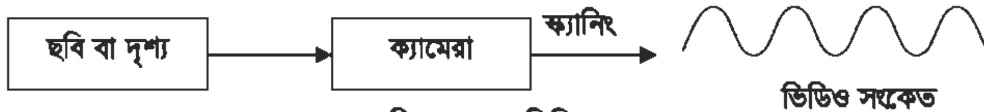
ইলেকট্রনিক যোগাযোগের সংকেতকে অন্যভাবেও প্রকারভেদ করা যায়। সংকেত প্রেরণের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সংকেত সাধারণত দুই প্রকার–(১) এনালগ সংকেত ও (২) ডিজিটাল সংকেত।

অডিও সংকেত : অডিও সংকেতের উৎস হলো শব্দ। কোনো বক্তা বা উপস্থাপকের কথা বা কণ্ঠস্বর বা যে কোনো শব্দ তরঙ্গকে মাইক্রোফোনের সাহায্যে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করা হয়। এর নাম অডিও সংকেত। এ অডিও সংকেতের কম্পাঙ্ক বা শক্তি এত কম যে একে দূর–দূরান্তে প্রেরণ করা যায় না।



চিত্র ১৩.৫ : অডিও সংকেত

ভিডিও সংকেত : ভিডিও সংকেতের উৎস হলো কোনো ছবি বা দৃশ্য। টেলিভিশন ক্যামেরা কোনো দৃশ্যকে ধারণ করে। স্ক্যানিং প্রক্রিয়ায় একে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করা হয়। এ সংকেতের নাম ভিডিও সংকেত। কোনো দৃশ্যকে দৃশ্য হিসেবে সরাসরি প্রেরণ করা যায় না। তাই একে তড়িৎ সংকেত বা ভিডিও সংকেতে রূপান্তরিত করে পাঠানো হয়।



চিত্র ১৩.৬ : ভিডিও সংকেত

এনালগ সংকেত : যেসব প্রতিভাস বা ঘটনার মান নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়, তাদের বলা হয় এনালগ। শব্দ, আলো, তাপমাত্রা, চাপের মান কোনো নির্দিষ্ট পাল্লা বা রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো মান হতে পারে। এনালগ উপাত্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রেরিত হয়। টেলিফোন, রেডিও, টিভি সম্প্রচার ও কেবল টিভি সাধারণত এনালগ ডেটা বা উপাত্ত প্রেরণ করে থাকে। সুতরাং এনালগ সংকেত হলো নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ বা কারেন্ট। অডিও ও ভিডিও ভোল্টেজ হলো এনালগ সংকেতের উদাহরণ।

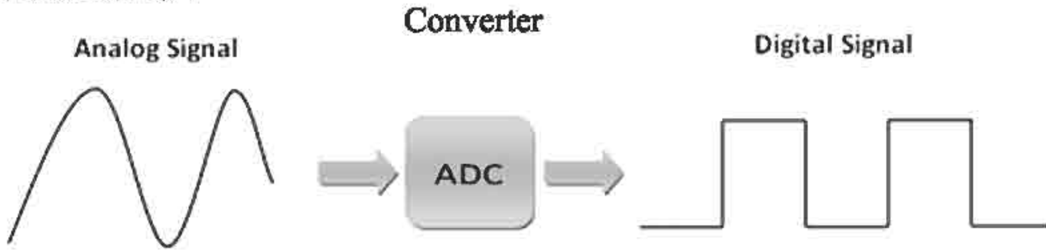


চিত্র ১৩.৭ এনালগ সংকেত



চিত্র ১৩.৮ ডিজিটাল সংকেত

ডিজিটাল সংকেত : সাধারণভাবে ডিজিট কথাটির অর্থ সংখ্যা। ডিজিটাল কথাটি এসেছে 'ডিজিট' বা সংখ্যা কথাটি থেকে। ডিজিটাল সংকেত বলতে এখন বোঝায় সেই যোগাযোগ সংকেতকে, যাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে চেনা যায়। এ ব্যবস্থায় বাইনারি কোড অর্থাৎ 0 ও 1-এর সাহায্য নিয়ে যে কোনো তথ্য, সংখ্যা, অক্ষর, বিশেষ সংকেত ইত্যাদি বোঝানো এবং প্রেরিত হয়।



চিত্র ১৩.৯ : এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর

সুতরাং ডিজিটাল সংকেত বলতে সেই সংকেত বোঝায়, যাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায়। কম্পিউটার যে কোনো উপাত্ত (ডেটা) সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রেরণ করে থাকে ডিজিটাল ডেটা হিসেবে। মোডেমের সাহায্যে এনালগ ডেটাকে ডিজিটাল এবং ডিজিটাল ডেটাকে এনালগ ডেটায় রূপান্তরিত করা যায়। এনালগ ঘড়িতে ঘড়ির কাটা অবিরত ঘুরে সময় দেয়, আর ডিজিটাল ঘড়িতে এক মিনিট পর পর সংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে সময় দেয়।

এনালগ ও ডিজিটাল সংকেতের সুবিধা ও অসুবিধা : এনালগ প্রযুক্তি সাধারণত একটু পুরনো যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা টেলিফোন, রেডিও, ভিডিও ইত্যাদি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিককালের যোগাযোগব্যবস্থা, যেমন কম্পিউটার ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তি বেশি ব্যবহৃত হয়। এনালগ ও ডিজিটাল সংকেতের মধ্যে কোনটি উত্তম তা তিনটি বিষয় দিয়ে বিচার করা যায়। এগুলো হল সংকেতের গুণগত মান, মাল–মশলা ও দাম বা ব্যয়।

দূরত্ব বেশি হলে এনালগ সংকেতের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে কমতে এক সময় হারিয়েও যেতে পারে। একে বাঁচিয়ে রাখতে পুনর্বিবর্ধন করতে হয়, কিন্তু এতে নয়েজ (Noise) বেড়ে যায়। ফলে সংকেতের মান হ্রাস পায় বা সংকেত বিকৃত হয়। কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যাল যেতে যেতে বিবর্ধিত হয়। ফলে সংকেত একই রকম থাকে। স্বল্পসংখ্যক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের জন্য এনালগ সংকেতে ব্যয় অনুযায়ী প্রাপ্তি বেশি, কিন্তু বেশি সংখ্যক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের বেলায় ডিজিটাল সংকেতের ব্যয় অনুযায়ী প্রাপ্তি বেশি। এনালগ ডিভাইসের চেয়ে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যয়বহুল হলেও ডিজিটাল সার্ভিসের বেলায় সর্বসমেত ব্যয় কম। এনালগ ডিভাইসে ক্রস কানেকশন হতে পারে, ডিজিটালে তা হয় না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বিংশ শতক এবং একবিংশ শতকের প্রারম্ভে মানুষের কার্যক্রমকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে যোগাযোগ। মানুষ আদি কাল থেকে পরস্পরের সাথে যোগাযোগের নানা উপায় বের করেছে, সামনাসামনি কথা বলা, ইশারা করা থেকে শুরু করে কবুতরের পায়ে চিঠি বা বার্তা বেঁধে যোগাযোগ করত। নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের সাথে সাথে এ যোগাযোগ আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে। ছাপাখানা, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, সেলফোন, ফ্যাক্স মেশিন, ই-মেইল, ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে।

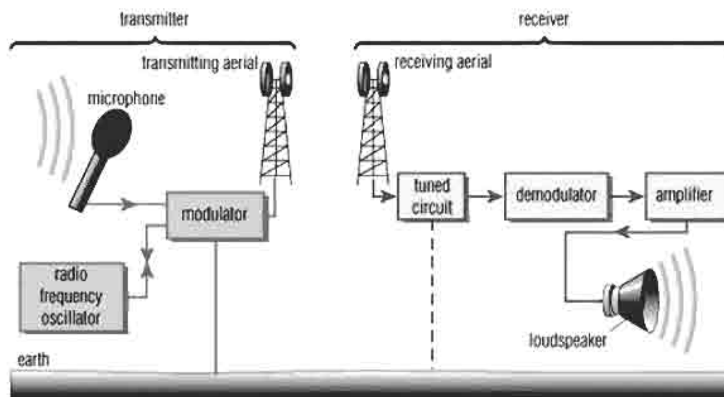
রেডিও

রেডিওতে আমরা দেশ বিদেশের খবর শুনতে পাই। আরও শুনতে পাই গান-বাজনা, নাটক, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং পণ্যের বিজ্ঞাপন। এছাড়া সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী ইত্যাদিতে নিজেদের মধ্যে কথোপকথন ও তথ্য আদান-প্রদানের জন্যও রেডিওর ব্যবহার রয়েছে। ইতালির গুগলিয়েলমো মার্কনি ও বাংলাদেশের বিক্রমপুরের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম রেডিও আবিষ্কারের সাথে জড়িত।



চিত্র-১৩.১০ রেডিও

রেডিওতে আমরা শব্দ শুনতে পাই। এ শব্দ কীভাবে প্রেরিত হয় এবং কীভাবেই বা আমরা শুনতে পাই? কোনো বেতার সম্প্রচার স্টেশনের স্টুডিওতে কোনো ব্যক্তি মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলেন। মাইক্রোফোন ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে বের হওয়া শব্দ তরঙ্গকে তড়িৎতরঙ্গে রূপান্তরিত করে। এ তরঙ্গের নাম অডিও সংকেত। এ সংকেতের শক্তি খুবই কম ফলে এ তরঙ্গ বেশি দূর যেতে পারে না। এ তড়িৎ তরঙ্গকে তাই বাহকতরঙ্গ নামক একপ্রকার উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের সাথে মিশ্রিত করা হয়। এ মিশ্রিত তরঙ্গকে বেতার তরঙ্গ বলা হয়। বেতার তরঙ্গকে প্রেরক যন্ত্রের এন্টেনার সাহায্যে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে শূন্যে (Space) প্রেরণ করে। আমাদের ঘরে যে রেডিও বা ট্রানজিস্টর সেটটি থাকে তা হলো গ্রাহকযন্ত্র। গ্রাহকযন্ত্র বেতার তরঙ্গকে গ্রহণ করে একে তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করে লাউডস্পিকারে প্রেরণ করে। লাউড স্পিকার তড়িৎপ্রবাহকে পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত করে। এ শব্দ আমরা শুনতে পাই। সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছ যে রেডিওতে প্রেরকযন্ত্র থেকে শব্দ প্রেরণ করা হয় না। শব্দতরঙ্গকে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গে (বেতার তরঙ্গে) রূপান্তরিত করে পাঠানো হয়, গ্রাহকযন্ত্র বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করে লাউড স্পিকার একে শব্দে রূপান্তরিত করে।



চিত্র ১৩.১১: রেডিও সম্প্রচার ও গ্রহণ প্রক্রিয়া

রেডিওর ব্যবহার : রেডিও বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়; যেমন–

রেডিওতে আমরা গান, বাজনা, নাটক, বক্তৃতা, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বিতর্ক ইত্যাদি শুনতে পাই। রেডিওতে আমরা দেশ বিদেশের খবর শুনতে পাই। প্রতিরক্ষা কাজে পুলিশ ও মিলিটারি গণযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রেডিও ব্যবহার করে। মোবাইল বা সেলুলার টেলিফোন যোগাযোগে রেডিও ব্যবহৃত হয়।

টেলিভিশন

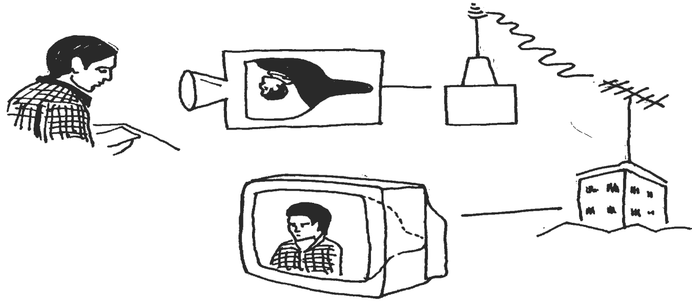
টেলিভিশন শব্দের বাংলা অর্থ দূরদর্শন। অর্থাৎ দূর থেকে দেখা। টেলিভিশনে দেখা ও শোনা দুটিই ঘটে। টেলিভিশন হলো এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে আমরা দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে শব্দ শোনার সঙ্গে বক্তার ছবি টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাই। স্কটিশ আবিষ্কারক লজি বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে টেলিভিশনে চিত্র প্রেরণে সক্ষম হন। সেদিনকার টিভিশিল্পী ছিল একটি কথা বলা পুতুল।



চিত্র ১৩.১২ : টেলিভিশন

টেলিভিশন কী করে কাজ করে :

আমরা জানি, টেলিভিশনে ছবি দেখার সাথে সাথে শব্দও শোনা যায়। টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি প্রেরণের জন্য প্রয়োজন একটি প্রেরক স্টেশন। শব্দ ও ছবি প্রেরণের জন্য টেলিভিশন প্রেরক স্টেশনে পৃথক পৃথক প্রেরক যন্ত্র থাকে। একটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে তড়িৎ সংকেত রূপান্তরিত করে প্রেরণ করা হয়। অন্য একটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে তা তাড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে প্রেরণ করা হয়।



চিত্র ১৩.১৩: টেলিভিশনে ছবি ও শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ

ছবি প্রেরণ ও গ্রহণ: যে দৃশ্য প্রেরণ বা সম্প্রচার করতে হবে তার প্রতিবিম্ব বা ছবি লেন্সের মধ্য দিয়ে টেলিভিশন ক্যামেরার পর্দায় ফেলা হয়। এ ছবিকে টেলিভিশন ক্যামেরা তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে। এ তরঙ্গ বা সংকেতকে মডুলেশন প্রক্রিয়ায় উচ্চ কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গের সাথে মিশ্রিত করা হয়। পরে এন্টেনার সাহায্যে তাড়িৎচৌম্বক বেতার তরঙ্গ হিসেবে প্রেরণ করা হয়। এন্টেনার সাহায্যে টিভি সেট ছবির জন্য প্রেরিত তাড়িতচৌম্বক বাহক তরঙ্গ গ্রহণ করে। বিবর্ধকের সাহায্যে এ তড়িৎ সংকেতকে বিবর্ধিত করা হয় এবং ইলেকট্রনগানে তা প্রদান করা হয়। পিকচার টিউবের পিছনের প্রান্তে ইলেকট্রনগান সংযুক্ত থাকে। ভিডিও সংকেত গ্রহণের পর ইলেকট্রনগান সুঁইয়ের ন্যায় সরু ইলেকট্রন বিম বা স্রোত ছুড়তে থাকে। টিভির পর্দার প্রতিপ্রভ ফসফরে ইলেকট্রন গান থেকে যখন ইলেকট্রন বিম এসে পড়ে, তখন এতে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোক ঝলকের সৃষ্টি হয়। এ উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোকবিন্দুর সমন্বয়েই টিভির পর্দায় ফুটে উঠে ক্যামেরা থেকে পাঠানো ছবি। মোটামুটিভাবে এ হলো সাদাকালো টেলিভিশনের কার্যপ্রণালি।

শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ: টেলিভিশনে যে চিত্র প্রেরণ করা হবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দকেও মাইক্রোফোনের সাহায্যে সংগ্রহ ও প্রেরণ করা হয়। মাইক্রোফোনের শব্দকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে। এর বহির্গমন ঘটে পর্যাবৃত্ত ভোল্টেজ হিসেবে। এ পর্যাবৃত্ত ভোল্টেজকে বিবর্ধিত করা হয় এবং প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়।

প্রেরক যন্ত্র কর্তৃক প্রেরিত তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ আমাদের টিভি সেটের এন্টেনায় আসে এবং তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। এ তড়িৎ প্রবাহ তারের মাধ্যমে টেলিভিশন সেটের গ্রাহকযন্ত্রে যায়। টেলিভিশন সেটের শব্দ গ্রহণকারী গ্রাহকযন্ত্র এ তড়িৎ সংকেত গ্রহণ করে বিবর্ধিত করে। লাউড স্পিকার এ তড়িৎ সংকেতকে মূল শব্দে রূপান্তরিত করে। এ শব্দ আমরা শুনতে পাই।

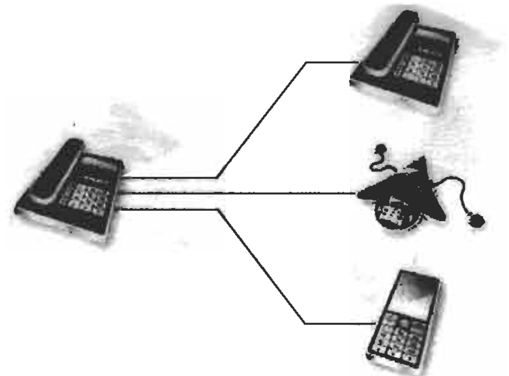
রঙিন টেলিভিশন

রঙিন ও সাদাকালো টেলিভিশনের মূল কার্যনীতিতে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। রঙিন টেলিভিশন ক্যামেরায় তিনটি মৌলিক রঙের (লাল, আসমানী এবং সবুজ) জন্য তিনটি পৃথক ইলেকট্রন টিউব থাকে। রঙিন টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্রেও তিনটি ইলেকট্রন গান থাকে। রঙিন টেলিভিশনের পর্দা তৈরি হয় তিন রকম ফসফর দানা দিয়ে। একটি বিশেষ রং শুধু তার বিশেষ রঙের ফসফরাস দানাগুলোকে আলোকিত করে। ফলে টেলিভিশন টিউবের পর্দায় একই সাথে ফুটে ওঠে লাল, আসমানী ও সবুজ রঙের বিন্দু এবং এদের বিভিন্ন রকম মিশ্রণে টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে ওঠে রঙিন ছবির বিভিন্ন রং।

টেলিফোন

টেলিফোন আধুনিক সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ। যেকোনো দেশে কথাবার্তা বলা, বার্তা, ফ্যাক্সবার্তা পাঠানো, কম্পিউটার যোগাযোগ, ই–মেইল আদান–প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় মাধ্যম। আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell) ১৮৭৫ সালে টেলিফোন আবিষ্কার করেন। গ্রাহাম বেলের আবিস্কৃত টেলিফোন বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের আধুনিক টেলিফোনে এসে পৌঁছেছে। তৈরি হয়েছে কডলেস, সেলুলার, মোবাইল ইত্যাদি নামের টেলিফোন।

টেলিফোন কীভাবে কাজ করে : প্রতি টেলিফোন সেটেই সংকেত গ্রহণ ও প্রেরণের ব্যবস্থা থাকে। টেলিফোনের হ্যান্ডসেটের মাউথ পিসটি হলো মাইক্রোফোন এবং ইয়ারপিসটি হলো স্পিকার। এদের প্রেরক ও গ্রাহক বলা যেতে পারে। টেলিফোন সেটে থাকে একটি রিংগার (টেলিফোন এলে যা ক্রিং ক্রিং ঘণ্টা বাজায়) এবং এতে থাকে একটি ডায়ালিং ব্যবস্থা। আমরা যখন কথা বলি মাউথপিসের মাইক্রোফোনটি কণ্ঠস্বরের শব্দতরঙ্গকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে। এ সংকেত টেলিফোনের তার দিয়ে অপর টেলিফোনের ইয়ারপিসে যায়। ইয়ারপিসের স্পিকার তড়িৎ সংকেতকে শব্দে রূপান্তরিত করে, ফলে গ্রাহক বা শ্রোতা শব্দ শুনতে পান এবং কথার জবাব দেন। এ জবাব শ্রোতার টেলিফোন সেটের মাউথপিসের মাইক্রোফোনের সাহায্যে তড়িৎ সংকেতে পরিণত হয়ে প্রেরকের



চিত্র–১৩.১৪ টেলিফোনের কার্যপদ্ধতি

টেলিফোনে ফিরে আসে এবং প্রেরকের ইয়ারপিসের স্পিকারে শব্দে পরিণত হয়, প্রেরক তখন গ্রাহকের কথা শুনতে পায়। টেলিফোনের তারে তড়িৎ সংকেত এত দ্রুত সঞ্চালিত হয় যে, এতে কোনো বিলম্ব ঘটে না।

প্রতিটি টেলিফোন সেটের আঞ্চলিক প্রধান অফিসের সাথে তারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। আঞ্চলিক প্রধান অফিসের মাধ্যমে অন্য টেলিফোনের সাথে যোগাযোগ ঘটে।

সেল ফোন বা মোবাইল ফোন: আজকাল মানুষের হাতে বা পকেটে একধরনের বহনযোগ্য টেলিফোন সেট দেখতে পাওয়া যায়।এ ধরনের টেলিফোনের নাম মোবাইল ফোন বা মুঠোফোন।

মোবাইলে কল করা ও কল রিসিভ করা

এ ফোন কিন্তু প্রধান অফিস বা অন্য ফোনের সাথে তার দিয়ে সংযুক্ত থাকে না। এ ধরনের ফোন তারের পরিবর্তে রেডিও বা বেতারের সাহায্যে কথাবার্তা বা তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ করে থাকে। যখন তুমি কোনো মোবাইল থেকে ফোন কর তুমি যেখানেই থাক না কেনো কলটি বেতার তরঙ্গ হিসেবে কোনো প্রেরক–গ্রাহক টাওয়ারে যায়।



চিত্র–১৩.১৫ : মোবাইল নেটওয়ার্ক

এরপর কলটি তার বা মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে মোবাইল সুইচ স্টেশনে যায়। এ স্টেশন কলটিকে স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে পাঠায়। সেখানে এটি প্রচলিত ফোন কল হয়ে গ্রাহকের নিকট পৌঁছায়।

ফ্যাক্স

তোমরা সকলে ফ্যাক্স বার্তার কথা জান। তোমার বড় ভাই বিদেশে পড়তে যাবেন। বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাক্সে তার মূল সার্টিফিকেট ও অন্যান্য ডকুমেন্টের কপি পাঠাতে বলেছে। কোনো ডকুমেন্ট হুবহু কপি করে পাঠাতে ফ্যাক্স ব্যবহার করা হয়।

ফ্যাক্স কী : ফ্যাক্সিমিল বা ফ্যাক্স হলো তার বা রেডিওর সাহায্যে গ্রাফিক্যাল তথ্য (ছবি, চিত্র, ডায়াগ্রাম বা লেখা) বা যে কোনো লিখিত ডকুমেন্ট হুবহু কপি করে প্রেরণ ও গ্রহণের একটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। এ যন্ত্রের সাহায্যে যেকোনো চিত্র, ছবি, রেখাচিত্র, লিখিত ডকুমেন্ট কোনো ফ্যাক্স মেশিনের সাহায্যে স্ক্যান করে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

১৮৪২ সালে স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার বেইন ফ্যাক্স আবিষ্কার করেন। ১৮৫০ সালে ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী ফেডারিক ব্ল্যাকওয়েল এবং ১৯০৭ সালে জার্মান বিজ্ঞানী আর্থার করুন (Korn) এর উন্নত রূপ দান করেন।

ফ্যাক্স মেশিনে যেকোন ডকুমেন্ট স্ক্যান করে ইলকট্রনিক সংকেতে রূপান্তর করা হয়, তারপর টেলিফোন বা বেতারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। নিম্নে ফ্যাক্স সিস্টেম দেখান হলো–


চিত্র–১৩.১৬ : ফ্যাক্স মেশিন



চিত্র–১৩.১৭ : ফ্যাক্স মেশিনের কার্যকম

আধুনিক ফ্যাক্স মেশিনে কোনো ডকুমেন্ট ইলেকট্রনিক উপায়ে স্ক্যানিং করা হয় এবং স্ক্যানকৃত সংকেতকে বাইনারি সংকেতে রূপান্তর করা হয়। এরপর স্ট্যান্ডার্ড মোডেম কৌশল ব্যবহার করে টেলিফোনের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

গ্রাহক ফ্যাক্স মেশিন প্রেরিত ইলেকট্রনিক সংকেত গ্রহণ করে মোডেমের সাহায্যে মূল ডকুমেন্টে পরিণত করে। এরপর একে একটি প্রিন্টারে প্রেরণ করে, যা ডকুমেন্টটিকে হুবহু ছেপে বের করে। পুলিশ বিভাগ ফ্যাক্স মেশিনের সাহায্যে স্বল্প সময়ে অপরাধীর ছবি, আঙ্গুলের ছাপ ইত্যাদি এক শহর বা এক দেশ থেকে অন্য শহর বা দেশে পাঠিয়ে অপরাধীকে শনাক্ত করতে সহায়তা করে। ব্যাংকও তাদের কাজে ফ্যাক্স মেশিন ব্যবহার করে। ফ্যাক্সের সাহায্যে একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য ও স্বাক্ষরের রেকর্ড রক্ষা এবং আদান–প্রদান করা হয়।

কম্পিউটার

বর্তমান যুগ তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগে কম্পিউটার পালন করে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা। এছাড়া জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার এত বেশি যে এ যুগকে কম্পিউটারের যুগও বলা হয়। যতই দিন যাচ্ছে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে। ব্যবসা বাণিজ্য, প্রশাসন, শিক্ষা, শিল্প, চিকিৎসা, যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা, বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের প্রয়োগ দিন দিন বেড়ে চলেছে।

কম্পিউটার কী : কম্পিউটার শব্দের অর্থ গণক বা হিসাবকারী। কম্পিউটার শুধু একটি হিসাবকারী যন্ত্রই নয়, আরো অনেক কিছু। মৌলিক অর্থে কম্পিউটার হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা ডেটা বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ (Processing) করে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যে রূপান্তর করে।

মানুষের তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, বিশ্বস্ততার সাথে, অক্লান্তভাবে, সঙ্গতিপূর্ণ ও নির্ভুলভাবে কাজ করে কম্পিউটার। কম্পিউটার নিজে ভুল করে না। কম্পিউটার ভুল শনাক্ত করতে পারে কিন্তু নিজে নিজে ভুল সংশোধন করতে পারে না। মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতার সাথে কম্পিউটারের ক্ষমতার এটা একটা বড় পার্থক্য।

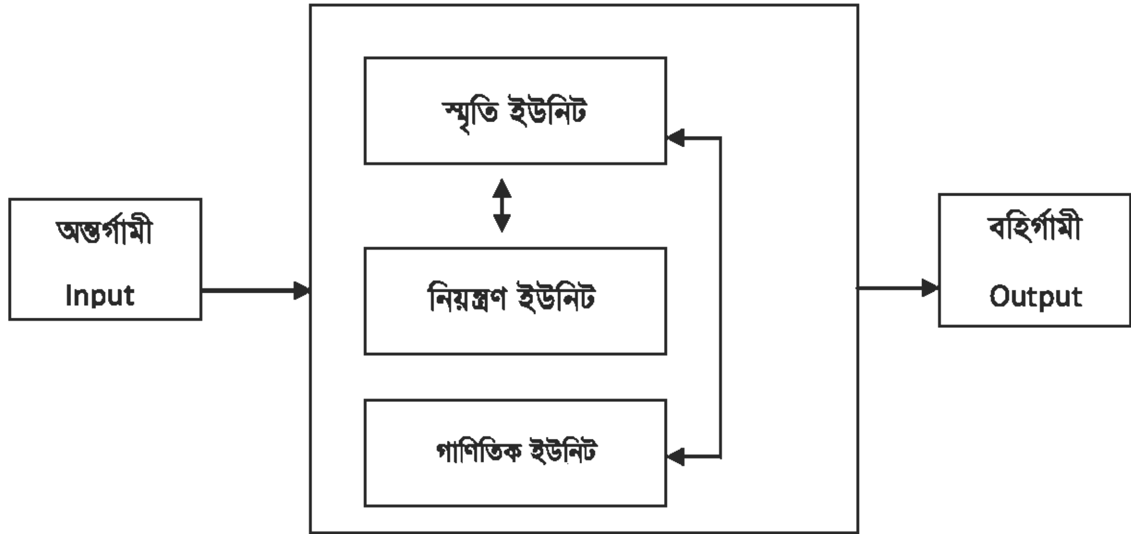


চিত্র–১৩.১৮: কম্পিউটার

কম্পিউটারের গঠন

কম্পিউটার একটি উন্নত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। কম্পিউটার

তথ্য সংগ্রহ করে, সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে এবং প্রয়োজনানুযায়ী ফলাফল উপস্থাপন করে। কম্পিউটার যেখানে তথ্য গ্রহণ করে তাকে বলা হয় অন্তর্গামী (Input) বা গ্রহণমুখ। যেখানে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে, তাকে বলা হয় সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (Central Processing Unit), যে প্রান্ত থেকে ফলাফল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বহির্গামী (Out put) বা নির্গমন মুখ। নিচে কম্পিউটারের একটি মৌলিক কাঠামো দেয়া হলো :



চিত্র–১৩.১৯ কম্পিউটারের গঠন

সব কম্পিউটারে প্রধান যে দুটি ইনপুট ডিভাইস থাকে তাহলো কি–বোর্ড ও মাউস। এছাড়া জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস হলো স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন। এদের সাহায্যে কম্পিউটারে উপাত্ত প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে থাকে স্মৃতি ইউনিট, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও গাণিতিক যুক্তি ইউনিট। আউটপুট ডিভাইসে প্রধানত থাকে মনিটর ও প্রিন্টার। এদের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকৃত ডেটা বা উপাত্ত আমরা পাই। এছাড়া থাকতে পারে স্পিকার।

কম্পিউটারের বেলায় আরও দুটি বিষয় হলো হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার। যেসকল ভৌত ডিভাইস দিয়ে কম্পিউটার তৈরি তাদের বলা হয় হার্ডওয়্যার। যেমন: কি–বোর্ড, মাউস, প্রসেসর, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি। এদের সবাইকে স্পর্শ করা যায়। সফটওয়্যার হলো এক সেট নির্দেশনা যা কম্পিউটারকে কী কাজ করতে হবে তা বলে দেয়। এগুলো হলো বিভিন্ন প্রোগ্রাম যেমন– উইন্ডোজ ৯৮, উইন্ডোজ ২০০৩ ও ২০০৭ ইত্যাদি। হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের দেহ এবং সফটওয়্যার হলো কম্পিউটারের প্রাণ।

কম্পিউটারের ব্যবহার

আমরা পাঠের শুরুতেই বলেছি যে আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো হলো : চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগীর পরিচয়, ঠিকানা, রোগের লক্ষণ, রোগীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইত্যাদি রেকর্ড করে রাখা, ঔষধ নির্বাচন ও পরীক্ষা–নিরীক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

ব্যবসা–বাণিজ্যে পণ্যের মজুদ নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায়িক যোগাযোগ, টিকেট বুকিং, ব্যাংকিং সিস্টেম, স্টাফদের বেতন, আয়–ব্যয়ের বাজেট ও হিসাব নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

জাহাজ, বিমান ও মোটরগাড়ি, ট্রেন ইত্যাদি যানবাহনের ট্রাফিক কন্ট্রোল, গতি নিয়ন্ত্রণ, টিকেট বুকিং ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। শিল্প–কারখানায় পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের গুণগত মান যাচাই, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ, স্বশিখন, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সেনাবাহিনী পরিচালনা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের ব্যবহার মুদ্রণশিল্পে বিপ্লব এনেছে। মুদ্রণের জন্য কম্পোজ, ডিজাইন ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে অস্বাভাবিক মুদ্রণ ব্যয় কমে এসেছে। স্থপতি ও শিল্পীদের ডিজাইনের কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

ইন্টারনেট ও ই–মেইল

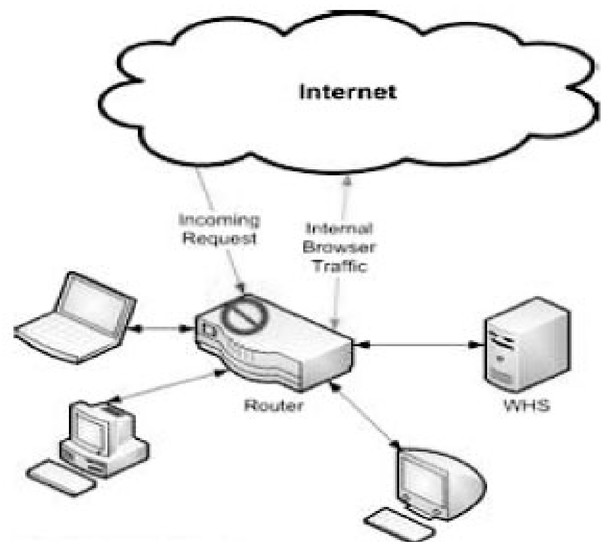
ইন্টারনেট ও ই–মেইলের নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ। শহরে যাদের বাসায় বা স্কুলে কম্পিউটার আছে এবং সাথে ইন্টারনেট সংযোগ আছে, তারা হয়তো ইন্টারনেট ও ই–মেইলের ব্যবহার করে থাকবে। ই–মেইল বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ডাক মাধ্যম। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই–মেইল পাঠানো হয়।

ইন্টারনেট হলো 'নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক' বা 'সকল নেটওয়ার্কের জননী'। এটি একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, যা সংযুক্ত করেছে ২০০ এর চেয়েও বেশি দেশের প্রায় ৪,০০,০০০ ছোট ছোট নেটওয়ার্ককে। ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে শিক্ষামূলক, বাণিজ্যিক, অলাভজনক, সরকারি এবং সামরিক সংস্থা নিয়ে। সার্বিকভাবে ইন্টারনেটের কোনো ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত মালিকানা নেই। ১৯৬৯ সালে আমেরিকান প্রতিরক্ষা বিভাগ ইন্টারনেট চালু করেছে। ইন্টারনেট হলো এমন একদল নেটওয়ার্ক যা তৈরি অসংখ্য কম্পিউটার, মোডেম, টেলিফোন লাইন দিয়ে। এসব উপাদান পরস্পরের সাথে ভৌতভাবে সংযুক্ত। এ নেটওয়ার্ক পরস্পরের সাথে যে কোনো তথ্য বা উপাত্ত আদান–প্রদানে সক্ষম। ইন্টারনেট অনেকগুলো নেটওয়ার্কের সমষ্টি এবং সকলে মিলে একটি একক নেটওয়ার্কের মতো কাজ করে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুমি দিন বা রাতের যে কোনো সময় অনলাইন লাইব্রেরির হাজার–হাজার, লক্ষ লক্ষ বইপুস্তক, জার্নাল, ম্যাগাজিন ইত্যাদির সন্ধান পেতে পার এবং তোমার প্রয়োজনে পাঠ করতে পার অথবা 'ডাউনলোড' করে ছেপে বের করে নিতে পার। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুমি তোমার বন্ধু বা যে কোনো ব্যক্তির সাথে যখন তখন আড্ডা দিতে পার। ইচ্ছে করলে কোনো চলচ্চিত্র দেখতে পার, পৃথিবীর যে কোনো রেডিও শুনতে পার। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুমি ট্রেন, বাস বা বিমানের টিকিট বুকিং দিতে পার, ব্যবসা–বাণিজ্য করতে পার, করতে পার ই–ব্যাংকিং।

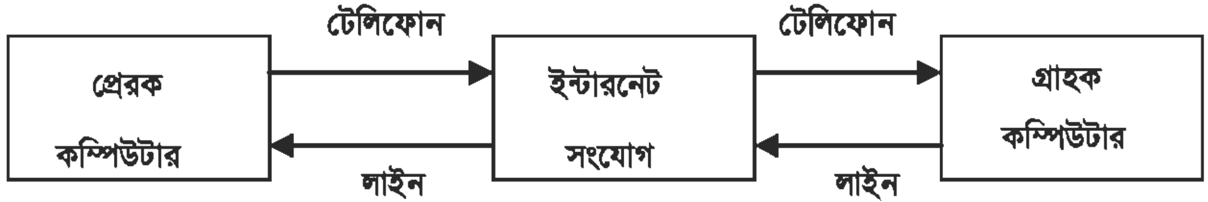
ই–মেইল

ইলেকট্রনিক মেইলকে সংক্ষেপে বলা হয় ই–মেইল। ই–মেইল হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে বন্ধু–বান্ধব, সহপাঠী, আত্মীয়স্বজন বা সহকর্মীদের সাথে দ্রুত যোগাযোগের উপায়। এই মেইল বা চিঠি পাঠাতে



চিত্র–১৩.২০ : ইন্টারনেট যেভাবে কাজ করে

কোনো স্ট্যাম্প, পোস্টকার্ড বা এনভেলপ বা কোনো ডাকপিয়নের দরকার হয় না। ইন্টারনেটের সাহায্যে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে চিঠি পাঠানো যায়, ডকুমেন্ট, চিত্র, ছবি এবং যে কোনো তথ্য আদান–প্রদান করা যায়। ই–মেইল কীভাবে পাঠানো হয় তার নিচের চিত্রে দেওয়া হলো:



চিত্র–১৩.২১ : ই–মেইল গ্রহণ ও প্রেরণ

কম্পিউটার ব্যবহারকারী স্থানীয়ভাবে বা সমগ্র বিশ্বে ই–মেইলের সাহায্যে বার্তা আদান–প্রদান করতে পারে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ই–মেইল বার্তা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে এবং বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে বার্তা সেকেন্ডের মধ্যে আসতেও পারে।

ইন্টারনেট ও ই–মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগে সময় ও খরচ কম লাগে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অতি দ্রুত যোগাযোগ করা যায়। শুধু চিঠিপত্র নয়, যেকোনো ডকুমেন্ট পাঠানো যায়। এতে খুব কম লোক বলের প্রয়োজন হয়। অনলাইনে বাজার করা, আড্ডা দেওয়া, গল্প–গুজব করা সম্ভব। অডিও ও ভিডিও কনফারেন্সিং সম্ভব। ই–ব্যাংকিং ও ই–কমার্স সম্ভব। যে কোনো রেডিও শোনা ও সিনেমা দেখা সম্ভব।

যোগাযোগ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্য সমস্যা

স্বাস্থ্য সমস্যা

তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। তোমরা যারা রোজই অধিক সময় ধরে কম্পিউটারে কোনো গেইম খেল, তারা হাতের আঙ্গুলের মাথায় সুঁই ফুটানোর মতো ব্যথা, আঙ্গুলের মাথায় ফোস্কা পড়া, আঙ্গুল ফুলে যাওয়া ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়ে থাকবে।

যারা অধিকক্ষণ ধরে কম্পিউটার নিয়ে কাজ করে, কম্পিউটারের কি–বোর্ড ও মাউসের দীর্ঘক্ষণ ও দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে তাদের হাতের রগ, স্নায়ু, কব্জি, বাহুতে, কাঁধ ও ঘাড়ে অতিরিক্ত টান (stress) বা চাপ পড়ে। ফলে কাজের ফাঁকে যথেষ্ট বিশ্রাম না নিলে এসব অঙ্গে ব্যথাসহ নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে হাত, বাহু ও আঙ্গুলের ব্যথা, আঙ্গুল ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম না নিয়ে দীর্ঘদিন ও দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করলে চোখে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়, একে বলা হয় কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম। এই সিনড্রোমের মধ্যে রয়েছে চোখ জ্বালা পোড়া করা, চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চোখ চুলকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়া।

প্রতিকারের উপায়

কম্পিউটার ব্যবহার থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। আমাদের সতর্ক হতে হবে যাতে এসব স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি না হয়। হাত, হাতের কব্জি, আঙ্গুল, কাঁধ ও ঘাড়ে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার জন্য যা করতে হবে তা হলো :

১. কম্পিউটারে কাজ করার সময় সঠিকভাবে বসতে হবে এবং সোজা সামনে তাকাতে হবে।

২. সঠিক পদ্ধতিতে টাইপ করতে হবে। টাইপ করার সময় হাতে যেন কোনো কিছুর ওপর রাখা না থাকে এবং হাত ও আঙ্গুল যেন সোজা থাকে।

৩. কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্তত আধা ঘণ্টা পর পর ৫ মিনিটের জন্য বিশ্রাম নিতে হবে এবং কাঁধ ও ঘাড়কে রিল্যাক্স করতে দিতে হবে।

কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোমের কারণে সৃষ্ট চোখের সমস্যা প্রতিরোধে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করবে তা হলো :

১. তোমার কম্পিউটারের পর্দাটি যেন অবশ্যই তোমার চোখ থেকে ৫০–৬০ সেন্টিমিটার দূরে থাকে।

২. কোনো ডকুমেন্ট হোল্ডার ব্যবহার করলে তা অবশ্যই পর্দার কাছাকাছি রাখবে।

৩. মাথার ওপরকার বাতির আলো এবং টেবিলের বাতির আলো এমনভাবে কমিয়ে দিতে হবে তা যেন তোমার চোখে বা কম্পিউটারের পর্দায় না পড়ে।

৪. ১০ মিনিট পর পর দূরের কোনো বস্তুর দিকে তাকাবে, এতে চোখ আরামবোধ করবে।

৫. মাঝে মাঝেই চোখের পলক ফেলবে।

সুতরাং কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যাকে এড়াতে হলে আমাদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

রেডিও, টেলিভিশন ও মোবাইল ফোন থেকে সৃষ্ট সমস্যা

রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে যে সমস্যা দেখা দেয় তা প্রধানত শব্দদূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা। তোমরা অনেকে খুব হাই–ভলিয়ুমে রেডিও ও টেলিভিশন চালাও। এতে তোমার কানের যেমন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে যারা তোমার আশপাশের বাড়িতে বাস করেন, তাদের মধ্যে যদি উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগী এবং হৃদরোগী থাকেন বা অন্য যে কোনো অসুস্থ ব্যক্তি থাকেন শব্দ দূষণজনিত কারণে তারা আরও বেশি অসুস্থতা ও অস্থিরতা বোধ করতে পারেন। যারা খুব বেশি শব্দে রেডিও বা টিভি চালান, তারা মাথা ব্যথা, কানে কম শোনা, অবসন্নতা ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়তে পারেন।

এছাড়া যারা দিনে চার ঘণ্টার বেশি টিভি দেখেন, তাদের মধ্যে নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন–মাথাব্যথা, বিরক্তিবোধ, নিদ্রাহীনতা, চোখে ব্যথা, চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া সমস্যায় ভোগেন। এছাড়া অস্বাভাবিক অবসন্নতা, স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, হরমোনজনিত সমস্যায় ভুগতে পারেন। এ প্রতিক্রিয়া শিশুদের জন্য বেশি হয়ে থাকে। এদের বিকাশমান কোষের যথোপযুক্ত বিকাশে টেলিভিশন থেকে নিঃসৃত বিকিরণ যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে।

এসব স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করা উত্তম। তাই শব্দদূষণ থেকে রক্ষা পেতে উচ্চ শব্দে রেডিও বা টিভি না চালানো, একনাগাড়ে অধিক সময় রেডিও এবং টিভি না শোনা বা না দেখা উত্তম।

টেলিভিশন থেকে নিঃসৃত বিকিরণ থেকে রক্ষা পেতে টেলিভিশন থেকে নিরাপদ দূরত্বে (৫০–৬০ সেমি) বসে টিভি দেখতে হবে। চোখ ব্যথা বা চোখের ওপর অতিরিক্ত চাপ বা টান এড়াতে হলে তোমার চোখ ও টিভি পর্দার লেভেল একই থাকতে হবে। টিভির দিকে এক নাগাড়ে তাকিয়ে না থেকে কিছুক্ষণ পরপর চোখের পলক ফেলতে হবে।

এরপর আসা যাক, মোবাইল ফোন থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে। মোবাইল ফোন হলো একটি নিম্ন ক্ষমতার রেডিও ডিভাইস যা একটি ছোট এন্টেনার সাহায্যে রেডিও কম্পাঙ্ক বিকিরণ, প্রেরণ ও গ্রহণ করে। মোবাইল ব্যবহারের সময় এ এন্টেনাটি ব্যবহারকারীর মাথার সন্নিকটে থাকে। এ নিয়ে মানুষ উদ্বিগ্ন যে মাইক্রো তরঙ্গ ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করতে পারে। মোবাইল ব্যবহারের ফলে তাই ঘুমে ব্যাঘাত, স্মৃতি সমস্যা, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, খিঁচুনি ও উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এসব সমস্যার সৃষ্টি সম্পর্কে খুব বেশি একটা প্রমাণ নেই; তবু অত্যধিক বিকিরণ থেকে রক্ষা পেতে আমাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিকিরণের প্রভাব খুব বেশি না পড়লেও শিশুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এ বিকিরণ শিশুদের মস্তিষ্কের কোষ বিকাশে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করার জন্য সবাইকে সাবধান করা হয়েছে। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়। সুতরাং গাড়ি চালানোর সময় আমাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়।

অনুসন্ধান (২ পিরিয়ড)

মনে কর, তোমার কাজটির শিরোনাম : **'যেসব ছেলেমেয়ে অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহার করে, তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা'–একটি অনুসন্ধান**

তোমার গবেষণার উদ্দেশ্য হতে পারে–

(১) অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা শনাক্তকরণ।

(২) পেশাদার ও অপেশাদার কম্পিউটার ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না তা জানা।

(৩) এসব স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টির কারণ জানা।

(৪) ব্যবহারকারীর বয়স ও স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা জানা।

(৫) কী করে এসব স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যায় তা জানা।

এরপর তোমাকে এলাকা চিহ্নিত করতে হবে এবং তারপর কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করতে হবে। কোনো

কোনো সময় একই এলাকায় বেশি কম্পিউটার ব্যবহারকারী না–ও পেতে পার। তখন তোমাকে বিভিন্ন এলাকা থেকে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের খুঁজে বের করতে হবে এবং খুব বেশি ব্যবহারকারী থাকলে তাদের থেকে নমুনা নিতে হবে। এজন্য বন্ধুরা কাজ ভাগাভাগি করে নিতে পার।

এরপর তোমাকে তোমার অনুসন্ধানের একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। এ প্রতিবেদনে থাকবে–

১. শিরোনাম
২. একটি ভূমিকা
৩. অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য
৪. অনুসন্ধানের নমুনা (অঞ্চল বা ব্যক্তি)
৫. অনুসন্ধানের তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি
৬. অনুসন্ধানের তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি
৭. অনুসন্ধানের ফলাফল ও মন্তব্য এবং সুপারিশ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সকল নেটওয়ার্কের জননী কোনটি?

ক. ই-মেইল খ. ইন্টারনেট
গ. মোবাইল ঘ. টেলিফোন

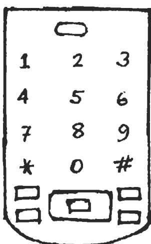
২. কম্পিউটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

i. কম্পিউটার ভুল করে না ভুল শনাক্ত করতে পারে
ii. কম্পিউটার নিজে ভুল সংশোধন করতে পারে
iii. কম্পিউটার অক্লান্ত ও নির্ভুলভাবে কাজ করতে পারে

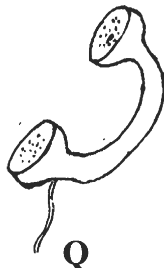
নিচের কোনটি সঠিক?

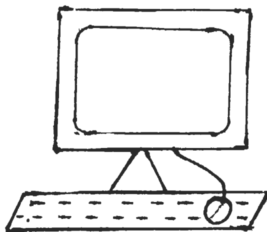
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

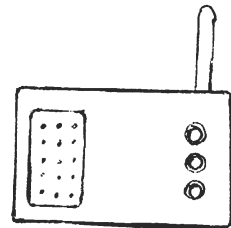
নিচের চিত্রগুলো থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



P


Q


R


S

৩. আবহাওয়ার সংবাদ শুনতে কোনটি কার্যকর?

ক. P খ. Q

গ. R ঘ. S

৪. ' P' যন্ত্রটির অধিক ব্যবহারে -

i. মাথা ব্যথা ও বমি বমি ভাব হতে পারে

ii. খিঁচুনি ও উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে

iii. ভালো ঘুম হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফারহান ও ফাহাদ সময় পেলেই কম্পিউটার গেম খেলে এবং টিভি দেখে। ফারহান খুব কাছে বসে টিভি দেখে। ইদানীং ফারহানের আঙুলে ব্যথা ও চোখ জ্বালা পোড়া করে। মা ফারহানকে কম্পিউটার চালাতে ও কাছাকাছি বসে টিভি দেখতে নিষেধ করলেন।

ক. রঙিন টেলিভিশনের মৌলিক রং কয়টি?

খ. ডিজিটাল সংকেত বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকের প্রথম যন্ত্রটির যান্ত্রিক কৌশল বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফারহানের সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. নজরুল ইসলাম সবসময় ইন্টারনেটে কাজ করেন। একদিন ইন্টারনেটে বিদেশে একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখে তিনি আবেদন করলে অপর প্রান্ত থেকে দরকারি কাগজপত্র, মূল সার্টিফিকেটের কপি পাঠাতে বলা হয়। তিনি কাগজপত্র স্ক্যান না করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কয়েক মিনিটের মধ্যে পাঠিয়ে দেন।

ক. হার্ডওয়্যার কী?

খ. অডিও সংকেত বলতে কী বুঝায়?

গ. নজরুল ইসলামের যোগাযোগের প্রথম মাধ্যমটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নজরুল ইসলাম প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো ইন্টারনেটের পরিবর্তে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কেন পাঠালেন? বিশ্লেষণ কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

জীবন বাঁচাতে বিজ্ঞান

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের দরকার সুস্থ, সবল ও নীরোগ দেহ। শত চেষ্টা করেও সবসময় সুস্থ থাকতে পারি না। আমরা কখনো কখনো নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। রোগ হলে চিকিৎসা দরকার। চিকিৎসার জন্য দরকার সার্বিক রোগ নির্ণয়। বর্তমান সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগে তৈরি হয়েছে রোগ নির্ণয়ের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি। ফলে মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা শনাক্তকরণে এবং তা নিরাময় ও প্রতিরোধে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা অনেক সহজ হয়ে পড়েছে। রোগ নির্ণয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অবদান প্রশংসনীয়।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ধারণার ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা এবং প্রতিরোধের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞানের অবদানকে প্রশংসা করতে পারব।

এক্সরে (X- Ray)

এক্সরে হলো এক ধরনের তাড়িত চৌম্বক বিকিরণ। এই বিকিরণ দৃশ্যমান নয়। ১৮৯৫ সালে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী উইলহেম রনজেন এক্সরে আবিষ্কার করেন। এর সাহায্যে প্রাপ্ত ফটোগ্রাফ দ্বারা শরীরের কোনো ভাঙ্গা হাড়, ক্ষত বা অবাঞ্ছিত বস্তুর উপস্থিতি বোঝা যায়। এছাড়া এক্সরে রোগাক্রান্ত কোষ ধ্বংস করতে পারে। তাই চিকিৎসা শাস্ত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ছাড়াও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ও শিল্পক্ষেত্রে এক্সরের ব্যবহার অনেক।

কার্যপ্রণালি

এক্সরে মেশিনে টাংস্টেন কুন্ডলির মাঝে উচ্চ বিভবশক্তির তড়িৎ চালনার ফলে কুন্ডলি গরম হয়ে ইলেকট্রন নির্গত হয়। একটি চোঙ দ্বারা ইলেকট্রনের প্রবাহ নির্দিষ্ট দিকে চালনা করা হয়। চোঙের অপর প্রান্তে একটি ধাতব পাত (টাংস্টেন বা মলিবডেনাম) থাকে। এই উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন ধাতব পাতে আঘাত করার ফলে তাপ উৎপন্ন হয় এবং কিছু পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হয়। এই বিকিরিত রশ্মিই এক্সরে।

এক্সরে নরম অধাতব বস্তু ভেদ করে চলে যেতে পারে। কিন্তু ধাতব বস্তু এটি শোষণ করে। আমরা জানি হাড়ের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। এটি এক্সরেকে অনেকাংশে শোষণ করে। তাই হাড়ের ক্ষয় হলে বা ভেঙ্গে গেলে এক্সরের মাধ্যমে শনাক্ত করা সহজ হয়।



চিত্র ১৪.১: হাতের এক্সরে

এক্সরে কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

এক্সরে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়। এগুলো হলো ফুসফুসের রোগ যেমন– নিউমোনিয়া ও যক্ষা শনাক্তকরণ; পিত্তথলি ও কিডনির পাথর শনাক্তকরণ; অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা শনাক্তকরণ; দাঁতের গোড়ায় ঘা এবং ক্ষত

নির্ণয়; স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে ফাটল ও ভেঙ্গে যাওয়া হাড় শনাক্তকরণ। এছাড়াও এক্সরে ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে।

এক্সরের ঝুঁকি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

- অতিরিক্ত এক্সরে জীবকোষ ধ্বংস করে।
- শিশুদের প্রজননতন্ত্রে এক্সরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
- গর্ভবর্তী অবস্থায় (বিশেষত ২–৪ মাস সময়ের মাঝে) এক্সরে মা ও শিশু উভয়ের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
- একই জায়গায় বারবার এক্সরে করার ফলে টিউমার সৃষ্টির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এক্সরের ঝুঁকি এড়াবার কৌশল

- গর্ভবর্তী মহিলাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এক্সরে রুমে যাওয়া ঠিক নয়।
- শিশুদের এক্সরে করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।
- যারা এক্সরে রুমে কাজ করেন, তাদের এক্সরের তেজস্ক্রিয়তা এড়াতে পুরু সিসার দেয়ালের আড়ালে থাকতে হবে।

আলট্রাসনোগ্রাফি (Ultrasonography)

শরীরের অভ্যন্তরের নরম টিস্যুর অভ্যন্তরীণ কোনো ক্ষতি হয় বা তাতে কোনো সমস্যা হলে আলট্রাসনোগ্রাফি করে তা শনাক্ত করা যায়। সাধারণত হৃদপিন্ডে অথবা শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নরম অঙ্গ যেমন মস্তিষ্ক, যকৃৎ, পিত্তথলি, প্রধান রক্তনালিসমূহ প্রভৃতিতে আলট্রাসনোগ্রাফি করা হয় । বর্তমানে ভ্রূণের বৃদ্ধি, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ, পিত্তথলি ও মূত্রথলির পাথর সনাক্তকরণ ও স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের টিউমার সনাক্তকারণেও আলট্রাসনোগ্রাফি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ১৪.২: আলট্রাসনোগ্রাফি থেকে প্রাপ্ত ছবি

কার্যপ্রণালি

এখানে শব্দের প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগানো হয়। এর মূলনীতি অনেকটা যেভাবে শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয় অনেকটা সেরকম। আলট্রাসনোগ্রাফিতে শ্রবণোত্তর শব্দ তরঙ্গ (যে শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ২০,০০০ Hz এর বেশি) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে বৈদ্যুতিকভাবে রূপান্তরিত একটি সরু তরঙ্গের রশ্মি নিক্ষেপ করা হয়। এই শব্দ তরঙ্গের কিছু অংশ কোথাও বাধা পেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে আর বাকি অংশ বাধা না পেয়ে চলে যায়। কতটুকু ফিরে আসল এবং আসতে কতক্ষণ সময় নিল এর উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারে একটি নিখুত ছবি আঁকা হয়। এই ছবি দেখেই রোগ শনাক্ত করা হয়।

আলট্রাসনোগ্রাফির ঝুঁকি

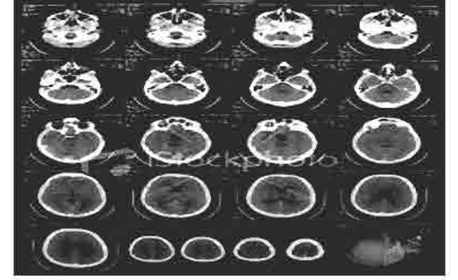
আলট্রা সাউন্ড (শ্রবণোত্তর শব্দ তরঙ্গ) এর একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো এটি কঠিন অস্থি ভেদ করতে পারে না। এতে অস্থির পেছনের অংশ পূর্ণাঙ্গভাবে সর্বদা ধরা পড়ে না। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে আলট্রাসনোগ্রাফি ক্ষতিকর নয় তবে তারা পরামর্শ দিয়েছেন গর্ভবতী অবস্থায় যতটা সম্ভব কম আলট্রা সাউন্ড ব্যবহার করা উত্তম।

আলট্রাসনোগ্রাফির ঝুঁকি এড়াবার উপায়

আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরের একটি সঠিক ছবি পাওয়া অনেকাংশে নির্ভর করে যিনি যন্ত্রটি নিয়ন্ত্রণ করবেন তার দক্ষতার ওপর। একজন দক্ষ অপারেটরের মাধ্যমে এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে আলট্রাসনোগ্রাফি করা উচিৎ।

সিটি স্ক্যান (CT Scan)

ধরা যাক, কোনো একজন ব্যক্তি পেটে ব্যথা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার তাকে এক্সরে করাতে বললেন। এক্সরে রিপোর্টে ধরা পড়ল তার পেটে টিউমার আছে। কিন্তু এই রিপোর্ট দেখে বোঝার উপায় নেই টিউমারটি ঠিক কোথায় অর্থাৎ কতটা ভিতরে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য CT Scan বা Computed Tomography Scan অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে কোনো পেশি বা অস্থির স্থান পরিবর্তন, অস্থি, টিউমার, অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বা শারীরিক ক্ষতির নিখুঁত অবস্থান জানা যায়। মাথায় আঘাত পেলে মস্তিষ্কে কোনো ধরনের রক্তক্ষরণ হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য সিটি স্ক্যান একটি উত্তম উপায়।



চিত্র ১৪.৩: সিটি স্ক্যান থেকে প্রাপ্ত ছবি

কার্যপ্রণালি

আলোর প্রতিসরণের সাথে জ্যামিতিক হিসেবের মাধ্যমে দ্বিমাত্রিক ছবিগুলোকে এখানে ত্রিমাত্রিক করা হয়। এক্সরেতে একটি রশ্মি ছোড়া হয় কিন্তু সিটি স্ক্যানে একটির পরিবর্তে একগুচ্ছ রশ্মি ছোড়া হয়। এ রশ্মিগুলো একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দিক নিক্ষেপ থেকে ছবি তোলে। দ্বিমাত্রিক এই ছবিগুলোর জ্যামিতিক হিসেবের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক রূপ দেয়া হয় আর এতে কোনো বস্তুর অবস্থান নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সহজ হয়।

সিটি স্ক্যানের ঝুঁকি বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

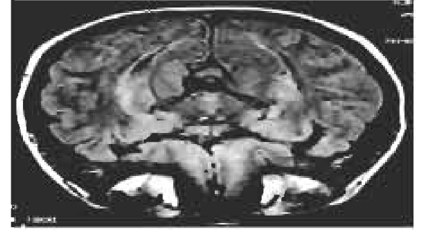
সিটি স্ক্যানের ঝুকি বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম। তবুও এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যা হতে পারে–

- এখানে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থাকে যদিও এটি খুব বেশি নয়।
- কখনো কখনো সিটি স্ক্যানে "ডাই" ব্যবহার করা হয় যা অনেকের ক্ষেত্রে এলার্জিজনিত সমস্যা তৈরি করে।

সিটি স্ক্যানের ঝুঁকি এড়াবার কৌশল

- ধাতব বোতাম বা চেইনবিশিষ্ট কোনো কাপড় পরিধান না করা।
- কোনো রকম ধাতব অলংকার, ঘড়ি ইত্যাদি না রাখা।
- যে কোনো ধরনের এলার্জিজনিত সমস্যার কথা পূর্বেই ডাক্তারকে জানানো।
- রোগী গর্ভবতী হলে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে জানাতে হবে।

এমআরআই (MRI)


চিত্র ১৪.৪: এমআরআই থেকে প্রাপ্ত ছবি

এমআরআই (Magnetic Resonance Imaging) হলো একটি কৌশল যা শরীরের যে কোনো অঙ্গের (বিশেষ করে যেটি নরম বা সংবেদনশীল) তার পরিষ্কার ও বিস্তারিত ছবি তুলতে পারে। এটি শরীরের যে কোনো অঙ্গের জন্য ব্যবহার করা হলেও মস্তিষ্ক, পেশি ও যোজক কলার সমস্যাদি এবং ব্রেইন টিউমার শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। এমআরআই–এর মাধ্যমে পায়ের গোড়ালির মচকানো ও পিঠের ব্যথার জখম বা আঘাতের তীব্রতা নির্ণয় করা যায়।

কার্যপ্রণালি

এমআরআই (MRI) এ প্রধানত চৌম্বকক্ষেত্রকে কাজে লাগানো হয়েছে। চৌম্বকক্ষেত্রের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো চৌম্বকক্ষেত্রের ঘনত্ব সব জায়গায় একই রকম থাকবে। এই চৌম্বকক্ষেত্রে মানব শরীরে যে পানি আছে তাকে বিশেষ পদ্ধতিতে চৌম্বকায়িত করে। শরীরের এই চৌম্বকায়িত অংশ চৌম্বকক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করে এবং এর ওপর ভিত্তি করে ত্রিমাত্রিক ছবি তুলে আনা হয়।

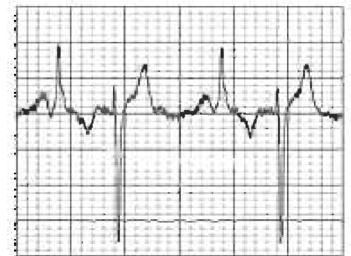
এমআরআই–এর ঝুঁকি বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

- অনেক সময় এখানে ডাই (Dye) ব্যবহার করা হয় যা এলার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ার কারণ হতে পারে।
- কখনো কখনো এমআরআই মেশিনের টানা উচ্চ শব্দের কারণে মাথাব্যথা বা ঝিমুনি ভাব আসতে পারে।

এমআরআই–এর ঝুঁকি প্রতিরোধ

- ডাই এর উপাদান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে।
- এমআরআই মেশিনের আশেপাশে ধাতব কোনো বস্তু রাখা যাবে না।

ইসিজি (ECG)


চিত্র ১৪.৫: ইসিজি থেকে প্রাপ্ত ছবি

ইসিজি বা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electrocardiogram) হচ্ছে অত্যন্ত সহজ, ব্যথাবিহীন একটি পরীক্ষা যার মাধ্যমে হৃদপিন্ডের বর্তমান বা পূর্বের সমস্যা বোঝা যায়। এর মাধ্যমে হৃদপিন্ড সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, হৃদকম্পন নিয়মিত কিনা, শরীরের নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গে রক্ত চলাচল সঠিক কিনা তা বোঝা যায়। এছাড়াও শরীরের কোনো নির্দিষ্ট রাসায়নিক উপাদান ঠিক আছে কিনা তাও এর মাধ্যমে বোঝা যায়। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটি সম্ভাব্য হার্ট এটাক সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সতর্ক সংকেত দিতে পারে।

কার্যপ্রণালি

এই পরীক্ষাটি তরঙ্গের মাধ্যমে করা হয়। বুকের ওপর দুটি ধাতব দন্ড সেট করা হয়। সেটা হৃদকম্পন ও হৃদপিন্ড থেকে যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ নি:সৃত হয় তা ইসিজি মেশিনে পাঠিয়ে দেয়। ইসিজি মেশিন সাধারণত একটি গ্রাফ আকারে প্রদর্শন করে। এই গ্রাফ দেখেই হৃদপিন্ড সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা বোঝা যায়।

ইসিজি–এর ঝুঁকি বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং গবেষকদের মতে এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

এন্ডোস্কোপি (Endoscopy)

মনে কর, যদি একজন মানুষের ওপর কোনো অস্ত্রোপচার না করে তার শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যেতো সেক্ষেত্রে বিষয়টি কেমন হতো? এ বিষয়টি মাথায় রেখেই বিজ্ঞানীরা এন্ডোস্কোপ তৈরি করেছেন। এটি এক ধরনের বাকানো টেলিস্কোপ। এন্ডোস্কোপ সাধারণত তখনই ব্যবহার করা যায়, যখন শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যা এক্সরে বা সিটি স্ক্যান করে নিশ্চিত হওয়া না যায়। যেমন: পেটে ব্যথা, গ্যাস্ট্রিক আলসার, পরিপাকতন্ত্র, মূত্রনালি, প্রজনতন্ত্র প্রভৃতির সমস্যার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এন্ডোস্কোপির ব্যবহার নির্ধারণ করেন। এন্ডোস্কোপি পেটের আলসার নির্ণয়ের একটি অন্যতম উপায়।


চিত্র ১৪.৬: এন্ডোস্কোপি থেকে প্রাপ্ত ছবি

কার্যপ্রণালি

এই পরীক্ষাটি করতে মূলত আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সূত্র কাজে লাগানো হয়েছে। এখানে লম্বা একটি টিউবের ভিতর দুই–তিনটি অপটিকাল তার থাকে।

এন্ডোস্কোপির ঝুঁকি বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

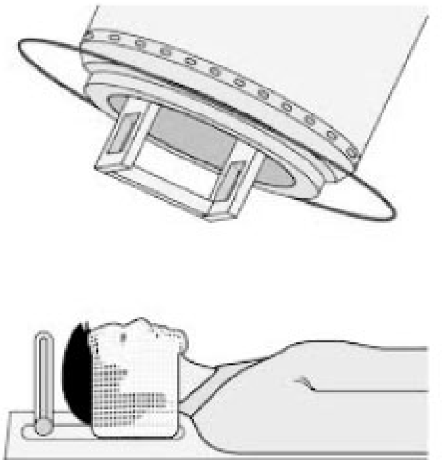
- জ্বর হওয়া
- বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট হওয়া
- পায়খানার রং কালচে হয়ে পড়া
- পেটে প্রচন্ড ব্যথা হওয়া

এন্ডোস্কোপির ঝুঁকি এড়াবার কৌশল

এন্ডস্কোপি কেবল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে করা হয়। তাই এন্ডোস্কোপি করার পূর্বে ও পরে অবশ্যই চিকিৎসকের সকল পরামর্শ সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

রেডিওথেরাপি (Radiotherapy)

রেডিওথেরাপি হলো ক্যানসারের আরোগ্য বা নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল। এর মাধ্যমে শরীরের যে অঙ্গে ক্যান্সার হয়েছে সে অঙ্গের আক্রান্ত কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। সুস্থ কোষগুলো ক্ষয়পূরণ করতে পারে, কিন্তু ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। বিভিন্ন কারণে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের রেডিওথেরাপি দেয়া হয় এবং অনেক রোগীর জন্য এটিই একমাত্র চিকিৎসা।


চিত্র ১৪.৭: রেডিওথেরাপি দেওয়ার ছবি

কার্যপ্রণালি

এখানে দুই ধরনের শক্তির মাধ্যমে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের DNA ধ্বংস করা হয়। একটি হলো আলোক রশ্মির ফোটন কণাকে কাজে লাগিয়ে, অন্যটি হলো তেজস্ক্রিয় কণার মাধ্যমে। এটি কোষের যে অংশ DNA তৈরি করে তাকে আয়নিত করে ফেলে। ফলশ্রুতিতে DNA ভেঙ্গে কোষ ধ্বংস হয়ে যায়।

রেডিওথেরাপির ঝুঁকি

- চুল পড়া
- চামড়া ঝুলে যাওয়া
- মুখের ভিতরের অংশ ও গলা শুকিয়ে যাওয়া
- বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া বা বদহজম
- প্রচন্ড ক্লান্তি ও অবসাদ

রেডিওথেরাপির ঝুঁকি প্রতিরোধ

- রেডিওথেরাপি দেয়ার সময় রোগীকে প্রতিবার একই জায়গায় একই অবস্থানে রেখে চিকিৎসা দিতে হবে।
- রেডিওথেরাপি চলাকালে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে।

কেমোথেরাপি (Chemotherapy)

কেমোথেরাপি হলো এমন এক ধরনের চিকিৎসা যেখানে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করে শরীরের জন্য ক্ষতিকর দ্রুত বিভাজনরত কোষ ধ্বংস করা হয়। এটি ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। কারণ, ক্যান্সারে শরীরের কিছু কোষ বিভাজনের গতি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

কার্যপ্রণালি

প্রতিটি জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত। এই কোষ বৃদ্ধি পায় বা বিভাজিত হয়। জীবদেহের এই কোষ বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে কেমোথেরাপি গঠিত। কেমোথেরাপিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক ঔষধ কোষ বিভাজনের নির্দিষ্ট ধাপে প্রয়োগ করা হয়। কোষ বিভাজনের কোন ধাপে প্রয়োগ করা হবে তার ওপর নির্ভর করে রাসায়নিক ঔষধ ঠিক করা হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট সময় জুড়ে থাকে। যেমন: প্রতিদিনে ১ বার, সপ্তাহে ১ বার বা মাসে ১ বার প্রভৃতি। সাধারণত এভাবে প্রায় ৬ বার ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

কেমোথেরাপির ঝুঁকি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

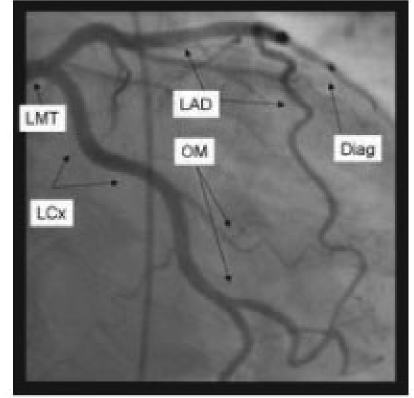
কেমোথেরাপির বিশেষ ঔষধ ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্য কোষও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এতে নিম্নোক্ত ঝুকি থাকতে পারে।

- চুল পড়ে যাওয়া
- হাতের তালু, পায়ের তালু প্রভৃতি অঙ্গের চামড়া পুড়ে যাওয়া
- হজমে সমস্যা হওয়া এবং এর কারণে ডায়রিয়া, পানিশূন্যতা, বমি প্রভৃতি সমস্যা হওয়া

- লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেত রক্ত কণিকা ও অণুচক্রিকা উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হওয়া

কেমোথেরাপির ঝুঁকি এড়াবার কৌশল

- শরীরের তাপমাত্রার দিকে লক্ষ রাখা
- তরল বা নরম খাবার খাওয়া
- কেমোথেরাপি গ্রহণকৃত রোগীর বর্জ্য, যেমন মল–মূত্র বমি ইত্যাদি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা
- বর্জ্য পরিষ্কার করার সময় খালি হাত ব্যবহার না করে গ্লাভস বা কমপক্ষে প্লাস্টিকের ব্যাগে হাত ভালভাবে মুড়িয়ে পরিষ্কার করা
- শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঠিক রাখার জন্য সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা ও যোগাযোগ রাখা



চিত্র ১৪.৬: এনজিওগ্রাফ থেকে প্রাপ্ত ছবি

এনজিওগ্রাফি (Angiography)

এনজিওগ্রাফি হলো এক ধরনের বিশেষ পরীক্ষা যেখানে এক্সরে–এর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন রক্তনালির ছবি তোলা হয়। যদি কোনো কারণে শরীরের কোনো রক্তনালিকা বন্ধ হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা অস্বাভাবিক কোনো পরিবর্তন হয়, তখন বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ) প্রভৃতি সমস্যা হতে পারে। এনজিওগ্রাফি ডাক্তারকে এ সকল সমস্যার জন্য দায়ী সুনির্দিষ্ট রক্তনালিকার পরীক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সহায়তা করে।

কার্যপ্রণালি

এনজিওগ্রাফিতেও আলোর প্রতিসরণকে কাজে লাগানো হয়েছে। এখানে প্রথমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর নির্দিষ্ট রক্তনালিকায় একটি বিশেষ টিউবের মাধ্যমে তরল ডাই (Dye) প্রবেশ করান। সাধারণত এটি বাহুর মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়। এই তরল পদার্থ যখন রক্তনালির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে তখন এক্স রশ্মি ফেলা হয়। এক্সরে এই তরল ভেদ করতে পারে না, আর তাই পর্দায় এর ছবি দেখা যায়। অবশেষে এই তরল পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এতে সাধারণত ৩০–৬০ মিনিট সময় নেয়।

এনজিওগ্রাফির ঝুঁকি

যদিও হৃদপিন্ডের অন্যান্য পরীক্ষার তুলনায় এনজিওগ্রাফির ঝুকি অনেক কম, তবুও নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ঝুকি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

- সাধারণভাবে এতে রক্তপাত, ইনফেকশন অথবা যেখানে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে সেখানে ব্যথা হতে পারে।
- যে নরম টিউবের মাধ্যমে 'ডাই' প্রবেশ করানো হয় তা রক্তনালিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
- অনেকের দেহে 'ডাই' এর ফলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা এলার্জির সৃষ্টি হতে পারে।

- ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এটি কিডনির ক্ষতিসাধন করে।

এনজিওগ্রাফির ঝুঁকি প্রতিরোধের উপায়

- শরীরের কোন উপাদানের সাথে এলার্জি আছে তার ওপর নির্ভর করে 'ডাই' নির্ধারণ করা উচিৎ।
- যাদের কিডনি সমস্যা আছে অথবা ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এনজিওগ্রাফি করানোর পর আলাদা পরীক্ষার মাধ্যমে কিডনি থেকে 'ডাই' এর অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক্যান্সারের চিকিৎসায় কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক. এমআরআই
খ. কেমোথেরাপি
গ. এনজিওগ্রাফি
ঘ. আলট্রাসনোগ্রাফি

২. এন্ডোস্কোপিতে প্রয়োগ করা হয়-

i. আলোর প্রতিসরণ
ii. বৈদ্যুতিক তরঙ্গের নিঃসরণ
iii. আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii
খ. iii
গ. i ও ii
ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রফিক সাহেব বুকে ব্যথা অনুভব করলে তিনি একটি পরীক্ষা করালেন। এই পরীক্ষা করার সময় রফিক সাহেবের রক্তনালিকা দিয়ে এক ধরনের বিশেষ তরল পদার্থ প্রবেশ করানো হয়।

৩. রফিক সাহেব কোন পরীক্ষাটি করালেন?

ক. এন্ডোস্কোপি
খ. এনজিওগ্রাফি
গ. কেমোথেরাপি
ঘ. রেডিওথেরাপি

৪. রফিক সাহেবের রক্ত নালিকায় প্রবেশ করানো পদার্থটি কী?

ক. 'ডাই' নামক তরল
খ. তরল অক্সিজেন
গ. মলিবডেনাম
ঘ. টাংস্টেন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রহমান সাহেব দীর্ঘদিন ধরে পেটের ব্যথায় ভুগছেন। এ সমস্যার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে এন্ডোস্কোপি করতে বললেন। অন্যদিকে রহমান সাহেবের ছেলে সুমন হঠাৎ সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে হাতে আঘাত পায় এবং হাত ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীতে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার এক্সরে করার পরামর্শ দেন।

ক. MRI এর পূর্ণরূপ লিখ।

খ. রেডিওথেরাপি বলতে কী বুঝায়?

গ. ডাক্তার সুমনকে এক্সরে করার পরামর্শ দিলেন কেন?

ঘ. রহমান সাহেবের রোগ নির্ণয়ে এন্ডোস্কোপি কতটুকু কার্যকর? মতামত দাও।

২. রশিদ সাহেব অফিস থেকে বাসায় ফিরছিলেন। হঠাৎ গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়লে তিনি মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। সহকর্মীরা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে সিটিস্ক্যান করতে বলেন। কিছুদিন পর রশিদ সাহেবের ভাই বুকে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করলেন। পরবর্তীতে ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি ECG করার পরামর্শ দিলেন।

ক. এনজিওগ্রাফি কী?

খ. আলট্রাসনোগ্রাফি বলতে কী বুঝায়?

গ. রশিদ সাহেবকে ডাক্তার সিটি স্ক্যান করতে বললেন কেন?

ঘ. রশিদ সাহেবের ভাইয়ের চিকিৎসায় ECG এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৬
শিক্ষাবর্ষ
৯-১০ বিজ্ঞান

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কর্মক্ষমতাই মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :